শ্রীনবদ্বীপধাম
মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের হরিকথামৃত

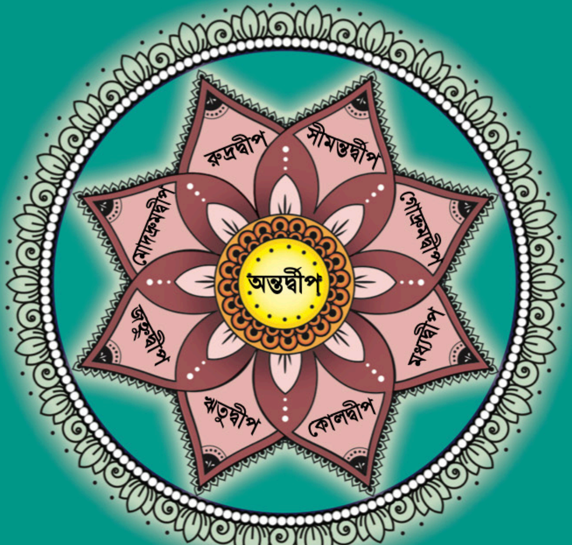
রুদ্রদ্বীপ
সীমন্তদ্বীপ
মোদদ্রুমদ্বীপ
গোদ্রুমদ্বীপ
অন্তর্দ্বীপ
জহ্নুদ্বীপ
মধ্যদ্বীপ
ঋতুদ্বীপ
কোলদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা

অনন্তশ্রীবিভূষিত ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি বিশ্ববরেণ্য জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের
পদ্মমুখের হরিকথামৃত

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ নদীয়া

এইগ্রন্থশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য এবং তাঁর শ্রীচরণের তৃপ্তির জন্য তাঁর অহৈতুক কৃপায় শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব তিথিতে শ্রীগৌরাব্দ ৫৩৪, বঙ্গাব্দ ১৪২৬, খৃষ্টাব্দ মার্চ্চ ২০২০।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা :
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য :
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-বিশ্বপ্রচারক জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

বর্ত্তমান-সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য :
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

মূলমঠ :
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৪১৩০২
ফোন: ৯৭৩২১১৩২৮৫
Web: SCSMathInternational.com
Email: info@scsmathinternational.com

মুদ্রণ :
Giri Print Service, 91-A, Baithakkhana Road,
কলিকাতা 70009

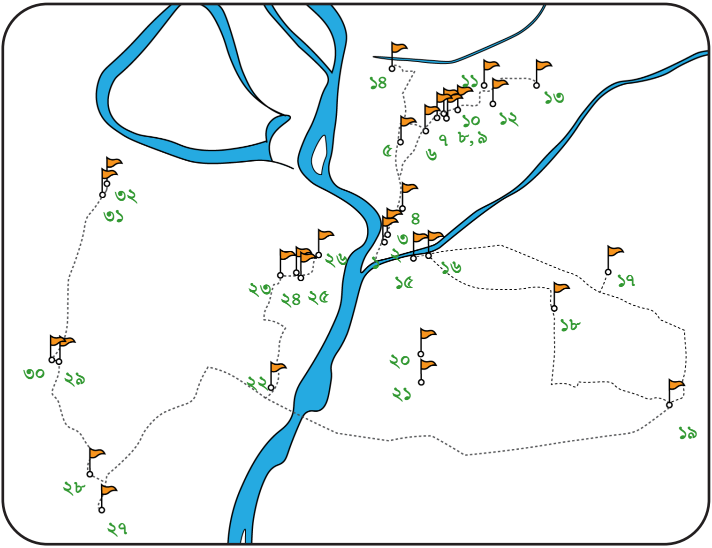
১৪
১১
১৩
১০
১২
৫
৬
৭
৮,৯
৩২
৩১
৪
৩
২৬
২
১
১৬
১৫
২৩
২৪
২৫
১৭
১৮
৩০
২৯
২০
২২
২১
১৯
২৮
২৭

— : সূচিপত্র : —

সূচনা : শ্রীগৌরধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ৩
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য ১১
শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ৭১
(১) শ্রীগঙ্গানগর ৭৩
(২) শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের মঠ ৭৫
(৩) শ্রীনন্দনাচার্য্যের ভবন ৮১
(৪) শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ প্রভুপাদের মিশন ৯১
(৫) শ্রীবারকোণা ও শ্রীমাধাই ঘাটে ১০১
(৬) শ্রীযোগপীঠ ১১১
(৭) শ্রীবাস-অঙ্গন ১৩১
(৮) শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভবন ১৪৬
(৯) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ১৫৩
(১০) শ্রীচৈতন্যমঠ ১৬৩
(১১) শ্রীশ্রীধর-অঙ্গন ১৯৫
শ্রীসীমন্তদ্বীপ ২০৩
(১২) চাঁদ কাজীর উদ্ধারণ ২০৭

(১৩) শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ২১১
(১৪) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** ২১৩
শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ২১৯
(১৫) শ্রীসুবর্ণবিহার ২২১
(১৬) শ্রীসুরভিকুঞ্জ ২২৭
(১৭) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটির (স্বানন্দ-সুখদা-কুঞ্জ)...... ২৩৫
(১৮) শ্রীহরিহর ক্ষেত্র ২৫৫
(১৯) শ্রীনৃসিংহপল্লী ২৫৯
(২০) শ্রীগাদিগাছা গ্রাম ২৭২
(২১) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** ২৭৫
শ্রীকোলদ্বীপ ২৮১
(২২) কুলিয়া ও গুপ্ত-গোবর্দ্ধন ২৮৩
(২৩) শ্রীবুড়োরাজ (বৃদ্ধ) শিব ২৯১
(২৪) শ্রীপ্রৌঢ় মায়া ২৯৬
(২৫) শ্রীবিষ্ণুপ্রীয়াদেবীর বাড়ি : বিরহের ভবন ৩০৩
(২৬) শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির ৩১৭
(২৭) শ্রীসমুদ্রগড় ৩২৩
(২৮) শ্রীচাঁপাহাটি ৩২৭
শ্রীঋতুদ্বীপ ৩৩৭
(২৯) শ্রীবিদ্যানগর ৩৪১
(৩০) শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জন্মভূমি ৩৪৩
শ্রীজহ্নুদ্বীপ ৩৫৩
শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ৩৫৭
(৩১) শ্রীসারঙ্গ মুরারির কথা ৩৬৩
(৩২) শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বাল্যলীলাভূমি ৩৬৫
উপসংহার : আমার শোচন ৩৭৯

শ্রীগৌরাবির্ভাব কীর্ত্তন

(১) শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব বাসরে ৩৮৬
(২) শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ৩৮৮
পরিশিষ্ট : শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের গ্রন্থাবলী ও কেন্দ্র ৩৯৩

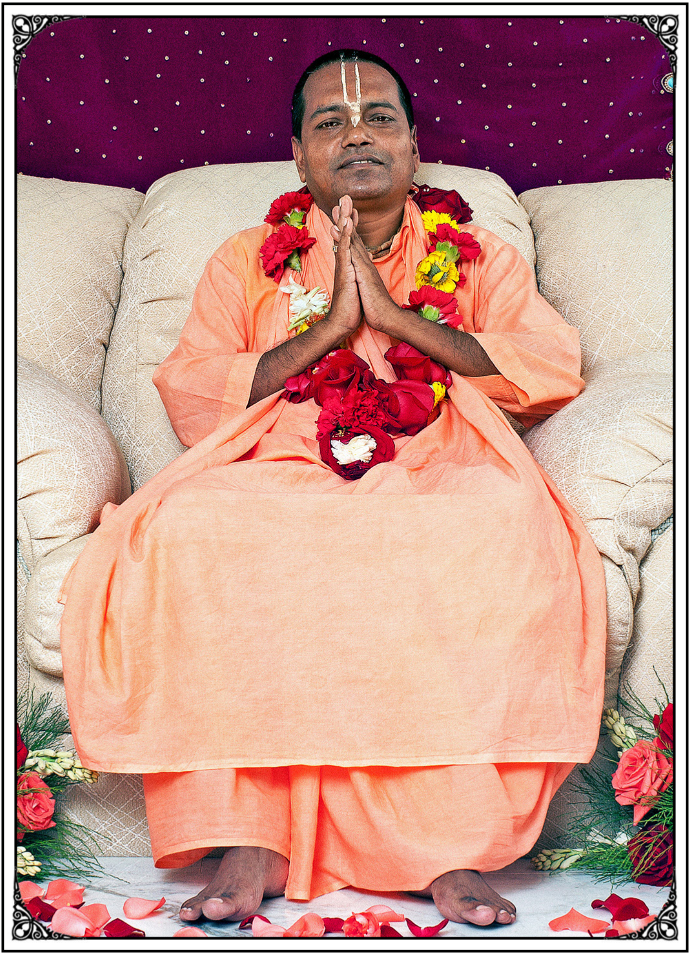

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য

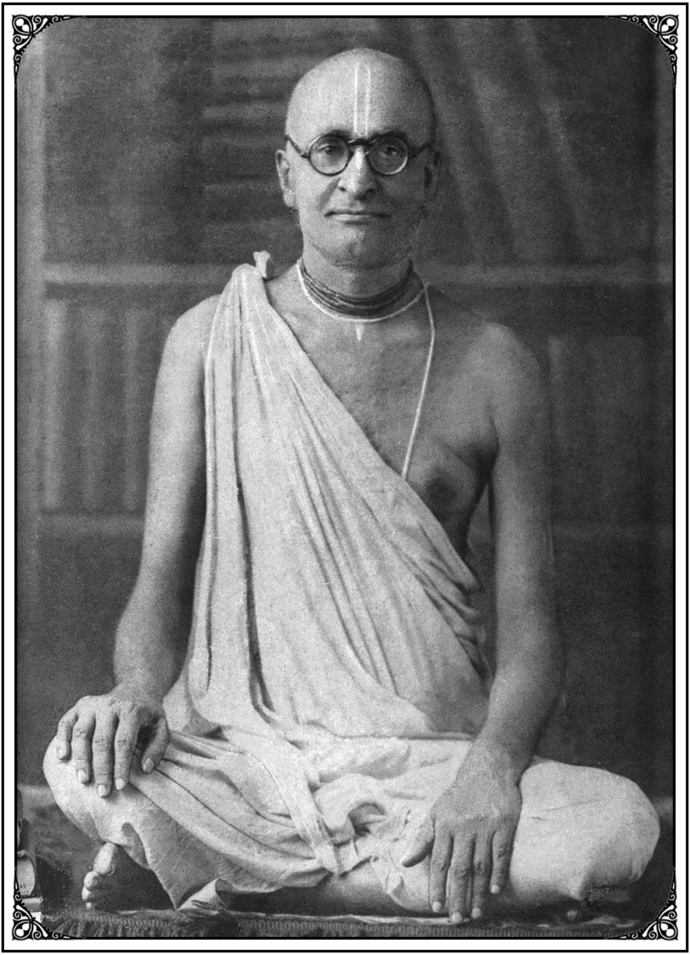

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু
ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ
শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যভাস্কর-শ্রীরূপানুগপ্রবর

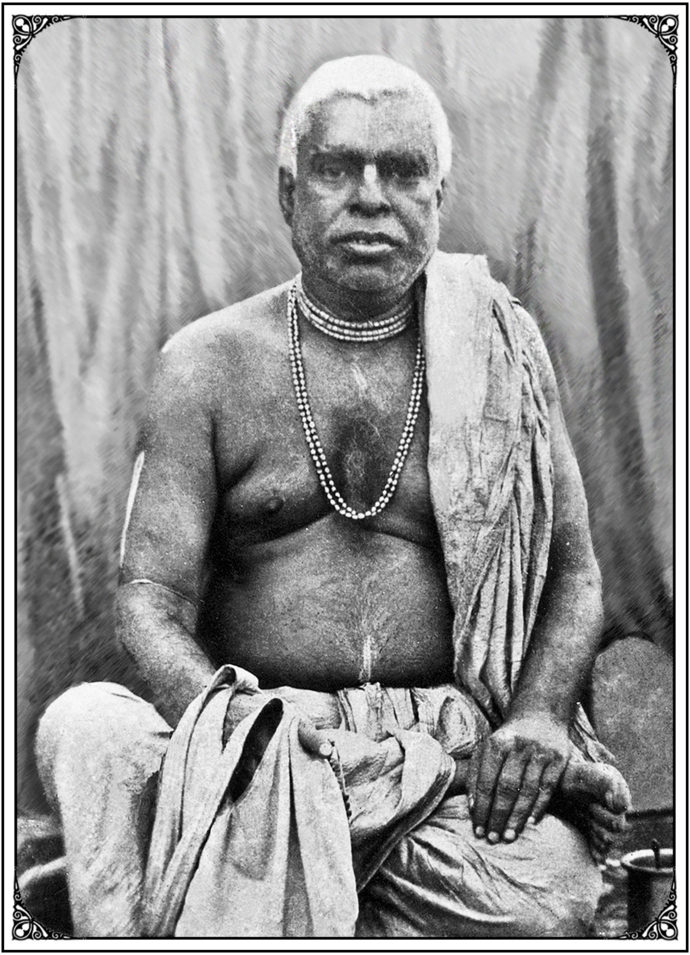

সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধসিদ্ধান্ত-ধারা পুনরাবিষ্কারক,
শ্রীগুরু-শ্রীগ্রন্থ-শ্রীগৌরধাম-শ্রীনাম-শ্রীভক্তি পরমদাতা

আমাদের ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
↓
শ্রীব্রহ্মা
↓
শ্রীনারদ
↓
শ্রীব্যাসদেব
↓
শ্রীমধ্বাচার্য্য
↓
শ্রীপদ্মনাভ
↓
শ্রীনৃহরি
↓
শ্রীমাধব
↓
শ্রীঅক্ষ্যোভ্য
↓
শ্রীজয়তীর্থ
↓
শ্রীজ্ঞানসিন্ধু
↓
শ্রীদয়ানিধি
↓
শ্রীবিদ্যানিধি
↓
শ্রীরাজেন্দ্র
↓
শ্রীজয়ধর্ম
↓
শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থ
↓
শ্রীব্যাসতীর্থ
↓
শ্রীলক্ষ্মীপতি
↓

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী
(শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত)
↓
শ্রীঈশ্বরপুরী
↓
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু
↓
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি
↓
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
↓
শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর
↓
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
↓
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
↓
শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর
↓
শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ
↓
শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী
মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

সূচনা

—: শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় আহ্বান :—

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

ভ্রমিতে হবে না আর—এছার ভুবন।
অনিত্য এ দেহ-রথে চড়িয়া মৃত্যুর পথে হিংস্র-শার্দ্দূল-পূর্ণ সংসার কানন।
ভ্রমিতে হবে না আর এছার ভুবন ॥
অঞ্চলে অঞ্চল বাঁধি' যৌবনের সাধ সাধি' 'গৃহব্রত' নামে শুধু হ'লে পরিচিত।
জন্মজন্মান্তর ধরি' গৃহ পরিক্রমা করি' বুঝিলে কি মায়াভূমি—কন্টক-আবৃত ?
আরও করিতেছ মন ভ্রমণের আয়োজন— দেশ হতে বিদেশেতে গ্রাম-গ্রামান্তরে,
এখনো মেটেনি আশা অরও বাঁধিতেছ বাসা— দু'দিনের পান্থশালা—পৃথিবীর পরে ?
মহামায়া-মোহঘোরে আর কতকাল ওরে ! অনিত্য ও গৃহটিরে—করবি ভ্রমণ,
দারা-পুত্র-পরিবার অসার-অনিত্য ছার বিলে—খালে—আঁস্তাকুড়ে
মিলে কি রতন ?
পায়ে ধরি কহি সার ভ্রমিতে হবে না আর নাহি হেথা ভরসার—একবিন্দু জল,
নাহি আশা সান্ত্বনার, আছে শুধু হাহাকার সমস্ত সংসার ভরা—জলন্ত-অনল।
ভ্রমিতে হবে না আর সংসার-কাননে।
ঐ শোন গৌরজন ডাকে সর্ব্বজনে ॥
আয় আয় ত্বরা করি বাল-বৃদ্ধ নর-নারী দিব্য-চিন্তামণিধাম—গৌর-জন্মভূমি,
প্রণয়ি-ভকত সনে জীবনের শুভক্ষণে গৌরাঙ্গে জন্মদিনে আয় পরিক্রমি ॥
ধাম-পরিক্রমা ক'রে সাঙ্গ হবে চিরতরে অনন্ত জনম ধ'রে ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ,
দূরে যাবে ভব-রোগ খণ্ডিবে সকল ভোগ ভূলোকে-গোলোক-লাভ
—ডাকে গৌরজন।
ভ্রমিতে হবে না আর এছার ভুবন ॥

* * *

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

গৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম প্রচারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গৌরধাম নবদ্বীপের সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই আবির্ভূত হন। এই জন্যই ক্ষেত্রপাল তারকেশ্বর এক সময় ঠাকুরকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন,—“তুমি বৃন্দাবনে যাইবে? তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপধামে যে কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে?”

গৌরধামে ঠাকুরের যে প্রীতি, তাহা অনন্তদেবও অনন্ত-মুখে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতেন, তখন অনেক সময়ই বলিতেন যে, ধামের বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, প্রত্যেক রেণু-পরমাণু-দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও পুলকের সঞ্চার হয়।

ঠাকুর গৌরধামে ব্রজধাম দর্শন করিতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপের নয় দ্বীপে নবধা ভক্তির অধিনায়ক শ্রীগৌরসুন্দরের অষ্টকালীয় লীলারস আস্বদন করিতেন। ঠাকুর তাঁহার ভজনরহস্যে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের দ্বারা যে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অষ্টকালীয়-লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, ‘শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে’, ‘শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে’, ‘শ্রীনবদ্বীপশতকে’ তিনি গৌরবনে সেই ব্রজবনের অষ্টকালীয় লীলার অনুশীলনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা অতীব গূঢ় রহস্য—কাহারও নিকট বলিবার নহে ; বলিবার মত মর্ম্মিলোকও অতি কম, আবার অনেকে ইহা বিশ্বাসও করিবেন না, বা বুঝিবেন না।

ঠাকুর কীর্ত্তনাখ্যদ্বীপ শ্রীগোদ্রুমে শ্রীগৌরহরির পূর্ব্বাহ্ণ-লীলা দর্শন করিতেন। গোদ্রুমকে ‘শ্রীনন্দীশ্বরধাম’, ‘গোপাবাস’ বা ‘গোষ্ঠ’ বিচার করিতেন। তাই ঠাকুর নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে (৪৩।৪৪) গাহিয়াছেন,—

"ভজরে ভজরে মন গোদ্রুম কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌরলীলাধন॥
যে-লীলা দর্শনে তুমি যুগল বিলাস।
অনায়াসে লভিবে পুরিবে তব আশ॥
গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস॥
পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্য দ্রব্য খাই।
গোপ-সনে গোচারণ করেন নিমাই॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনও অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগোকুলমহাবন ও তথায় শ্রীবৃন্দাবনরাসমণ্ডল দর্শন করিতেন। শ্রীরাসমণ্ডলে নিশান্তলীলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়,—

"মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন।
পারডাঙ্গা সট্টিকার স্বরূপ-গণন॥
তথায় আছে বৃন্দাবন শ্রীরাসমণ্ডল।
কালে এই স্থানে হ'বে গান-কোলাহল॥"

—শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য—অন্তর্দ্বীপ

শ্রীল ঠাকুর মধ্যদ্বীপে মধ্যাহ্নলীলা দর্শন করিতেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গ গণসহ মধ্যাহ্ন সময়ে।
ভ্রমেন এসব বনে প্রেমে মত্ত হ'য়ে॥
ভক্তগণে কৃষ্ণ-লীলা সঙ্কেত করিয়া।
নাচেন কীর্ত্তনে রাধা-ভাব আস্বাদিয়া॥"

—নবদ্বীপভাবতরঙ্গ—৫৭

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীসীমন্ত দ্বীপের রক্ষাকর্ত্রী শ্রীগৌর-পাদপদ্মপরাগবিভূষণা শ্রীসীমন্তিনী দেবীকে মূল স্বরূপে যোগমায়া পৌর্ণমাসীরূপে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন,—

তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি সর্ব্বেশ্বরী।
এক শক্তি দুই রূপ মম সহচরী॥
স্বরূপশক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গা রূপে রাধা তোমাতে বিস্তার॥
তুমি নৈলে মোর লীলা সিদ্ধ নাহি হয়।
তুমি যোগ মায়া রূপে লীলাতে নিশ্চয়॥
ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসী রূপে নিত্য কাল।
নবদ্বীপে পৌঢ়ামায়া সহ ক্ষেত্রপাল॥

—শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য—৬ষ্ঠ অঃ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধামের রক্ষক বৃদ্ধ শিবকে শ্রীমায়াপুরের 'ক্ষেত্রপাল' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মহাপ্রভু যখন অপ্রকটলীলা বিস্তার করিবেন এবং গঙ্গাদেবী যখন শ্রীমায়াপুরের কোন কোন অংশ প্রায় আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে, তখন কেবল গৌরজন্মস্থানটী ও তন্নিকটবর্ত্তী কোন কোন ভূমিমাত্র বাকী থাকিবে। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় যখন

পুনরায় তাঁহার আবির্ভাব-স্থানে ভক্তগণ মন্দির প্রকাশ করিবেন, তখন প্রৌঢ়মায়া ও বৃদ্ধ শিব আসিয়া পুনরায় প্রভুর ইচ্ছায় নিজ কার্য্য সাধন করিবেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভবিকালে গৌর-সেবা-বৈভব-বিস্তারের যে স্বপ্নসমাধি দর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্য-সত্যই বাস্তবরূপে পরিণত হইয়াছে। ঠাকুর নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে লিখিয়াছেন,—

"অদ্ভূত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥"

—নবদ্বীপধাম মহাতম্য ৫ম অঃ

ঠাকুর পরবর্ত্তিকালে লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক খণিত বল্লাল দীর্ঘিকাকে 'বৈষ্ণব মহারাজ পৃথুর কুণ্ড' বা 'পৃথুকুণ্ড' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরডাঙ্গাকে "শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম" বলিয়াছেন। বিদ্যাবাচস্পতির স্থানকে দ্বারকারূপে দর্শন করিয়া স্বরূপ-রূপানুগবর গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—'যঃ কৌমারহরঃ' ও তদনুরূপ শ্রীরূপের 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং' শ্লোকের বিচারানুসারে গৌরহরিকে পৃথুকুণ্ডতীরে বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীবাসমন্দিরে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে কোলদ্বীপকে বহুলাবনরূপে বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় ; আবার শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্যে কুলিয়া পাহাড়কে 'গিরি-গোবর্দ্ধন' রূপে বর্ণিত দেখা যায়, যথা—

"ধন্য জীব কোলদ্বীপ করে দরশন।
পরম আনন্দধাম শ্রীবহুলাবন॥"

—শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—৭৪

আবার শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে (১৮শ অঃ)—

"কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এইস্থান হয়। ওহে জীব, নিত্যালীলাময় বৃন্দাবনে।
সেই হইতে পর্ব্বতাখ্য হইল পরিচয়॥ গিরিগোবর্দ্ধন এই জানে ভক্তজনে॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে (১১শ অঃ) কোলদ্বীপের উত্তরে বহুলাবন দর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীবৃন্দাবন-ধামের দ্বাদশ বনের ক্রমবিপর্য্যয়ের মধ্যে যে অপূর্ব্ব সমন্বয় ও মাধুর্য্য আছে, তাহা বর্ণন করিয়াছেন,—

"শ্রীবহুলবান দেখ ইহার উত্তরে।
রূপের ছটায় সর্ব্বদিক্ শোভা করে॥
বৃন্দাবন যে যে ক্রমে দ্বাদশ কানন।
সে ক্রম নাহিক এথা বল্লভ নন্দন॥
প্রভুর ইচ্ছামতে হেথা ক্রমবিপর্য্যয়।
ইহার তাৎপর্য্য জানে প্রভু ইচ্ছাময়॥
যেইরূপ আছে হেথা দেখ সেইরূপ।
বিপর্য্যয়ে প্রেমবৃদ্ধি এই অপরূপ॥"

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্যে সমুদ্রগড় দ্বারকাপুরী-রূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"এই যে সমুদ্রগড়ি কর দরশন।
সাক্ষাৎ দ্বারকাপুরী শ্রীগঙ্গাসাগর॥
দুই তীর্থ আছে হেথা দেখ বিজ্ঞবর॥ —নঃ ধঃ মঃ ঐ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত চম্পহট্টকে খদিরবন বা রাধাকুণ্ড-প্রদেশের একদেশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

"এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে চম্পক-কানন।
খদির বনের অংশ সুন্দর দর্শন॥
চম্পকলতা সখী নিত্য চম্পক লইয়া।
মালা গাঁথি' রাধাকৃষ্ণে সেবিতেন গিয়া॥"
—নঃ ধাঃ মাঃ ১১শ অঃ

আবার নবদ্বীপভাবতরঙ্গে বলিতেছেন,—

"চম্পকহট্ট গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্পলতা করে যথা কুসুম-চয়ন॥
নবদ্বীপে শ্রীখদির বন সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা রাম-কৃষ্ণ করেন বিশ্রাম॥
ঋতুদ্বীপ বনময় অতি মনোহর।
বসন্তাদি ঋতু যথা গৌরসেবাপর॥
সর্ব্বর্তুসেবিত ভূমি আনন্দ-নিলয়।
রাধাকুণ্ড-প্রদেশের একদেশ হয়॥
—শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৭৮-৭৯

নবদ্বীপধাম-মাহাতম্যে দ্বাদশ অধ্যায় ঋতুদ্বীপকে রাধাকুণ্ডরূপেও বর্ণিত হইয়াছে,—

গৌরাঙ্গের নাম শুনি, নিতাই উঠে অমনি,
বলে এই রাধাকুণ্ড স্থান।
হেথা ভক্ত সঙ্গে করি, অপরাহ্ণে গৌরহরি,
করিতেন কীর্ত্তন বিধান॥
হেথা ছয় ঋতু মেলি, গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনকেলি,
পুষ্টকৈল শোভা বিস্তারিয়া।
রাধাকুণ্ড ব্রজে যেই, ঋতুদ্বীপ হেথা সেই,
ভক্ত হেথা মজে প্রেম পিয়া॥
দেখ শ্যামকুণ্ড শোভা, জগজ্জন-মনোলোভা,
সখীগণ কুঞ্জ নানাস্থানে।
হেথা অপরাহ্ণে গোরা, সঙ্কীর্ত্তনে হয়ে ভোরা,
তুষিলেন সবে প্রেমদানে॥
এস্থান সমান ভাই, ত্রিজগতে নাহি পাই,
ভক্তের ভজন স্থান জান।
হেথায় বসতি যার, প্রেমধন লাভ তার,
সুশীতল হয় তার প্রাণ॥

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গে (৮০-৮১) ঠাকুর ভক্তিবিনোর ঋতুদ্বীপে রাধাকুণ্ড-স্ফুর্ত্তির কথা বর্ণন করিয়াছেন,—

“কবে আমি ঋতুদ্বীপে করিয়া ভ্রমণ। রাধাকুণ্ড-লীলা স্ফুর্ত্তি হইবে তখন।
বনশোভা হেরি লীলা করিব স্মরণ॥ স্তম্ভিত হইয়া তাহা করিব দর্শন॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জহ্নুদ্বীপে ‘ভদ্রবন’ (নঃ ভাঃ তঃ ৯৬ ও নঃ ধাঃ ১৩শ অঃ), মোদদ্রুম-দ্বীপে ‘ভাণ্ডীর বন’ (নঃ ভাঃ তঃ ১১০), মোদদ্রুমের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে ‘নিঃশ্রেয়স বন’ [কল্যাণ-কল্পতরু], (নঃ ভাঃ তঃ ১১৭) মহৎপুরে ‘কাম্যবন’ (নঃ ভাঃ তঃ ১২৪) দর্শন করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপভাবতরঙ্গে নিদয়াকে ‘সাযুজ্য মুক্তি’স্বরূপা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বজীবকে নিস্তার করিলেন, এমন কি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি মুক্তি পর্যন্ত বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল, কিন্তু একমাত্র নির্দ্দয় হইলেন সাযুজ্য-মুক্তির প্রতি। কারণ, ইহার প্রতি ভক্তগণ অত্যন্ত বিরূপ।

“শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সর্ব্বজনে নিস্তারিল। আমি যেই স্থানে এবে ছাড়িব জীবন।
কেবল আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল॥ নিদয়া বলিয়া স্থান জানুক সর্ব্বজন॥”

—নঃ ভাঃ তঃ ১৪০

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধাম নবদ্বীপকে নবধা ভক্তির পীঠ এবং কর্ম্মজ্ঞান যোগাদিকে সেই নবধা ভক্তির সেবা-প্রতীক্ষাকারী কিঙ্করররূপে বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা বহির্ম্মুখ, তাহাদিগকে শাস্ত্র দুষ্টমতি প্রদান করিয়া থাকেন, এবং শিষ্টজনকে কৃষ্ণরতি দান করিয়া থাকেন। শাস্ত্র পড়িয়াও অনেকে গৌরধামের প্রতি বিশ্বাসী হইতে পারেন না।

নবদ্বীপে নববিধ ভক্তির অধিষ্ঠান।
ভক্তিকে সেবয়ে সদা কর্ম্ম আর জ্ঞান॥
বহির্ম্মুখ জনে শাস্ত্র দেয় দুষ্টমতি।
শিষ্ট জনে সেই শাস্ত্র দেয় কৃষ্ণরতি॥ —নঃ ধাঃ মাঃ ১৩শ অঃ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধাম ও ব্রজধামে কি লীলাবৈচিত্র্য দর্শন করিতেন, তাহাও তাঁহার কৃপায় তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং

গোলোক—একই অখণ্ড তত্ত্ব ; কেবল প্রেমবৈচিত্র্যাগত অনন্ত ভাব-বিশেষ উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন।” (ব্রঃ সং ৫।৫)

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে (১৩য অঃ) গোলোকের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠরূপব্রজ এবং নবদ্বীপধামের স্বরূপ এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

“এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম সার।
শ্রীবিরজা ব্রহ্মধাম আদি হয়ে পার ॥
বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলক।
তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক ॥
সেই লোক দুই ভাবে হয়ত প্রকাশ।
মাধুর্য্য ঔদার্য্য ভেদে রসের বিকাশ ॥
মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পুর্ণ রূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পুর্ণ রূপেতে বিহিত ॥
তথাপিও যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রদান।
বৃন্দাবন বলি তাহা জানে ভাগ্যবান ॥
যে প্রকাশে ঔদার্য্য প্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপধাম সর্ব্ব বেদে কয় ॥
বৃন্দাবন নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ ভেদে করয় প্রভেদ ॥”

জৈবধর্ম্মে ঠাকুর বলিয়াছেন,—“‘গোলোক’, ‘বৃন্দাবন’ ও ‘শ্বেতদ্বীপ’—এই তিনটি পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয় (স্বীয় স্বরূপশক্তিসহ) লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয় লীলা, শ্বেতদ্বীপ সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ।”

শ্রীগৌরধাম দর্শন করিবার চক্ষু কিরূপে লাভ করিতে হয়, তাহাও নদীয়াপ্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। গৌরধামের কৃপা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা লাভ করিতে হইবে। গৌরধামে নিত্য-বসতির সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহিলে শ্রীভক্তিবিনোদের পাদপদ্মধামের সংলগ্ন রেণু হইতে হইবে। দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিতে, মাংসদর্শন থাকিতে, ধামাত্মবুদ্ধি বা ধাম দর্শন হয় না। নাম-দৃক্ই ধামের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। এই কথাই ঠাকুর পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

“যতদিন না ছাড়িবে প্রভুর ইচ্ছায়।
মায়িক শরীর ততদিন তো তোমায় ॥
না স্ফুরিবে পূর্ণরূপে এ ধামের ভাব।
তব বুদ্ধি না ছাড়িবে জাতীয় স্বভাব ॥
ভাগবতী তনু পাবে প্রভুর ইচ্ছায়।
অব্যাহত-গতি তব হইবে হেথায় ॥
জড়মায়াজালে আবরণ যাবে দূরে।
অদীম আনন্দ পাবে এই নিত্যপুরে ॥”

—নঃ ভাঃ তঃ ১০৫-১০৬

গৌরধামে কি ভাবে হরিভজন হয়, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গের ১০০-১০৮ সংখ্যক পদ্যাবলীতে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাহার সারমর্ম্ম এই—সকল আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র গৌরধামে অবস্থানপূর্ব্বক গৌরহরির ভজনই বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের এবং শ্রীগৌরচরণ-প্রাপ্তির উপায়। মহাপ্রভুর কৃপা হইলে এই গৌরধামে মুক্তজন সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা দর্শন করিতে পারেন। শুদ্ধভক্তগণ এই ধামে কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য-মাধুর্য্যে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিয়া জাগতিক অভাব, পীড়া ও সংসার যাতনায় ক্লিষ্ট হন না ; তাঁহারা সিদ্ধকাম ও শুদ্ধদেহ। গৌরধাম অনন্ত ; তথায় জড় মায়া নাই। যে পর্যন্ত জীবের মায়িক শরীর আছে, সে পর্যন্ত অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের সহিত শুদ্ধভক্তের সেবা বিষয়ে শৈথিল্যভাব ছাড়িয়া, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম, যুগল ভজন, শ্রীধাম, শ্রীনাম ও ভক্তকৃপা-যাজ্ঞা, অসাধু-সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া ভজন করিলে শ্রীধামের কৃপা লাভ হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরধামের কথা বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার প্রিয়তম শ্রীরাধা কুণ্ডাভিন্ন গোদ্রুম-দ্বীপ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, স্বানন্দকুঞ্জেশ্বরী এবং অভীষ্ট স্বারসিকী সেবাস্থিতি ও কৈঙ্কর্য্যের কথা বর্ণন করিয়া নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশাক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক ঈশানাথের সেবাই—ঠাকুরের সাধ্য ও সাধন।

শ্রীল ঠাকুর মায়াপুরের দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে সরস্বতী-সঙ্গমের সন্নিকটে ঈশোদ্যান নামক এক উপবনের কথা তাঁহার শ্রীধাম-গ্রন্থাবলীতে জানাইয়াছেন। সেই বনে ঠাকুরের রাধাকুণ্ডের মধ্যাহ্নলীলা-স্মৃতির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

“মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥

যে-বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন॥
বন-শোভা হেরি রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥

—শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ২৬-২৭

শ্রীগোদ্রুমবনেও ঠাকুরের শ্রীরাধাকুণ্ড-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইত। তাঁহার নিত্যলীলাপ্রবেশের কালে তাঁহাতে সেই স্বারসিকী-সিদ্ধি সাক্ষাদ্ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল—ইহা মহাজন-বাক্যে শুনিয়াছি, ইহা এক অলৌকিক ব্যাপার। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, গৌরধামের সর্ব্ববিধ বৈভবের বিস্তারের জন্যই শ্রীধামেশ্বর গৌরহরি ঠাকুরকে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের রাধাকুণ্ডাভিন্ন শ্রীগোদ্রুমে এইরূপ লালসার পরিচয় পাওয়া যায়,—

“সেই শ্রীগোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব পেয়ে রাধাকৃপাসার॥” (শ্রীনবদ্বীপশতক—৪২-৪৩)

গৌরাঙ্গৈকগতি নদীয়াপ্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিরূপ লৌল্যের সহিত তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব গৌরধামের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন, গৌরধামের কৃপা কি, গৌরধামে বাসের প্রয়োজন কি, গৌরধামবাসীর দৈন্য কিরূপ কাহার কৃপায় গৌরধামে বসতি হয়, তাহা তাঁহারই ভাষায় নিম্নে উদ্ধার করিয়া তাঁহার দাসানুদাসগণের কৃপাকণা যাচ্ঞাপূর্ব্বক এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

“ঈশোদ্যান সন্নিকটে নিজকুঞ্জে বসি।
ভজিব যুগল-ধন শ্রীগৌরাঙ্গশশী॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
এ ভক্তিবিনোদ মাগে নবদ্বীপ-বাস॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে আকুতি করিয়া।
নীজাভীষ্ট-সিদ্ধি মাগে ব্যাকুল হইয়া॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবন ক্ষেত্রবাসিগণ।
ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন॥
তোমাদের ক্ষেত্র এই আমি মাত্র দাস।
তোমা সবা সেবাচ্ছলে পাই ক্ষেত্রবাস॥
নবদ্বীপ কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা বিনা ক্ষেত্র লভে কোন্ জন॥
আমার যোগ্যতা লয়ে না কর বিচার।
জাহ্নবা নিতাই আজ্ঞা করিয়াছি সার॥”

—নঃ ভাঃ তঃ ১৬৩-১৬৭

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

—: পরিক্রমা খণ্ড :—

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(প্রথম সংস্করণ — ৪০৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ইংরেজি ১৮৮৯)

প্রথম অধ্যায় : শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামের সাধারণ মাহাত্ম্য কথন

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ॥
জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার।
জয় নবদ্বীপবাসী গৌর পরিবার ॥
সকল ভকত পদে করিয়া প্রণাম।
সংক্ষেপে বর্ণিব আমি নবদ্বীপধাম ॥
নবদ্বীপমণ্ডলের মহিমা অপার।
ব্রহ্মা আদি নাহি জানে বর্ণে সাধ্য কার ॥
সহস্র বদনে শেষ বর্ণিতে অক্ষম।
ক্ষুদ্রজীব আমি কিসে হইব সক্ষম ॥
সত্য বটে নবদ্বীপ মহিমা অনন্ত।
দেব-দেব মহাদেব নাহি পায় অন্ত ॥
তথাপি চৈতন্যচন্দ্র ইচ্ছা বলবান।
সেই ইচ্ছাবশে ভক্ত আজ্ঞার বিধান ॥
ভক্তগণে আজ্ঞা দিল চৈতন্য ইচ্ছায়।
নদীয়া মাহাত্ম্য বর্ণি ভক্তের কৃপায় ॥
আর এক কথা আছে গূঢ় অতিশয়।
কহিতে না ইচ্ছা হয় না কহিলে নয় ॥
যে অবধি শ্রীচৈতন্য অপ্রকট হৈল।
ধাম লীলা প্রকাশিতে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥
সর্ব্ব অবতার হৈতে গূঢ় অবতার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মোর বিদিত সংসার ॥
গূঢ় লীলা শাস্ত্রে গূঢ়রূপে উক্ত হয়।
অভক্ত জনের চিত্তে না হয় উদয় ॥
সে লীলা সম্বন্ধে যত গূঢ় শাস্ত্র ছিল।
মায়াদেবী বহুকাল আচ্ছাদি রাখিল ॥
অপ্রকট শাস্ত্র বহু রহে যথা তথা।
প্রকট শাস্ত্রেও যত চৈতন্যের কথা ॥
সে সকল মায়াদেবী পণ্ডিত নয়ন।
আবরিয়া রাখে গুপ্ত ভাবে অনুক্ষণ ॥
গৌরের গম্ভীর লীলা হৈলে অপ্রকট।
প্রভু ইচ্ছা জানি মায়া হয় অকপট ॥
উঠাইয়া লৈল জাল জীব চক্ষু হৈতে।
প্রকাশিল গৌর তত্ত্ব এ জড় জগতে ॥
গুপ্ত শাস্ত্র অনায়াসে হইল প্রকট।
ঘুচিল জীবের যত যুক্তির সঙ্কট ॥
বড়ই দয়ালু প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গৌরতত্ত্ব প্রকাশিল জীবের হিয়ায় ॥
তাঁর আজ্ঞা পেয়ে মায়া ছাড়ে আবরণ।
সুভক্ত পণ্ডিতগণ পায় শাস্ত্র ধন ॥
ইহাতে সন্দেহ যার না হয় খণ্ডন।
সে অভাগা বৃথা কেন ধরয় জীবন ॥
যে কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়।
ভাগ্যবন্ত জন তাহে বড় সুখী হয় ॥
দুর্ভাগা লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন।
নিজ বুদ্ধি বড় বলি করিয়া গণন ॥
ঈশ্বরের কৃপা নাহি করয় স্বীকার।
কুতর্কে মায়ার গর্ত্তে পড়ে বারবার ॥
এস হে কলির জীব ছাড় কুটিনাটি।
নির্ম্মল গৌরাঙ্গ প্রেম লহ পরিপাটি ॥

এই বলি নিত্যানন্দ ডাকে বারবার।
তবুত দুর্ভাগা জন না করে স্বীকার॥
কেন যে এমন প্রেমে করে অনাদর।
বিচার করিয়া দেখ হইয়া তৎপর॥
সুখ লাগি সর্ব্ব জীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে যোগ করে সংসার ভিতরে॥
সুখ লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখ লাগি যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়॥
সুখ লাগি কামিনী কনক পাছে ধায়।
সুখ লাগি শিল্প আর বিজ্ঞান চালায়॥
সুখ লাগি সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে।
সুখ লাগি অর্ণব মধ্যেতে ডুবি মরে॥
নিত্যানন্দ বলে ডাকি দুহাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া॥
সুখ লাগি চেষ্টা তব আমি তাহা দিব।
তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব॥
কষ্ট নাই ব্যয় নাই না পাবে যাতনা।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা॥
যে সুখ আমি ত দিব তার নাই সম।
সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম॥
এই রূপে প্রেম যাচে নিত্যানন্দরায়।
অভাগা করম দোষে তাহা নাহি চায়॥
গৌরাঙ্গ নিতাই যেই বলে একবার।
অনন্ত করম দোষ অন্ত হয় তার॥
আর এক গূঢ় কথা শুন সর্ব্বজন।
কলি জীবে যোগ্য বস্তু গৌর লীলা ধন॥
গৌর হরি রাধা কৃষ্ণ রূপে বৃন্দাবনে।
নিত্য কাল বিলাস করয় সখী সনে॥
শাস্ত্রেতে জানিল জীব ব্রজলীলাতত্ত্ব।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ব্রজের মহত্ব॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণধাম মাহাত্ম্য অপার।
শাস্ত্রের দ্বারায় জানে সকল সংসার॥
তবু কৃষ্ণপ্রেম সাধারণে নাহি পায়।
ইহার কারণ কিবা চিন্তহ হিয়ায়॥
ইহাতে আছেত এক গূঢ় তত্ত্ব সার।
মায়ামুগ্ধ জীব তাহা না করে বিচার॥
বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি প্রেম নাহি হয়।
অপরাধ পুঞ্জ তার আছয় নিশ্চয়॥
অপরাধ শূন্য হয়ে লয় কৃষ্ণ নাম।
তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম॥
শ্রীচৈতন্য অবতারে বড় বিলক্ষণ।
অপরাধ সত্ত্বে জীব লভে প্রেম ধন॥
নিতাই চৈতন্য বলি যেই জীব ডাকে।
সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষয় তাকে॥
অপরাধ বাধা তার কিছু নাহি করে।
নিরমল কৃষ্ণপ্রেমে তার আঁখি ঝরে॥
স্বল্পকালে অপরাধ আপনি পলায়।
হৃদয় শোধিত হয় প্রেম বাড়ে তায়॥
কলিজীবের অপরাধ অসংখ্য দুর্ব্বার।
গৌর নাম বিনা তার নাহিক উদ্ধার॥
অতএব গৌর বিনা কলিতে উপায়।
না দেখি কোথাও আর শাস্ত্র ফুকরায়॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ অবতংশ হয়॥
অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥
তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি পাইল চৈতন্য নিতাই॥

অন্যান্য তীর্থের কথা রাখ ভাই দূরে।
অপরাধী দৈত্য দণ্ড পায় ব্রজপুরে ॥
নবদ্বীপে শত শত অপরাধ করি।
অনায়াসে নিতাই কৃপায় যায় তরি ॥
হেন নবদ্বীপধাম যে গৌড়মণ্ডলে।
ধন্য ধন্য সেই দেশ ঋষিগণ বলে ॥
হেন নবদ্বীপে ভাই যাহার বসতি।
বড় ভাগ্যবান সেই লভে কৃষ্ণরতি ॥
নবদ্বীপে যে বা কভু করয় গমন।
সর্ব্ব অপরাধ মুক্ত হয় সেই জন ॥
সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়।
নবদ্বীপ স্মরণে সে লাভ শাস্ত্রে গায় ॥
নবদ্বীপ দরশন করে যেই জন।
জন্মে জন্মে লভে সেই কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
কর্ম্ম-বুদ্ধি যোগেও যে নবদ্বীপে যায়।
নর জন্ম আর সেই জন নাহি পায় ॥
নবদ্বীপ ভ্রমিতে সে পদে পদে পায়।
কোটী অশ্বমেধ ফল সর্ব্ব শাস্ত্রে গায় ॥
নবদ্বীপে বসি যেই মন্ত্র জপ করে।
শ্রীমন্ত্র চৈতন্য হয় অনায়াসে তরে ॥
অন্য তীর্থে যোগী দশবর্ষে লভে যাহা।
নবদ্বীপে তিনরাত্রে সাধি পায় তাহা ॥
অন্য তীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি হয়।
নবদ্বীপে ভাগীরথী স্নানে তা ঘটয় ॥
সালোক্য সারূপ্য সাষ্টি সামীপ্য নির্ব্বাণ।
নবদ্বীপে মুমুক্ষু লভয় বিনা জ্ঞান ॥
নবদ্বীপে শুদ্ধভক্ত চরণে পড়িয়া।
ভুক্তি মুক্তি সদা রহে দাসী রূপে হৈয়া ॥
ভক্তগণ লাথি মারি সে দুয়ে তাড়ায়।
ভক্তপদ ছাড়ি দাসী তবু না পলায় ॥
শতবর্ষ সপ্ততীর্থে মিলে যাহা ভাই।
নবদ্বীপে একমাত্র বাসে তাহা পাই ॥
হেন নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার।
কলিতে আশ্রয় করি জীব হয় পার ॥
তারক পারক বিদ্যাদ্বয় অবিরত।
নবদ্বীপবাসীগণে সেবে রীতিমত ॥
নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া যার আশ।
সে ভক্তিবিনোদ গায় পাইয়া উল্লাস ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় : শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামের বাহ্যস্বরূপ ও পরিমাণ

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত ॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধাম সার।
সে ধামের তত্ত্ব বর্ণে সাধ্য আছে কার ॥
নবদ্বীপধাম গৌড়মণ্ডল ভিতরে।
জাহ্নবী সেবিত হয়ে সদা শোভা করে ॥
এ গৌড়মণ্ডল একবিংশতি যোজন।
মধ্য ভাগে গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ ॥
শতদলপদ্ম সম মণ্ডল আকার।
মধ্যভাগে নবদ্বীপ অতিশোভা তার ॥

পঞ্চ ক্রোশ হয় তার কেশব আধার।
পরিমল পূর্ণ পুষ্প যোজন চত্বার ॥
বাহির পাপড়ি তার শতদল হয়।
একাধিক যোজন বিংশতি বিস্তারয় ॥
মণ্ডল পরিধি হয় সেই পরিমাণ।
যোজন সপ্তক ব্যাস শাস্ত্রের বিধান ॥
ব্যাসার্দ্ধ প্রমাণ সার্দ্ধ তৃতীয় যোজন।
মধ্যবিন্দু হৈতে তার হইবে গণন ॥
মধ্যবিন্দু নবদ্বীপধাম মধ্যস্থল।
যোগপীঠ হয় তাহা চিন্ময় বিমল ॥
চিন্তামণিরূপ হয় এই গৌড় মণ্ডল।
চিদানন্দময়ধাম চিন্ময় সকল ॥
জল ভূমি বৃক্ষ আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিত্রয় ॥
স্বরূপশক্তির সেই সন্ধিনী প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব ॥
প্রভু লীলা পীঠ রূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয় ॥
তবে যে এই ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধ জীবে তাহে হয় অবিদ্যা বিভ্রম ॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত ॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার ॥
নিত্যানন্দ কৃপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দধাম সর্ব্বত্র চিন্ময় ॥
গঙ্গা যমুনাদি তথা সদা বিদ্যমান।
সপ্তপুরী প্রয়াগাদি আছে স্থানেস্থান ॥
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব এ গৌড়মণ্ডল।
ভাগ্যবান জীব তাহা দেখে নিরমল ॥
স্বরূপশক্তির ছায়া মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে ॥
বহির্ম্মুখ জীব চক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম প্রভাব সবে না পায় দর্শন ॥
এ গৌড়মণ্ডল যার বাস নিরন্তর।
বড় ভাগ্যবান সেই সংসার ভিতর ॥
দেবগণে স্বর্গে থাকি দেখে সেই জনে।
চতুর্ভুজ শ্যামকান্তি অপূর্ব্ব গঠনে ॥
ষোলক্রোশ নবদ্বীপধামবাসী যত।
গৌরকান্তি সদা নামসংকীর্ত্তনে রত ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে অন্তরীক্ষ হৈতে।
নবদ্বীপবাসীগণে পূজে নানামতে ॥
ব্রহ্মা বলে কবে মোর হেন ভাগ্য হবে।
নবদ্বীপে তৃণ কলেবর পাব যবে ॥
শ্রীগৌর চরণসেবা করে যত জন।
তা সবার পদরেণু লভিব তখন ॥
হায় মোরে গৌরচন্দ্র বঞ্চনা করিয়া।
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাখিল করিয়া ॥
কবে মোর কর্ম্মগ্রন্থি হইবে ছেদন।
অভিমান ত্যজি মোর শুদ্ধ হবে মন ॥
অধিকার বুদ্ধি মোর কবে হবে ক্ষয়।
শুদ্ধদাস হয়ে পাব গৌর পদাশ্রয় ॥
দেবগণ ঋষিগণ রুদ্রগণ যত।
স্থানেস্থানে নবদ্বীপে বৈসে অবিরত ॥
চিরকাল তপ করি জীবন কাটায়।
তবু নিত্যানন্দ কৃপা সে সবে না পায় ॥
দেববুদ্ধি যত দিন নাহি যায় দূরে।
যত দিন দৈন্য ভাব মনে নাহি স্ফূরে ॥

তত দিন শ্রীগৌর নিতাই কৃপা ধন।
ব্রহ্মা শিব নাহি পায় করিয়া যতন॥
এই সব কথা আগে হইবে প্রকাশ।
যত্ন করি শুন ভাই করিয়া বিশ্বাস॥
এ সব বিষয়ে ভাই তর্ক পরিহর।
তর্ক সে অপার্থ অতি অমঙ্গলকর॥
শ্রীচৈতন্যলীলা হয় গভীর সাগর।
মোচাখোলা রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর॥
তর্ক করি এ সংসার তরিতে যে চায়।
বিফল তাহার চেষ্টা কিছুই না পায়॥
তর্কে জলাঞ্জলি দিয়া সাধু শাস্ত্র ধরে।
অচিরে চৈতন্য লাভ সেই জন করে॥
শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র শাস্ত্র অবিরত গায়।
নদীয়া-মাহাত্ম্য নিত্যানন্দের আজ্ঞায়॥
সেই সব শাস্ত্র পড় সাধু বাক্য মান।
তবেত হইবে তব নবদ্বীপ জ্ঞান॥
কলিকালে তীর্থ সব অত্যন্ত দুর্ব্বল।
নবদ্বীপ তীর্থ মাত্র পরম প্রবল॥
প্রভুর ইচ্ছায় সেই তীর্থ বহু দিন।
অপ্রকট মহিমা আছিল স্ফূর্ত্তিহীন॥
কলির প্রভাব যবে অত্যন্ত বাড়িল।
অন্য তীর্থ স্বভাবত নিস্তেজ হইল॥
জীবের মঙ্গল লাগি পুরুষপ্রধান।
মনে মনে চিন্তা করি করিল বিধান॥
পীড়া বুঝি বৈদ্যরাজ ঔষধ খাওয়ায়।
কঠিন ঔষধ দেয় কঠিন পীড়ায়॥
এবে কলি ঘোর হৈল রোগ হইল ভারি।
কঠিন ঔষধ বিনা নিবারিতে নারি॥
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই ধাম।
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই নাম॥
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই রূপ।
প্রকাশ না কৈলে জীব তরিবে কিরূপ॥
জীবত আমার দাস আমি তার প্রভু।
আমি না তারিলে সেই না তরিবে কভু॥
এই বলি শ্রীচৈতন্য হইল প্রকাশ।
নিজ নাম নিজ ধাম লয়ে নিজ দাস॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা এই হয় সর্ব্বকাল।
তারিব সকল জীব ঘুচাব জঞ্জাল॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন বিলাব সংসারে।
পাত্রাপাত্র না বাছিব এই অবতারে॥
দেখিব কিরূপে কলি জীবে করে নাশ।
নবদ্বীপধাম আমি করিব প্রকাশ॥
সেই ধামে কলির ভাঙ্গিব বিষদাঁত।
কীর্ত্তন করিয়া জীবে করি আত্মসাথ॥
যত দূর মম নাম হইবে কীর্ত্তন।
তত দূর হইবেত কলির দমন॥
এই বলি গৌর হরি কলির সন্ধ্যায়।
প্রকাশিল নবদ্বীপ স্বকীয় মায়ায়॥
ছায়া সম্বরিয়া নিত্য স্বরূপ বিলাস।
গৌরচন্দ্র গৌড়ভূমে করিল প্রকাশ॥
এমন দয়ালু প্রভু যে জন না ভজে।
এমন অচিন্ত্য ধাম যেই জন ত্যজে॥
এই কলিকালে তার সম ভাগ্যহীন।
না দেখি জগতে আর শোচনীয় দীন॥
অতএব ছাড়ি ভাই অন্য বাঞ্ছা রতি।
নবদ্বীপ ধামে মাত্র হও একমতি॥
জাহ্নবী নিতাই পদ ছায়া যার আশ।
সে ভক্তিবিনোদ করে এতত্ত্ব প্রকাশ॥

তৃতীয় অধ্যায় : শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার সাধারণ বিধি

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ॥
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার।
যেই ধাম সহ গৌরচন্দ্র অবতার ॥
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ মধ্যে যাহা যাহা।
বর্ণিব এখন ভক্তগণ শুন তাহা ॥
ষোলক্রোশ মধ্যে নবদ্বীপের প্রমাণ।
ষোড়শ প্রবাহ তথা সদা বিদ্যমান ॥
মূল-গঙ্গা পূর্ব্বতীরে দ্বীপ চতুষ্টয়।
তাঁহার পশ্চিমে সদা পঞ্চদ্বীপ রয় ॥
স্বর্ধুনী প্রবাহ সব বেড়ি দ্বীপগণে।
নবদ্বীপ ধামে শোভা দেয় অনুক্ষণে ॥
মধ্যে মূল গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ।
অপর প্রবাহে অন্য পুণ্য নদীগণ ॥
গঙ্গার নিকটে বহে যমুনা সুন্দরী।
অন্য ধারা মধ্যে সরস্বতী বিদ্যাধরী ॥
তাম্রপর্ণী কৃতমালা ব্রহ্মপুত্র ত্রয়।
যমুনার পূর্ব্বভাগে দীর্ঘ ধারাময় ॥
সরযু নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী গোমতী।
প্রস্থে বহে গোদাবরী সহ দ্রুতগতি ॥
এই সব ধারা পরস্পর করি ছেদ।
এক নবদ্বীপে নববিধ করে ভেদ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ধারা শুষ্ক হয়।
পুন ইচ্ছা হৈলে ধারা হয় জলময় ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ডুবে কোন স্থান।
প্রভুর ইচ্চায় পুন দেয়ত দর্শন ॥
নিরবধি এইরূপ ধাম লীলা করে।
ভাগ্যবান জনপ্রতি সর্ব্বকাল স্ফুরে ॥
উৎকট বাসনা যদি ভক্ত হৃদে হয়।
সর্ব্বদীপ সর্ব্বধারা দর্শন মিলয় ॥
কভু স্বপ্নে কভু ধ্যানে কভু দৃষ্টি যোগে।
ধামের দর্শন পায় ভক্তির সংযোগে ॥
গঙ্গা যমুনার যোগে যেই দ্বীপ রয়।
অন্তর্দ্বীপ তার নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
অন্তর্দ্বীপ মধ্যে আছে পীঠ মায়াপুর।
যথায় জন্মিল প্রভু চৈতন্য ঠাকুর ॥
গোলকের অন্তবর্ত্তী যেই মহাবন।
মায়াপুর নবদ্বীপে জান ভক্তগণ ॥
শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলক বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে সর্ব্বক্ষণ ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী আর।
অবন্তী দ্বারকা সেই পুরী সপ্ত সার ॥
নবদ্বীপে সে সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে ॥
গঙ্গাদ্বার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর।
যাহায় মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছয়ে প্রচুর ॥
সেই মায়াপুর যেই যায় একবার।
অনায়াসে হয় সেই জড়ামায়া পার ॥
মায়াপুরে ভ্রমিলে মায়ার অধিকার।
দূরে যায়, জন্ম কভু নহে আরবার ॥

মায়াপুর উত্তরে সীমন্তদ্বীপ হয় ।
পরিক্রমা বিধি সাধু শাস্ত্রে সদা কয় ॥
অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন ।
শ্রীসীমন্তদ্বীপে চল বিজ্ঞ ভক্তজন ॥
গোদ্রুমাখ্য দ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে ।
তাহা ভ্রমি চল মধ্যদ্বীপে হৃষ্টমনে ॥
এই চারিদ্বীপ জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে ।
দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে ॥
কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ ।
ঋতুদ্বীপে শোভা তবে কর দরশন ॥
তারপর জহ্নুদ্বীপ পরমসুন্দর ।
দেখি মোদদ্রুমদ্বীপে চল বিজ্ঞবর ॥
রুদ্রদ্বীপ দেখ পুন গঙ্গা হও পার ।
ভ্রমি মায়াপুর ভক্ত চল আর বার ॥
তথায় শ্রীজগন্নাথ শচীর মন্দিরে ।
প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে ॥
সর্ব্বকালে এইরূপ পরিক্রমা হয় ।
জীবের অনন্ত সুখ প্রাপ্তির আলয় ॥
বিশেষত মাকরী সপ্তমী তিথি গতে ।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে ॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন ।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তারে কৃপা বিতরিয়া ।
ভক্তি অধিকারী করে পদছায়া দিয়া ॥
সংক্ষেপে কহিনু পরিক্রমা বিবরণ ।
বিস্তারিয়া বলি এবে করহ শ্রবণ ॥
যেই জন ভ্রমে একবিংশতি যোজন ।
অচিরে লভয় সেই গৌরপ্রেম ধন ॥
জাহ্নবা নিতাই পদ ছায়া যার আশ ।
এ ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকাশ ॥

চতুর্থ অধ্যায় : শ্রীজীবের আগমন ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব বলেন

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত ।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত ॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্ব ধাম সার ।
যথায় হইল শ্রীচৈতন্য অবতার ॥
সর্ব্ব তীর্থে বাস করি যেই ফল পাই ।
নবদ্বীপে লভি তাহা একদিনে ভাই ॥
সেই নবদ্বীপ পরিক্রমা বিবরণ ।
শাস্ত্র আলোচিয়া গাই শুন সাধু জন ॥
শাস্ত্রের লিখন আর বৈষ্ণব বচন ।
প্রভু আজ্ঞা এই তিন মম প্রাণধন ॥
এ তিনে আশ্রয় করি করিব বর্ণন ।
নদীয়া ভ্রমণ বিধি শুন সর্ব্বজন ॥
শ্রীজীবগোস্বামী যবে ছাড়িলেন ঘর ।
নদীয়া নদীয়া বলি ব্যাকুল অন্তর ॥
চন্দ্রদ্বীপ ছাড়ি তেঁহ যত পথ চলে ।
ভাসে দুই চক্ষু তাঁর নয়নের জলে ॥
হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ জীবের জীবন ।
কবে মোরে কৃপা করি দিবে দরশন ॥

হাহা নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার।
কবে বা দেখিব আমি বলে বারবার ॥
কৈশোর বয়স জীব সুন্দর গঠন।
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা অপূর্ব্ব দর্শন ॥
চলিয়া চলিয়া কতদিন মহাশয়।
নবদ্বীপে উত্তরিল সদা প্রেমময় ॥
দূর হৈতে নবদ্বীপ করি দরশন।
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে প্রায় অচেতন ॥
কতক্ষণ পরে নিজ চিত্ত করি স্থির।
প্রবেশিল নবদ্বীপে পুলক শরীর ॥
বারকোণা ঘাটে আসি জিজ্ঞাসে সবারে।
কোথা প্রভু নিত্যানন্দ দেখাও আমারে ॥
শ্রীজীবের ভাব দেখি কোন মহাজন।
প্রভু নিত্যানন্দ যথা লয় ততক্ষণ ॥
হেথা প্রভু নিত্যানন্দ অট্ট অট্ট হাসি।
শ্রীজীব আসিবে বলি অন্তরে উল্লাসী ॥
আজ্ঞা দিল দাসগণে শ্রীজীবে আনিতে।
অনেক বৈষ্ণবে যায় জীবে সম্বোধিতে ॥
সাত্ত্বিক-বিকার-পূর্ণ জীবের শরীর।
দেখি জীব বলি সবে করিলেন স্থির ॥
কেহ কেহ আগে গিয়া মহাপ্রেম ভরে।
নিত্যানন্দ প্রভু আজ্ঞা বিজ্ঞাপন করে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ নাম করিয়া শ্রবণ।
ধরণীতে পড়ে জীব হয়ে অচেতন ॥
ক্ষণেক উঠিয়া বলে বড় ভাগ্য মম।
প্রভু নিত্যানন্দ কৃপা পাইল অধম ॥
সে সব বৈষ্ণবগণে দণ্ডবৎ হয়ে।
প্রণাম করয়ে জীব প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
বলে তুমি সবে মোরে হইলে সদয়।
নিত্যানন্দ পদ পাই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
জীবের সৌভাগ্য হেরি কতেক বৈষ্ণব।
চরণের ধূলি লয় করিয়া উৎসব ॥
সবে মেলি জীবে লয় নিত্যানন্দ যথা।
বৈষ্ণবে বেষ্টিতে প্রভু কহে কৃষ্ণকথা ॥
প্রভু নিত্যানন্দের দেখিয়া দিব্যরূপ।
জীবের শরীরে হয় ভাব অপরূপ ॥
কি অপূর্ব্বরূপ আজ হেরিনু বলিয়া।
পড়িল ধরণীতলে অচেতন হৈয়া ॥
মহাকৃপাবশে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
জীবে উঠাইয়া লয় আপনার পায় ॥
ব্যস্ত হয়ে শ্রীজীবগোস্বামী দাঁড়াইল।
করযুড়ি নিত্যানন্দে কহিতে লাগিল ॥
বিশ্বরূপ বিশ্বধাম তুমি বলরাম।
আমি জীব কিবা জানি তব গুণগ্রাম ॥
তুমি মোর প্রভু নিত্য আমি তব দাস।
তোমার চরণছায়া একমাত্র আশ ॥
তুমি যারে কর দয়া সেই অনায়াসে।
শ্রীচৈতন্য পদ পায় প্রেমজলে ভাসে ॥
তোমার করুণা বিনা গৌর নাহি পায়।
শত জন্ম ভজে যদি গৌরাঙ্গ হিয়ায় ॥
গৌর দণ্ড করে যদি তুমি রক্ষা কর।
তুমি যারে দণ্ড কর গৌর তার পর ॥
অতএব প্রভু তব চরনকমলে।
লইনু শরণ আমি সুকৃতির বলে ॥
তুমি কৃপা করি মোরে দেহ অনুমতি।
শ্রীগৌরদর্শনে পাই গৌরে হউ রতি ॥
যবে রামকেলিগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
আমার পিতৃব্যদ্বয়ে লইলেন পায় ॥

সেইকালে শিশু আমি সজলনয়নে।
হেরিলাম গৌররূপ সদা জাগে মনে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গপদে পড়ি করিনু প্রণতি।
শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া সুখ পাইলাম অতি ॥
সেই কালে গৌর মোরে কহিলা বচন।
ওহে জীব কর তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন ॥
অধ্যয়ন সমাপিয়া নবদ্বীপে চল।
নিত্যানন্দ শ্রীচরণে পাইবে সকল ॥
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি আমি অকিঞ্চন।
যথা সাধ্য বিদ্যা করিয়াছি উপার্জ্জন ॥
চন্দ্রদ্বীপে পড়িলাম সাহিত্যাদি যত।
বেদান্ত আচার্য্য নাহি পাই মনোমত ॥
প্রভু আজ্ঞা ছিল মোরে বেদান্ত পড়িতে।
বেদান্ত সম্মত কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিতে ॥
আইলাম নবদ্বীপে তোমার চবণে।
যেইরূপ আজ্ঞা হয় করি আচরণে ॥
আজ্ঞা হয় যাই ক্ষেত্রে প্রভুর চরণে।
বেদান্ত পড়িব সার্ব্বভৌমের সদনে ॥
জীবের মধুর বাক্যে নিত্যানন্দরায়।
জীবে কোলে করি কাঁদে ধৈর্য্য নাহি পায় ॥
বলে শুন ওহে জীব নিগূঢ় বচন।
সর্ব্বতত্ত্ব অবগত রূপ সনাতন ॥
প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল বলিতে তোমায়।
ক্ষেত্রে নাহি যাও তুমি না রহ হেথায় ॥
তুমি আর রূপ সনাতন দুই ভাই।
প্রভুর একান্ত দাস জানেন সবাই ॥
তোমা প্রতি আজ্ঞা এই বারাণসী গিয়া।
বাচস্পতি নিকটেতে বেদান্ত পড়িয়া ॥
একেবারে যাহ তথা হৈতে বৃন্দাবন।
তথা কৃপা করিবেন রূপ সনাতন ॥
রূপের অনুগ হয়ে যুগল-ভজন।
কর তথা বেদান্তাদি শাস্ত্র-আলাপন ॥
ভাগবত শাস্ত্র হয় সর্ব্বশাস্ত্র সার।
বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করহ প্রচার ॥
সার্ব্বভৌমে কৃপা করি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা কৈল ভাগবত ধরি ॥
সেই বিদ্যা সার্ব্বভৌম শ্রীমধুসূদনে।
শিখাইল ক্ষেত্রধামে পরম যতনে ॥
সেই মধুবাচস্পতি প্রভু আজ্ঞা পেয়ে।
আছে বারাণসীধামে দেখ তুমি যেয়ে ॥
বাহ্যে তেঁহ সম্প্রদায়ী বৈদান্তিক হয়।
শাঙ্করী সন্ন্যাসী তাঁর নিকটে পড়য় ॥
ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীগণেরে কৃপা করি।
গৌরাঙ্গের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয় সূত্র ধরি ॥
পৃথক ভাষ্যের এবে নাহি প্রয়োজন।
ভাগবতে কর সূত্র ভাষ্যেতে গণন ॥
কালে যবে ভাষ্যের হইবে প্রয়োজন।
শ্রীগোবিন্দভাষ্য তবে হবে প্রকটন ॥
সার্ব্বভৌম স্বসম্পর্কে যেই গোপীনাথ।
শুনিল প্রভুর ভাষ্য সার্ব্বভৌম সাথ ॥
কালে তেঁহ প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম লয়ে।
বলদেবাবেশে যাবে জয়পুর জয়ে ॥
তথা শ্রীগোবিন্দ বলে ভাষ্য প্রকাশিয়া।
সেবিবে গৌরাঙ্গপদ জীবে নিস্তারিয়া ॥
এই সব গূঢ় কথা রূপ সনাতন।
সকল কহিবে তোমা প্রতি দুইজন ॥
নিত্যানন্দ বাক্য শুনি শ্রীজীব গোঁসাই।
কাঁদিয়া লোটায় ভূমে সংজ্ঞা আর নাই ॥

কৃপা করি প্রভু নিজ চরণযুগল।
শ্রীজীবের শিবে ধরি অর্পিলেন বল ॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দরায়।
বলিয়া নাচেন জীব বৈষ্ণব সভায় ॥
শ্রীবাসাদি ছিল তথা যত মহাজন।
জীবে নিত্যানন্দ কৃপা করি দরশন ॥
সবে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলি।
মহাকলরবে তথা হয় হুলুস্থূলী ॥
কতক্ষণ পরে নৃত্য করি সম্বরণ।
জীবে লয়ে নিত্যানন্দ বসিল তখন ॥
জীবের হইল বাসা শ্রীবাসঅঙ্গনে।
সন্ধ্যাকালে আইল পুন প্রভু দরশনে ॥
নির্জ্জনে বসিয়া প্রভু গৌরগুণ গায়।
শ্রীজীব আসিয়া পড়ে নিত্যানন্দ পায় ॥
যত্ন করি প্রভু তারে নিকটে বসায়।
কর যোড় করি জীব স্বদৈন্য জানায় ॥
জীব বলে প্রভু মোরে করুণা করিয়া।
নবদ্বীপধাম তত্ত্ব বলে বিবরিয় ॥
প্রভু বলে ওহে জীব বলিব তোমায়।
অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্ব রাখিবে হিয়ায় ॥
যথা তথা এবে ইহা না কর প্রকাশ।
প্রকট লীলার অন্তে হইবে বিকাশ ॥
এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম সার।
শ্রীবিরজা ব্রহ্মধাম আদি হয়ে পার ॥
বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলক।
তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক ॥
সেই লোক দুই ভাবে হয়ত প্রকাশ।
মাধুর্য্য ঔদার্য্য ভেদে রসের বিকাশ ॥
মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পুর্ণ রূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পুর্ণ রূপেতে বিহিত ॥
তথাপিও যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রদান।
বৃন্দাবন বলি তাহা জানে ভাগ্যবান ॥
যে প্রকাশে ঔদার্য্য প্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপধাম সর্ব্ব বেদে কয় ॥ ॥
বৃন্দাবন নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ ভেদে করয় প্রভেদ ॥
এই ধাম নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় অনন্ত।
জড়-বুদ্ধি জনে তার নাহি পায় অন্ত ॥
হলাদিনী প্রভাবে জীব ছাড়ি জড়-ধর্ম্ম।
নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান বলে পায় তার ধর্ম্ম ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপ হয় চিন্ময় প্রকাশ।
সেই পীঠে শ্রীগৌরাঙ্গ করেন বিলাস ॥
চর্ম্ম চক্ষে লোকে দেখে প্রপঞ্চ গঠন।
মায়া আচ্ছাদিয়া রাখে নিত্য নিকেতন ॥
নবদ্বীপে মায়া নাই জড় দেশ কাল।
কিছু তথা নাহি আছে জীবের জঞ্জাল ॥
কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধ ক্রমে জীব মায়াবশে।
নবদ্বীপধামে প্রাপঞ্চিক ভাবে পশে ॥
ভাগ্যক্রমে সাধু সঙ্গে প্রেমের উদয়।
হয় যবে তবে দেখে বৈকুণ্ঠ চিন্ময় ॥
অপ্রাকৃত দেশ কাল ধাম দ্রব্য যত।
অনায়াসে দেখে স্বীয় চক্ষে অবিরত ॥
এই ত কহিনু আমি নবদ্বীপ তত্ত্ব।
বিচারিয়া দেখ জীব হয়ে শুদ্ধ সত্ত্ব ॥
নিতাই জাহ্নবা পদে নিত্য যার আশ।
গূঢ় তত্ত্ব করে ভক্তিবিনোদ প্রকাশ ॥

পঞ্চম অধ্যায় : শ্রীমায়াপুর ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপের কথা

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জাহ্নবী জীবন ॥
জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্ব ধাম সার।
যথা কলিযুগে হৈল গৌর অবতার ॥
নিত্যানন্দপ্রভু বলে শুনহ বচন।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ যথা বৃন্দাবন ॥
এই ষোল ক্রোশ মধ্যে দ্বীপ হয় নয়।
অষ্টদল পদ্ম যেন জলেতে ভাসয় ॥
অষ্টদল অষ্টদ্বীপ মধ্যে অন্তর্দ্বীপ।
তার মাঝে মায়াপুর মধ্যবিন্দুটীপ ॥
মায়াপুর যোগপীঠ সদা গোলাকার।
তথা নিত্য চৈতন্যের বিবিধ বিহার ॥
ত্রিসহস্রধনু তার পরিধি প্রমাণ।
সহস্রেকধনু তার ব্যাসের বিধান ॥
এই যোগপীঠ মাঝে বৈসে পঞ্চতত্ত্ব।
অন্যস্থান হৈতে যোগ পীঠের মহত্ত্ব ॥
অতি শীঘ্র গুপ্ত হবে প্রভুর ইচ্ছায়।
ভাগীরথী জলে হবে সংগোপিত প্রায় ॥
কভু পুন প্রভু ইচ্ছা হবে বলবান।
প্রকাশ হইবে ধাম হবে দীপ্তমান ॥
নিত্যধাম কভু কালে লোপ নাহি হয়।
গুপ্ত হয়ে পুনর্ব্বার হয়ত উদয় ॥
ভাগীরথী পূর্ব্ব তীরে হয় মায়াপুর।
মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর ॥
লোক দৃষ্টে সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বম্ভর।
ছাড়ি নবদ্বীপ ফিরে দেশ দেশান্তর ॥
বস্তুত গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপধাম।
ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম ॥
দৈনন্দিন লীলা তাঁর দেখে ভক্তগণ।
তুমিও দেখহ জীব গৌরাঙ্গ নর্ত্তন ॥
মায়াপুর অন্তে অন্তর্দ্বীপ শোভা পায়।
গৌরাঙ্গ দর্শন ব্রহ্মা পাইল যথায় ॥
ওহে জীব চাহ যদি দেখিতে সকল।
পরিক্রমা কর তুমি হইবে সফল ॥
প্রভুবাক্য শুনি জীব সজলনয়নে।
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে ॥
কৃপা যদি কর প্রভু এই অকিঞ্চনে।
সঙ্গে লয়ে পরিক্রমা করাও আপনে ॥
জীবের প্রার্থনা শুনি নিত্যানন্দরায়।
তথাস্তু বলিয়া নিজ মানস জানায় ॥
প্রভু বলে ওহে জীব অদ্য মায়াপুর।
করহ দর্শন কল্য ভ্রমিব প্রচুর ॥
এত-বলি নিত্যানন্দ উঠিল তখন।
পাছে পাছে উঠে জীব প্রফুল্লিত মন ॥
চলে নিত্যানন্দরায় মন্দ মন্দ গতি।
গৌরাঙ্গ-প্রেমেতে দেহ সুবিহ্বল অতি ॥
মোহন মুরতি প্রভু ভাবে ঢলঢল।
অলঙ্কার সর্ব্বদেহে করে ঝলমল ॥
যে চরণ ব্রহ্মা শিব ধ্যানে নাহি পায়।
শ্রীজীবে করিয়া কৃপা সে পদ বাড়ায় ॥
পাছে থাকি জীব লয় পদাঙ্কের ধূলি।
সর্ব্ব অঙ্গে মাখে চলে বড় কুতূহলী ॥

জগন্নাথ মিশ্র গৃহে করিল প্রবেশ।
শচীমাতা শ্রীচরণে জানায় বিশেষ ॥
শুনগো জননী এই জীব মহামতী।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়দাস ভাগ্যবান অতি ॥
বলিতে বলিতে জীব আছাড়িয়া পড়ে।
ছিন্ন মূল তরু যেন বড় বড় ঝড়ে ॥
শচীর চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি।
সাত্ত্বিক বিকার দেহে করে হুড়াহুড়ি ॥
কৃপা করি শচীদেবী কৈল আশীর্ব্বাদ।
সেই দিন সেই গৃহে পাইল প্রসাদ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবী আজ্ঞা যবে পাইল।
নানা অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিল ॥
শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভু কতক্ষণে।
শ্রীগৌরাঙ্গে ভোগ নিবেদিল সযতনে ॥
ঈশান ঠাকুর স্থান করি অতঃপর।
নিত্যানন্দে ভুঞ্জাইল হরিষ অন্তর ॥
পুত্র স্নেহে শচীদেবী নিত্যানন্দে বলে।
খাও বাছা নিত্যানন্দ জননীর স্থলে ॥
এই আমি গৌরচন্দ্রে ভুঞ্জানু গোপনে।
তুমি খাইলে বড় সুখী হই আমি মনে ॥
জননীর বাক্যে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
ভুঞ্জিল আনন্দে জীব অবশিষ্ট পায় ॥
জীব বলে ধন্য আমি মহাপ্রভু ঘরে।
পাইনু প্রসাদ অন্ন এই মায়াপুরে ॥
ভোজন করিয়া তবে নিত্যানন্দরায়।
শচীদেবী শ্রীচরণে হইল বিদায় ॥
যাইবার কালে সঙ্গে বংশীকে লইল।
শ্রীজীব বংশীর পদে প্রণতি করিল ॥
জীব প্রতি বলে প্রভু এ বংশীবদন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বংশী জানে ভক্তজন ॥
ইহার কৃপায় জীব হয় কৃষ্ণাকৃষ্ট।
মহারাস লভে সবে হইয়া সতৃষ্ণ ॥
দেখ জীব এই গৃহে চৈতন্যঠাকুর।
আমা সবা লয়ে লীলা করিল প্রচুর ॥
এই দেখ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দির।
বিষ্ণু পূজা নিত্য যথা করিতেন ধীর ॥
এই গৃহে করিতেন অতিথি সেবন।
তুলসীমণ্ডপ এই করহ দর্শন ॥
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র গৃহে ছিলা যত কাল।
পিতার আচার পালিতেন ভক্তপাল ॥
এবে সব বংশীঠাকুরের তত্ত্বাধীনে।
ঈশান নির্ব্বাহ করে প্রতি দিনে দিনে ॥
এই স্থানে ছিল এক নিম্ব বৃক্ষবর।
প্রভুর পরশে বৃক্ষ হইল অগোচর ॥
যত কাঁদে নিত্যানন্দ করিয়া বর্ণন।
জীব বংশী দুঁহে তত করেন ক্রন্দন ॥
দেখিতে দেখিতে তথা আইল শ্রীবাস।
চারি জনে চলে ছাড়ি জগন্নাথ বাস ॥
শত ধনু উত্তরেতে শ্রীবাসঅঙ্গন।
জীবে দেখাইল প্রভু আনন্দিত মন ॥
শ্রীবাসঅঙ্গনে জীব যায় গড়াগড়ি।
স্মরিয়া প্রভুর লীলা প্রেম হুড়াহুড়ি ॥
শ্রীজীব উঠিবামাত্র দেখে এক রঙ্গ।
নাচিছে গৌরাঙ্গ লয়ে ভক্ত অন্তরঙ্গ ॥
মহাসঙ্কীর্ত্তন দেখে বল্লভ নন্দন।
সর্ব্ব ভক্ত মাঝে প্রভুর অপূর্ব্ব নর্ত্তন ॥
নাচিছে অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গদাধর হরিদাস নাচে আর গায় ॥

শুক্লাম্বর নাচে আর শতশত জন।
দেখিয়া প্রেমেতে জীব হৈল অচেতন ॥
চেতন পাইলে আর সে রঙ্গ না ভায়।
কাঁদি জীবগোস্বামী করেন হায় হায় ॥
কেন মোর কিছু পূর্ব্বে জনম নহিল।
এমন কীর্ত্তনানন্দ ভাগ্যে না ঘটিল ॥
প্রভু নিত্যানন্দ কৃপা অসীম অনন্ত।
সেই বলে ক্ষণকাল হৈনু ভাগ্যবন্ত ॥
ইচ্ছা হয় মায়াপুরে থাকি চিরকাল।
ঘুচিবে সম্পূর্ণ রূপে মায়ার জঞ্জাল ॥
দাসের বাসনা হৈতে প্রভু আজ্ঞা বড়।
মায়াপুর ছাড়িতে অন্তর ধড়ফড় ॥
তথাহৈতে নিত্যানন্দ জীবে লয়ে যায়।
দশ ধনু উত্তরে অদ্বৈত গৃহ পায় ॥
প্রভু বলে দেখ জীব সীতানাথালয়।
হেথা বৈষ্ণবের গোষ্ঠী সদাই মিলয় ॥
হেথা সীতানাথ কৈল কৃষ্ণের পূজন।
হুঙ্কারে আনিল মোর শ্রীগৌরাঙ্গ ধন ॥
তথা গড়াগড়ি দিয়া চলে চারিজন।
পঞ্চধনু পূর্ব্বে গদাধরের ভবন ॥
তথা হৈতে দেখাইল নিত্যানন্দরায়।
সর্ব্ব পারিষদ গৃহ যথায় তথায় ॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী গৃহ করিয়া দর্শন।
তবে চলে গঙ্গাতীরে হর্ষে চারিজন ॥
মায়াপুর সীমা শেষে বৃদ্ধ শিবালয়।
জাহ্নবীর তটে দেখে জীব মহাশয় ॥
প্রভু বলে মায়াপুরে ইনি ক্ষেত্রপাল।
প্রৌঢ়ামায়া শক্তি অধিষ্ঠান নিত্যকাল ॥
প্রভু যবে অপ্রকট হইবে তখন।
তাঁহার ইচ্ছায় গঙ্গা হইবে বর্দ্ধন ॥
মায়াপুর প্রায় গঙ্গা আচ্ছাদিবে জলে।
শতবর্ষ রাখি পুন ছাড়িবেন বলে ॥
স্থান মাত্র জাগিবেক গৃহ না রহিবে।
বাসহীন হয়ে কতকাল স্থিত হবে ॥
পুন কভু প্রভু ইচ্ছা হবে বলবান।
হবে মায়াপুরে এইরূপ বাসস্থান ॥
এইসব ঘাট গঙ্গাতীরে পুন হবে।
প্রভুর মন্দির করিবেন ভক্ত সবে ॥
অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ ॥
প্রৌঢ়ামায়া বৃদ্ধশিব আসি পুনরায়।
নিজ কার্য্য সাধিবেক প্রভুর ইচ্ছায় ॥
এত শুনি জীব তবে করযোড় করি।
প্রভুরে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা পদযুগ ধরি ॥
ওহে প্রভু তুমি শেষ তত্ত্বের নিদান।
ধামরূপ নামতত্ত্ব তোমারি বিধান ॥
যদিও প্রভুর ইচ্ছামতে কর্ম্ম কর।
তবু জীব গুরু তুমি সর্ব্ব শক্তি ধর ॥
গৌরাঙ্গে তোমাতে ভেদ যেই জন করে।
পাষণ্ডী মধ্যেতে তারে বিজ্ঞজনে ধরে ॥
সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তুমি লীলা অবতার।
সংশয় জাগিল এক হৃদয়ে আমার ॥
যে সময় গঙ্গা লুকাইবে মায়াপুর।
কোথা যাবে শিব শক্তি বলহ ঠাকুর ॥
নিত্যানন্দ বলে জীব শুনহ বচন।
গঙ্গার পশ্চিম ভূমি করহ দর্শন ॥
ঐ উচ্চ চড়া দেখ পারডাঙ্গা নাম।
তথা আছে বিপ্রমণ্ডলীর এক গ্রাম ॥

তাহার উত্তরে আছে জাহ্নবী পুলিন।
ছিন্নডেঙ্গা বলি তারে জানেন প্রবীণ ॥
এইত পুলিনে এক নগর বসিবে।
তথা শিব শক্তি কিছু দিবস রহিবে ॥
ও পুলিন মাহাত্ম্য কে কহিবারে পারে।
রাসস্থলী আছে যথা জাহ্নবীর ধারে ॥
বালুময় ভূমি বটে চর্ম্ম চক্ষে ভায়।
রত্নময় নিত্যধাম দিব্য লীলা তায় ॥
মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন।
পারডাঙ্গা সট্টীকার স্বরূপ গণন ॥
তথা আছে বৃন্দাবন শ্রীরাসমণ্ডল।
কালে ঐ স্থানে হবে গান কোলাহল ॥
মায়াপুর শ্রীপুলিন মধ্যে ভাগীরথী।
সব লয়ে গৌরধাম জান মহামতি ॥
পঞ্চ ক্রোশ ধাম যেবা করিবে ভ্রমণ।
মায়াপুর শ্রীপুলিন করিবে দর্শন ॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে যে করে ভ্রমন।
পঞ্চক্রোশ ভক্তসহ পায় নিত্যধন ॥
ওহে জীব গূঢ় কথা শুনহ আমার।
শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি শোভে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ॥
ঐ কালে মিশ্রবংশোদ্ভব বিপ্রগণ।
সট্টীকার ধামে লবে শ্রীমূর্ত্তিরতন ॥
চারিশত বর্ষ গৌর জন্ম দিন ধরি।
হইলে শ্রীমুর্ত্তি সেবা হবে সর্ব্বোপরি ॥
এই সব কথা এবে রাখ অপ্রকাশ।
পরিক্রমা কর হয়ে অন্তরে উল্লাস ॥
বৃদ্ধশিব ঘাট হৈতে ত্রিধনু উত্তর।
গৌরাঙ্গের নিজঘাট দেখ বিজ্ঞবর ॥
এই স্থানে বাল্যলীলা ছলে গৌরহরি।
ভাগীরথী ক্রীড়া করিলেন চিত্ত ভরি ॥
যমুনার ভাগ্য দেখি হিমাদ্রি-নন্দিনী।
বহুতপ কৈল হৈতে লীলার সঙ্গিনী ॥
কৃষ্ণ কৃপা করি বলে দিয়া দরশন।
গৌর রূপে তব জলে করিব ক্রীড়ন ॥
সেই লীলা কৈল হেথা ত্রিভুবনরায়।
ভাগ্যবান জীব দেখি বড় সুখ পায় ॥
পঞ্চদশধনু যেই ঘাট তদুত্তরে।
মাধাইয়ের ঘাট বলি ব্যক্ত চরাচরে ॥
তার পাঁচধনুর উত্তরে ঘাট শোভা।
নাগরীয়া জনের সর্ব্বদা মনোলোভা ॥
বারকোণা ঘাট এই অতীব সুন্দর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিলেন প্রভু আজ্ঞাধর ॥
এই ঘাটে দেখ জীব পঞ্চশিবালয়।
পঞ্চতীর্থ লিঙ্গ পঞ্চ সদা জ্যোতির্ম্ময় ॥
এই চারি ঘাট মায়াপুর শোভাকরে।
যথায় করিলে স্নান সর্ব্ব দুঃখ হরে ॥
মায়াপুর পূর্ব্ব দিকে আছে যেই স্থান।
অন্তর্দ্বীপ বলি তার নাম বিদ্যমান ॥
এবে প্রভু ইচ্ছামতে লোক বাস হীন।
এই রূপ স্থিতি রহে আরো কত দিন ॥
কতকালে পুন হেথা লোক বাস হবে।
প্রকাশ হইবে স্থান নদীয়াগৌরবে ॥
ওহে জীব অদ্য তুমি রহ মায়াপুরে।
কল্য লয়ে যাব আমি সীমান্ত নগরে ॥
এত শুনি জীব তবে বলেন বচন।
সংশয় উঠিল এক করহ শ্রবণ ॥
যাবে গঙ্গাদেবী মায়াপুর আচ্ছাদন।
উঠাইয়া লইবেন না রবে গোপন ॥

সেই কালে ভক্তগণ কোন চিহ্ন ধরি ।
প্রকাশিবে গুপ্তস্থান বল ব্যক্ত করি ॥
জীবের বচন শুনি নিত্যানন্দরায় ।
বলিলা উত্তর তবে অমৃতের প্রায় ॥
শুন জীব গঙ্গা যবে আচ্ছাদিবে স্থান ।
মায়াপুর এক কোণ রবে বিদ্যমান ॥
তথায় যবন বাস হইবে প্রচুর ।
তথাপি রহিবে নাম তার মায়াপুর ॥
অবশিষ্ট স্থানের পশ্চিম দক্ষিণেতে ।
পঞ্চশতধনু পারে পাইবে দেখিতে ॥
কিছু উচ্চ স্থান সদা তৃণ আবরণ ।
সেই স্থান জগন্নাথমিশ্রের ভবন ॥
তথা হৈতে পঞ্চধনু বৃদ্ধ শিবালয় ।
এই পরিমাণ ধরি করিবে নির্ণয় ॥
শিবডোবা বলি খাত দেখিতে পাইবে ।
সেই খাত গঙ্গাতীরে বলিয়া জানিবে ॥
ভক্তগণ এইরূপে প্রভুর ইচ্ছায় ।
প্রকাশিবে লুপ্ত স্থান জানহ নিশ্চয় ॥
প্রভুর শতাব্দী চতুষ্টয় অন্ত যবে ।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের যত্ন হবে তবে ॥
শ্রীজীব বলেন প্রভু বলহ এখন ।
অন্তর্দ্বীপ নামের যে যথার্থ করণ ॥
প্রভু বলে এই স্থানে দ্বাপরের শেষে ।
তপস্যা করিল ব্রহ্মা গৌরকৃপা আশে ॥
গোবৎস গোপাল সব করিয়া হরণ ।
ছলিল করিয়া মায়া গোবিন্দের মন ॥
নিজ মায়া পরাজয় দেখি চতুর্ম্মুখ ।
নিজকার্য্য দোষে বড় পাইল অসুখ ॥
বহুস্তব করি কৃষ্ণে করিল মিনতি ।
ক্ষমিল তাহার দোষ বৃন্দবনপতি ॥
তবু ব্রহ্মা মনে মনে করিল বিচার ।
ব্রহ্মবুদ্ধি মোর হয় অতিশয় ছার ॥
এই বুদ্ধি দোষে কৃষ্ণপ্রেমেতে রহিত ।
ব্রজলীলা রস ভোগে হইনু বঞ্চিত ॥
গোপাল হইয়া জন্ম পাইতাম আমি ।
সেবিতাম অনায়াসে গোপিকার স্বামী ॥
সে লীলা রসেতে মোর না হইল গতি ।
এবে শ্রীগৌরাঙ্গে মোর না হয় কুমতি ॥
এইবলি বহুকাল অন্তর্দ্বীপ স্থানে ।
তপস্যা করিয়া ব্রহ্মা রহিল ধেয়ানে ॥
কতদিনে গৌরচন্দ্র করুণা করিয়া ।
চতুর্ম্মুখ সন্নিধানে কহেন আসিয়া ॥
ওহে ব্রহ্মা তব তপে তুষ্ট হয়ে আমি ।
আসিলাম দিতে যাহা আশা কর তুমি ॥
নয়ন মেলিয়া ব্রহ্মা দেখি গৌররায় ।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল তথায় ॥
ব্রহ্মার মস্তকে প্রভু ধরিল চরণ ।
দিব্যজ্ঞান পেয়ে ব্রহ্মা করয় স্তবন ॥
আমি দীন হীন অতি অভিমান বশে ।
পাসরিয়া তব পদ ফিরি জড় রসে ॥
আমি পঞ্চানন ইন্দ্র আদি দেবগণ ।
অধিকৃত দাস তব শাস্ত্রের লিখন ॥
শুদ্ধ দাস হৈতে আমাদের ভাগ্য নয় ।
অতএব মায়া মোহ জাল বিস্তারয় ॥
প্রথম পরার্দ্ধ মোর কাটিল জীবন ।
এবেত চরম চিন্তা করয়ে পেষণ ॥
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ মোর কাটিবে কেমনে ।
বহির্ম্মুখ হইলে যাতনা বড় মনে ॥

এইমাত্র তব পদে প্রার্থনা আমার।
প্রকট লীলায় যেন হই পরিবার ॥
ব্রহ্মবুদ্ধি দূরে যায় হেন জন্ম পাই।
তোমার সঙ্গেতে থাকি তবগুণ গাই ॥
ব্রহ্মার পার্থনা শুনি গৌর ভগবান্।
তথাস্তু বলিয়া বর করিলেন দান ॥
যে সময় মম লীলা প্রকট হইবে।
যবনের গৃহে তুমি জনম লভিবে ॥
আপনাকে হীন বলি হইবে গেয়ান।
হরিদাস হবে তুমি শূন্য অভিমান ॥
তিন লক্ষ হরিনাম জিহ্বাগ্রে নাচিবে।
নির্যাণ সময়ে তুমি আমাকে দেখিবে ॥
এই ত সাধন বালে দ্বিপরার্দ্ধ শেষে।
পাবে নবদ্বীপধাম মজি নিত্যরসে ॥
ওহে ব্রহ্মা শুন মোর অন্তরের কথা।
ব্যক্ত কভু না করিবে শাস্ত্রে যথা তথা ॥
ভক্তভাব লয়ে ভক্তিরস আস্বাদিব।
পরম দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিব ॥
অন্য অন্য অবতার কালে ভক্ত যত।
ব্রজরসে সবে মাতাইব করি রত ॥
শ্রীরাধিকা প্রেমবদ্ধ আমার হৃদয়।
তাঁর ভাব কান্তি লয়ে হইব উদয় ॥
কিবা সুখ রাধা পায় আমারে সেবিয়া।
সেই সুখ আস্বাদিব রাধা ভাব লৈয়া ॥
আজি হৈতে তুমি মোর শিষ্যতা লভিবে।
হরিদাস রূপে মোরে সতত সেবিবে ॥
এত বলি মহাপ্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।
আছাড়িয়া পড়ে ব্রহ্মা হইয়া অজ্ঞান ॥
হা গৌরাঙ্গ দীনবন্ধু ভকত বৎসল।
কবে বা পাইব তব চরণ কমল ॥
এই মত কত দিন কাঁদিতে কাঁদিতে।
ব্রহ্মলোকে গেলা ব্রহ্মা কার্য্য সম্পাদিতে ॥
নিতাই জাহ্নবা পদে আশা মাত্র যার।
নদীয়া মাহাত্ম্য গায় দীন হীন ছার ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় : শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীপৃথুকুণ্ড, শ্রীসীমন্তদ্বীপ, শ্রীবিশ্রামস্থানাদি দর্শন

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু জাহ্নবা জীবন ॥
জয় জয় সীতানাথ জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর ॥
পরদিন প্রাতে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
শ্রীবাস শ্রীজীব লয়ে গৃহ বাহিবার ॥
সঙ্গে চলে রামদাস আদি ভক্তগণ।
যাইতে যাইতে করে গৌর সঙ্কীর্ত্তন ॥
অন্তর্দ্বীপ প্রান্তে প্রভু আইলা যখন।
শ্রীগঙ্গানগর জীবে দেখায় তখন ॥
প্রভু বলে শুন জীব এ গঙ্গানগর।
স্থাপিলেন ভাগীরথ রঘু বংশধর ॥
যবে গঙ্গা ভাগীরথী আইল চলিয়া।
ভগীরথ যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া ॥

নবদ্বীপধামে আসি গঙ্গা হয় স্থির।
ভগীরথ দেখে গঙ্গা না হয় বাহির ॥
ভয়েতে বিহ্বল হয়ে রাজা ভগীরথ।
গঙ্গার নিকটে আইল ফিরি কত পথ ॥
গঙ্গানগরেতে বসি তপ আরম্ভিল।
তপে তুষ্ট হয়ে গঙ্গা সাক্ষাৎ হইল ॥
ভগীরথ বলে মাতা তুমি নাহি গেলে।
পিতৃলোক উদ্ধার না হবে কোন কালে ॥
গঙ্গা বলে শুন বাছা ভগীরথ বীর।
কিছু দিন তুমি হেথা হয়ে থাক স্থির ॥
মাঘমাসে আসিয়াছি নবদ্বীপধামে।
ফাল্গুনের শেষে যাব তব পিতৃকামে ॥
যাহার চরণজল আমি ভগীরথ।
তার নিজধামে মোর পূরে মনোরথ ॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি প্রভু জন্ম দিন।
সেই দিন মম ব্রত আছে সমীচীন ॥
সেই ব্রত উদ্যাপন করিয়া নিশ্চয়।
চলিব তোমার সঙ্গে না করিহ ভয় ॥
এ গঙ্গানগরে রাজা রঘুকুলপতি।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে করিল বসতি ॥
যেই জন শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবসে।
গঙ্গা স্নান করি গঙ্গানগরেতে বসে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা করে উপবাস করি।
পূর্ব্ব পুরুষের সহ সেই যায় তরি ॥
সহস্র পুরুষ পূর্ব্বগণ সঙ্গে করি।
শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হয় যথা তথা মরি ॥
ওহে জীব এস্থানের মাহাত্ম্য অপার।
শ্রীচৈতন্য নৃত্য যথা কৈল কতবার ॥
গঙ্গাদাস গৃহে আর সঞ্জয় আলয়।
ঐ দেখ দৃষ্ট হয় সদা সুখময় ॥
ইহার পূর্ব্বেতে যেই দীর্ঘিকা সুন্দর।
তাহার মাহাত্ম্য শুন ওহে বিজ্ঞবর ॥
বল্লালদীর্ঘিকা নাম হয়েছে এখন।
সত্যযুগে ছিল এর কত বিবরণ ॥
পৃথু নামে মহারাজা উচ্চ নীচ স্থান।
কাটিয়া পৃথিবী যবে করিল সমান ॥
সেইকাল এই স্থান সমান করিতে।
মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রভা উঠে চতুর্ভিতে ॥
কর্ম্মাচারীগণ মহারাজারে জানায়।
রাজা আসি জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখিবারে পায় ॥
শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু মহাশয়।
ধ্যানেতে জানিল স্থান নবদ্বীপ হয় ॥
স্থানের মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার তরে।
আজ্ঞাদিল কর কুণ্ড স্থান মনোহরে ॥
যে কুণ্ড করিল তাহা পৃথুকুণ্ড নামে।
বিখ্যাত হইল সর্ব্ব নবদ্বীপধামে ॥
স্বচ্ছ জল পান করি গ্রামবাসীগণে।
কত সুখ পাইল তার কহিব কেমনে ॥
পরে সেই স্থানে শ্রীলক্ষ্মণসেন ধীর।
দীর্ঘিকা খনন কৈল বড়ই গভীর ॥
নিজ পিতৃলোকের উদ্ধার করি আশ।
বল্লালদীর্ঘিকা নাম করিল প্রকাশ ॥
ঐ দেখ উচ্চটিলা দেখিতে সুন্দর।
লক্ষ্মণসেনের গৃহ ভগ্ন অতঃপর ॥
এ সকল অলঙ্কার মহাতীর্থ স্থানে।
রাজগণ করে সদা পুণ্য উপার্জ্জনে ॥
পরেতে যবন রাজ দুষিল এস্থান।
অতএব ভক্তগণ না করে সম্মান ॥

ভূমি মাত্র সুপবিত্র এই স্থানে হয়।
যবন সংসর্গ ভয়ে বাস না করয় ॥
এস্থানে হইল শ্রীমূর্ত্তির অপমান।
অতএব ভক্তবৃন্দ ছাড়ে এই স্থান ॥
এতবলি নিত্যানন্দ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।
আইলেন সিমুলীয়া গ্রাম সন্নিহিতে ॥
সিমুলীয়া দেখি প্রভু জীব প্রতি কয়।
এইত সীমন্তদ্বীপ জানিহ নিশ্চয় ॥
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে নবদ্বীপ প্রান্তে।
সীমন্ত নামেতে দ্বীপ বলে সব শান্তে ॥
কালে এই দ্বীপ গঙ্গা গ্রাসিবে সকল।
রহিবে কেবল এক স্থান সুনির্ম্মল ॥
যথায় সিমুলী নামে পার্ব্বতী পূজন।
করিবে বিষয়ী লোক করহ শ্রবণ ॥
কোন কালে সত্যযুগে দেব মহেশ্বর।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নৃত্য করিল বিস্তর ॥
পার্ব্বতী জিজ্ঞাসে তবে দেব মহেশ্বরে।
কেবা সে গৌরাঙ্গ দেব বলহ আমারে ॥
তোমার অদ্ভুত নৃত্য করি দরশন।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ নাম গলে মোর মন ॥
এত যে শুনেছি মন্ত্র তন্ত্র এত কাল।
সে সব জানিনু মাত্র জীবের জঞ্জাল ॥
অতএব বল প্রভু গৌরাঙ্গ সন্ধান।
ভজিয়া তাঁহারে আমি পাইব পরাণ ॥
পার্ব্বতীর কথা শুনি দেব পশুপতি।
শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি কহে পার্ব্বতীর প্রতি ॥
আদ্যাশক্তি তুমি হও শ্রীরাধার অংশ।
তোমারে বলিব তত্ত্বগণ অবতংশ ॥
রাধাভাব লয়ে কৃষ্ণ কলিতে এবার।
মায়াপুরে শচীগর্ভে হবে অবতার ॥
কীর্ত্তন রঙ্গেতে মাতি প্রভু গোরামণি।
বিতরিবে প্রেমরত্ন পাত্র নাহি গণি ॥
এই প্রেম বন্যা জলে যে জীব না ভাসে।
ধিক তার ভাগ্যে দেবি জীবন বিলাসে ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা স্মরি প্রেমে যাই ভাসি।
ধৈরয না ধরে মন ছাড়িলাম কাশী ॥
মায়াপুর অন্তর্ভাগে জাহ্নবীর তীরে।
গৌরাঙ্গ ভজিব আমি রহিয়া কুটীরে ॥
ধূর্জ্জটির বাক্য শুনি পার্ব্বতীসুন্দরী।
আইলেন সীমন্ত দ্বীপেতে ত্বরা করি ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সদা করেন চিন্তন।
গৌর বলি প্রেমে ভাসে স্থির নহে মন ॥
কতদিনে গৌরচন্দ্র কৃপা বিতরিয়া।
পার্ব্বতীরে দেখা দিলা সগণে আসিয়া ॥
সুতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘ কলেবর।
মাথায় চাঁচর কেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥
ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র তার পরিধান।
গলে দোলে ফুলমালা অপূর্ব্ব বিধান ॥
প্রেমে গদ গদ বাক্য কহে গৌররায়।
বলগো পার্ব্বতী কেন আইলে হেথায় ॥
জগতের প্রভু পদে পড়িয়া পার্ব্বতী।
জানায় আপন দুঃখ স্থির নহে মতি ॥
ওহে প্রভু জগন্নাথ জগত জীবন।
সকলের দয়াময় মোর বিড়ম্বন ॥
তব বহির্ম্মুখ জীবে বন্ধন কারণ।
নিযুক্ত করিলে মোরে পতিত পাবন ॥
আমি থাকি সেই কাজে সংসার পাতিয়া।
তোমার অনন্ত প্রেমে বঞ্চিত হইয়া ॥

লোকে বলে যথা কৃষ্ণ মায়া নাই তথা।
আমি তবে বহির্ম্মুখ হইনু সর্ব্বথা॥
কেমনে দেখিব প্রভু তোমার বিলাস।
তুমি না করিলে পথ হইনু নৈরাশ॥
এতবলি শ্রীপার্ব্বতী গৌর পদধূলী।
সীমন্তে লইল সতী করিয়া আকুলী॥
সেই হৈতে শ্রীসীমন্তদ্বীপ নাম হৈল।
সিমুলীয়া বলি অজ্ঞ জনেতে কহিল॥
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র তবে প্রসন্ন হইয়া।
বলিল পার্ব্বতী শুন কথা মন দিয়া॥
তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি সর্ব্বেশ্বরী।
এক শক্তি দুই রূপ মম সহচরী॥
স্বরূপশক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গা রূপে রাধা তোমাতে বিস্তার॥
তুমি নৈলে মোর লীলা সিদ্ধ নাহি হয়।
তুমি যোগ মায়া রূপে লীলাতে নিশ্চয়॥
ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসী রূপে নিত্য কাল।
নবদ্বীপে পৌঢ়ামায়া সহ ক্ষেত্রপাল॥
এতবলি শ্রীগৌরাঙ্গ হৈল অদর্শন।
প্রেমাবিষ্ট হয়ে রহে পার্ব্বতীর মন॥ ॥
সীমান্তিনীদেবী রূপে রহে একভিতে।
প্রৌঢ়ামায়া মায়াপুরে রহে গৌর প্রীতে॥
এত বলি নিত্যানন্দ কাজির নগরে।
প্রবেশিল জীবে লয়ে তখন সত্বরে॥
প্রভু বলে ওহে জীব শুনহ বচন।
কাজির নগর এই মথুরা ভুবন॥
হেথা শ্রীগৌরাঙ্গ রায় কীর্ত্তন করিয়া।
কাজি নিস্তারিল প্রভু প্রেম রত্ন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণলীলায় যেই কংশ মথুরায়।
গৌরাঙ্গলীলায় চাঁদকাজি নাম পায়॥
এই জন্য প্রভু তারে মাতুল বলিল।
ভয়ে কাজি গৌর পদে শরণ লইল॥
কীর্ত্তন আরম্ভে কাজি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল।
হোসেন সাহার বলে উৎপাত করিল॥
হোসেনসা সে জরাসন্ধ গৌড় রাজ্যেশ্বর।
তাহার আত্মীয় কাজি প্রতাপ বিস্তর॥
প্রভু তারে নৃসিংহ রূপেতে দেয় ভয়।
ভয়ে কংস সম কাজী জড় সড় হয়॥
তারে প্রেম দিয়া কৈল বৈষ্ণব প্রধান।
কাজির নিস্তার কথা শুনে ভাগ্যবান্॥
ব্রজতত্ত্ব নবদ্বীপ তত্ত্বে দেখ ভেদ।
কৃষ্ণ অপরাধী লভে নির্ব্বাণ অভেদ॥
হেথা অপরাধী পায় প্রেমরত্ন ধন।
অতএব গৌরলীলা সর্ব্বোপরি হন॥
গৌরধাম গৌরনাম গৌররূপ গুণ।
অপরাধ নাহি মানে তারিতে নিপুণ॥
যদি অপরাধ থাকে সাধকের মনে।
কৃষ্ণনামে কৃষ্ণধামে তারে বহুদিনে॥
গৌরনামে গৌরধামে সদ্য প্রেম হয়।
অপরাধ নাহি তার বাধা উপযয়॥
ঐ দেখ ওহে জীব কাজির সমাধি।
দেখিলে জীবের নাশ হয় আধি ব্যাধি॥
এতবলি নিত্যানন্দ প্রেমে গরগর।
চলিলেন দ্রুত শঙ্খবণিক নগর॥
তথা গিয়া শ্রীজীবেরে বলেন বচন।
ওই দেখ শরডাঙ্গা অপূর্ব্ব দর্শন॥
শ্রীশরডাঙ্গা নাম অতি মনোহর।
জগন্নাথ বৈসে যথা লইয়া শবর॥

পূর্ব্বে যবে রক্তবাহু দৌরাত্ম্য করিল।
দয়িতা সহিত প্রভু হেথায় আইল ॥
শ্রীপুরুষোত্তম সম এই ধাম হয়।
নিত্য জগন্নাথ স্থিতি তথায় নিশ্চয় ॥
তবে তন্তুবায়গ্রাম হইলেন পার।
দেখিলেন খোলাবেচা শ্রীধর আগার ॥
প্রভু বলে এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
কীর্ত্তন বিশ্রাম কৈল ভক্তে কৃপা করি ॥
এই হেতু শ্রীবিশ্রামস্থান এর নাম।
হেথা শ্রীধরের ঘরে করহ বিশ্রাম ॥
শ্রীধর শুনিল যবে প্রভু আগমন।
সাষ্টাঙ্গে আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥
বলে প্রভু বড় দয়া এদাসের প্রতি।
বিশ্রাম করহ হেথা আমার মিনতি ॥
প্রভু বলে তুমি হও অতি ভাগ্যবান।
তোমারে করিল কৃপা গৌর ভাগবান ॥
অদ্য মোরা এই স্থানে করিব বিশ্রাম।
শুনিয়া শ্রীধর তবে হয় আপ্তকাম ॥
বহুযত্নে সেবাযোগ্য সামগ্রী লইয়া।
রন্ধন করায় ভক্ত ব্রাহ্মণেরে দিয়া ॥
নিতাই শ্রীবাস সেবা হৈলে সমাপন।
আনন্দে প্রসাদ পায় শ্রীজীব তখন ॥
নিত্যানন্দে খট্টোপরি করায় শয়ন।
সবংশে শ্রীধর করে পাদ সম্বাহন ॥
অপরাহ্নে শ্রীজীবেরে লইয়া শ্রীবাস।
ষষ্টিতীর্থ দেখাইল হইয়া উল্লাস॥
শ্রীবাস কহিল শুন জীব সদাশয়।
পূর্ব্বে দেবগণ যবে শুনিল নিশ্চয় ॥
নবদ্বীপে হবে মহাপ্রভু অবতার।
বিশ্বকর্ম্মা আইলেন নদীয়া নগর ॥
প্রভু যেই পথে করিবেন সঙ্কীর্ত্তন।
সেই পথে জলকষ্ট করিতে বারণ ॥
এক রাত্রে ষাট কুণ্ড কাটিল বিশাই।
শেষ কুণ্ড কাজিগ্রামে করিল কাটাই ॥
শ্রীধরের কলাবাগ দেখিতে সুন্দর।
ইহার নিকটে এক দেখ সরোবর ॥
এই সরোবরে কভু করি জলখেলা।
মহাপ্রভু লইলেন শ্রীধরের খোলা ॥
অদ্যাবধি মোচা থোড় লইয়া শ্রীধর।
শ্রীশচীমাতাকে দেয় উল্লাস অন্তর ॥
ইহার নিকটে ময়ামারি নাম স্থান।
দেখহ শ্রীজীব আজো আছে বিদ্যমান ॥
পৌরাণিক কথা এক করহ শ্রবণ।
তীর্থযাত্রা বলদেব করিল যখন ॥
নবদ্বীপে আসি যবে করিল বিশ্রাম।
বিপ্রগণ জানাইল ময়াসুর নাম ॥
ময়াসুর উপদ্রব শুনি হলধর।
মহাবেগে ধরে তারে মাঠের ভিতর ॥
মহাযুদ্ধ কৈল দৈত্য বলদেব সাথ।
অবশেষে রাম তারে করিল নিপাত ॥
সে অবধি ময়ামারি নাম খ্যাত হৈল।
বহুকাল কথা আজ তোমারে কহিল ॥
তালবন নাম এই তীর্থ ব্রজপুরে।
সদা ভাগ্যবান জন নয়নেতে স্ফুরে ॥
সেই রাত্রে সেই স্থানে থাকিলেন সবে।
পরদিন যাত্রা করে হরি হরি রবে ॥
নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া যার আশ।
নদীয়া মাহাত্ম্য করে এ দাস প্রকাশ ॥

সপ্তম অধ্যায় : শ্রীসুবর্ণবিহার ও শ্রীদেবপল্লী বর্ণন

জয় জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ,
জয়াদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত, গৌরপদে অনুরক্ত,
জয় নবদ্বীপধামবর ॥
ছাড়িয়া বিশ্রামস্থান, শ্রীজীবে লইয়া যান,
যথা গ্রাম সুবর্ণবিহার।
ওহে জীব প্রভু কয়, অপূর্ব্ব এস্থান হয়,
নবদ্বীপ প্রকৃতির পার ॥
সত্যযগে এইস্থানে, ছিল রাজা সবে জানে,
শ্রীসুবর্ণসেন তার নাম।
বহুকাল রাজ্য কৈল, পরেতে বার্দ্ধক্য হৈল,
তবু নাহি কার্য্যেতে বিশ্রাম ॥
বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত, কিসে বৃদ্ধি হয় বৃত্ত,
এই চিন্তা করে নরবর।
কি জানি কি ভাগ্যবশে, শ্রীনারদ তথা আইসে,
রাজা তাঁরে পূজিল বিস্তর ॥
নারদের দযা হৈল, তত্ত্ব উপদেশ কৈল,
রাজারে ত লইয়া নির্জ্জনে।
নারদ কহেন রায়, বৃথা তব দিন যায়,
অর্থ চিন্তা করি মনে মনে ॥
অর্থকে অনর্থ জান, পরমার্থ দিব্যজ্ঞান,
হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারা পুত্র বন্ধুজন, কেহ নহে নিজ জন,
মরণেতে কেহ নহে কার ॥
তোমার মরণ হলে, দেহটী ভাসায়ে জলে,
সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয় জল পিপাশা,
যদি কেহ নাহি হৈল কার ॥
যদি বল লভি সুখ, জীবনে না পাই দুঃখ,
অতএব অর্থ চেষ্টা করি।
সেহ মিথ্যা কথা রায়, জীবন অনিত্য হায়,
নাহি রহে শত বর্ষোপরি ॥
অতএব জান সার, যেতে হবে মায়াপার,
যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়।
কিসে বা সাধিব বল, সেই ত অপূর্ব্ব ফল,
যাহে নাহি শোক দুঃখ ভয় ॥
কেবল বৈরাগ্য করি, তাহা না পাইতে পারি,
কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য জ্ঞানের বলে, বিষয় বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥
কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার ॥
অতএব জ্ঞানীজন, ভুক্তি মুক্তি নাহি লন,
কৃষ্ণ ভক্তি করেন সাধন।
বিষয়েতে অনাশক্তি, কৃষ্ণ পদে অনুরক্তি,
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ॥
জীব সে কৃষ্ণের দাস, ভক্তিবিনা সর্ব্বনাশ,
ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেম ফল।
সেইফল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন,
ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ সে সকল ॥

কৃষ্ণচিদানন্দ রবি, মায়া তাঁর ছায়া ছবি,
জীব তাঁর কিরণানুগণ।
তটস্থ ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে,
মায়া তারে করয় বন্ধন ॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ যেই, মায়াস্পর্শী জীব সেই,
মায়া স্পর্শে কর্ম্ম সঙ্গ পায়।
মায়া জালে ভ্রমি মরে, কর্ম্ম জ্ঞানে নাহি তরে,
কষ্টনাশ মন্ত্রণা করায় ॥
কভু কর্ম্ম আচরয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগময়,
কভু ব্রহ্ম জ্ঞান আলোচন।
কভু কভু তর্ক করে, অবশেষে নাহি তরে,
নাহি মানে আত্মতত্ত্ব ধন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, ভক্তজন সঙ্গ হবে,
তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্ম্মল।
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভজি, হৃদয় অনর্থ ত্যজি,
নিষ্ঠা লাভ করে সুবিমল ॥
ভজিতে ভজিতে তবে, সেই নিষ্ঠা রুচি হবে,
ক্রমে রুচি হইবে আসক্তি।
আসক্তি হইবে ভাব, তাহে হবে প্রেমলাভ,
এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন মতি, সেবা কৃষ্ণার্চ্চন নতি,
দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন।
নবধা সাধন এই, ভক্ত সঙ্গে করে যেই,
সেই লভে কৃষ্ণ প্রেম ধন ॥
তুমি রাজা ভাগ্যবান, নবদ্বীপে তব স্থান,
ধামবাসে তব ভাগ্যোদয়।
সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা পেয়ে, কৃষ্ণনাম গুণ গেয়ে,
প্রেমসূর্য্যে করাও উদয় ॥
ধন্যকলি আগমনে, হেথা কৃষ্ণ লয়ে গণে,
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রকাশিবে।
যেই গৌরনাম লবে, তাতে কৃষ্ণ কৃপা হবে,
ব্রজে বাস সেই ত করিবে ॥
গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায় ॥
বলিতে বলিতে মুনি, অধৈর্য্য হয় অমনি,
নাচিতে লাগিল গৌর বলি।
গৌর হরি বোল ধরি, বীণা বলে গৌরহরি,
করে সে আসিবে ধন্যকলি ॥
এই সব বলি তায়, নারদ চলিয়া যায়,
প্রেমোদয় হইল রাজার।
গৌরাঙ্গ বলিয়া নাচে, সাধু হৈতে প্রেম হাচে
বিষয় বাসনা ঘুচে তার ॥
নিদ্রাকালে নরবর, দেখে গৌর গদাধর,
সপার্ষদে তাঁহার অঙ্গনে।
নাচে হরে কৃষ্ণ বলি, করে সবে কোলাকুলি,
সুবর্ণ প্রতিমা গৌর সনে ॥
নিদ্রাভাঙ্গি নরপতি, কাতর হইল অতি,
গৌর লাগি করয় ক্রন্দন।
দৈববাণী হৈল তায়, প্রকট সময়ে রায়,
হবে তুমি পার্ষদে গণন ॥
বুদ্ধিমন্তখাঁন নাম, পাইবে হে গুণধাম,
সেবিবে গৌরাঙ্গ রীচরণে।
দৈববাণী কাণে শুনি, স্থির হৈল নরমণি,
করে তবে গৌরাঙ্গ ভজন ॥

নিত্যানন্দ কথা শেষে, নারদের শক্ত্যাবেশে,
শ্রীবাস হইল অচেতন।
মহাপ্রেমাবেশে তবে, গৌরনামামৃতাসবে,
ভূমে লোটে শ্রীজীব তখন॥
আহা কি গৌরাঙ্গরায়, দেখিব আমি হেথায়,
সুবর্ণ পুতলী গোরামণি।
বলিতে বলিতে তবে, শ্রীগৌর কীর্ত্তন সবে,
নয়নেতে দেখয় অমনি॥
আহা সে অমিয় জিনি, গৌরাঙ্গের রূপ খানি,
নাচিতে লাগিল সেই মানে।
তবে নিত্যানন্দ রায়, গৌরাঙ্গের গুণগায়,
অদ্বৈত সহিত সর্ব্বজনে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, সঙ্কীর্ত্তন সুবিরাজে,
পূর্ব্বলীলা হইল বিস্তর।
কত যে আনন্দ হয়, বর্ণিতে শকতি নয়,
বেলা হৈল দ্বিতীয় প্রহর॥
তবেত চলিল সবে, গৌর গীত কলরবে,
দেবপল্লী গ্রামের ভিতর।
তথায় বিশ্রাম কৈল, দেবের অতিথি হৈল,
মধ্যাহ্ন ভোজন অতঃপর॥
দিবসের শেষ যামে, সকলে ভ্রময় গ্রামে,
প্রভু নিত্যানন্দ তবে কয়।
দেবপল্লী এই হয়, শ্রীনৃসিংহ দেবালয়,
সত্যযুগ হৈতে পরিচয়॥
প্রহ্লাদেরে দয়া করি, হিরণ্যে বধিয়া হরি,
এইস্থানে করিল বিশ্রাম।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, নিজ নিজ নিকেতন,
করি এক বসাইল গ্রাম॥
মন্দাকিনী তট ধরি, টিলায় বসতি করি,
নৃসিংহ সেবায় হৈল রত।
শ্রীনৃসিংহক্ষেত্র নাম, নবদ্বীপে এই ধাম,
পরমপাবন শাস্ত্রমত॥
সূর্য্যটিলা ব্রহ্মটিলা, নৃসিংহ পূরবে ছিলা,
এবে স্থানে হৈল বিপর্য্যয়।
গণেশের টিলা হের, ইন্দ্রটিলা তারপর,
এইরূপ বহু টিলাময়॥
বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়, নির্ম্মিল প্রস্তরময়,
কতশত দেবের বসতি।
কালে সব লোপ হৈল, মন্দাকিনী শুকাইল,
টিলামাত্র আছয় সম্প্রতি॥
শিলাখণ্ড অগণন, কর এবে দরশন,
সেই সব মন্দিরের শেষ।
পুন কিছুদিন পরে, এক ভক্ত নরবরে,
পাবে নৃসিংহের কৃপালেশ॥
বৃহৎ মন্দির করি, বসাইবে নরহরি,
পুনসেবা করিবে প্রকাশ।
নবদ্বীপ পরিক্রমা, তার এই এক সীমা,
ষোলক্রোশ মধ্যে এইবাস॥
নিতাই জাহ্নবা পদ, যে জনার সম্পদ,
সেই ভক্তিবিনোদ কাঙ্গাল।
নবদ্বীপ সুমহিমা, নাহি তার কভু সীমা,
তাহা গায় ছাড়ি মায়াজাল॥

অষ্টম অধ্যায় : শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীশ্রীগোদ্রুমদ্বীপ বর্ণন

জয় জয় জয় শ্রীশচীসুত।
জয় জয় জয় শ্রীঅবধূত ॥
সীতাপতি জয় ভকতরাজ।
গদাধর জয় ভক্ত সমাজ ॥
জয় নবদ্বীপ সুন্দর ধাম।
জয় জয় জয় গৌর কি নাম ॥
নিতাই সহিত ভকতগণ।
হরি হরি বলি চলে তখন ॥
ভাবে ঢল ঢল নিতাই চলে।
প্রেমে আধ আধ বচন বলে ॥
ঝর ঝর ঝরে আঁখির জল।
গোরা গোরা বলি হয় বিকল ॥
ঝক্মক্ করে ভূষণ মাল।
রূপে দশদিক হইল আল ॥
শ্রীবাস নাচিছে জীবের সনে।
কভু কাঁদে কভু নাচে সঘনে ॥
আর যত সব ভকতগণ।
নাচিতে নাচিতে চলে তখন ॥
অলকানন্দার নিকটে আসি।
বলেন নিতাই আনন্দে ভাসি ॥
বিল্বপক্ষগ্রাম পশ্চিমে-ধরি।
মন্দাকিনী আসে নদীয়া ঘেরি ॥
সুবর্ণবিহার দেখিলে যথা।
মন্দাকিনী ছাড়ে অলকা তথা ॥
অলকানন্দার পূরব পারে।
হরিহর ক্ষেত্র গণ্ডক ধারে ॥
শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ হইবে কালে।
সুন্দর কানন শোভিবে ভালে ॥
অলকা পশ্চিমে দেখহ কাশী।
শৈব শাক্ত সেবে মুকতি দাসী ॥
বারাণসী হতে এ ধাম পর।
হেথায় ধূর্জ্জটী পিনাকধর ॥
গৌর গৌর বলি সদাই নাচে।
নিজ জনে গৌর ভকতি যাচে ॥
সহস্র বরষ কাশিতে বসি।
লভে সে মুকতি জ্ঞানেতে ন্যাসী ॥
তাহাত হেথায় চরণে ঠেলি।
নাচেন ভকত গৌরাঙ্গ বলি ॥
নির্ষাণ সময়ে এখানে জীব।
কাণে গৌর বলি তারেণ শিব ॥
মহাবারাণসী এধাম হয়।
জীবের মরণে নাহিক ভয় ॥
এত বলি তথা নিতাই নাচে।
গৌর হরিপ্রেম জীবেরে যাচে ॥
অলক্ষে তখন কৈলাসপতি।
নিতাই চরণে করিল নতি ॥
গৌরী সহ শিব গৌরাঙ্গ নাম।
গাইয়া গাইয়া পূরয় কাম ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর নিতাই তবে।
ভকত সঙ্গেতে চলিল জবে ॥

গাদিগাছাগ্রামে পৌঁছিল আসি।
তথায় আসিয়া কহিল হাসি ॥
গোদ্রুম নামেতে এদ্বীপ হয়।
স্থরভি সতত এখানে রয় ॥
কৃষ্ণ মায়া বসে দেবেন্দ্র যবে।
ভাষায় গোকুল নিজ গৌরবে ॥
গোবর্দ্ধন গিরি ধরিয়া হরি।
রক্ষিল গোকুল যতন করি ॥
ইন্দ্র দর্প চূর্ণ হইলে পর।
শচীপতি চিনে সারঙ্গধর ॥
নিজ অপরাধ মার্জ্জন তবে।
পড়িল কৃষ্ণের চরণ ধরে ॥
দয়ার সমুদ্র নন্দতনয়।
ক্ষমিল ইন্দ্রেরে দিল অভয় ॥
তথাপি ইন্দ্রের রহিল ভয়।
স্থরভি নিকটে তখন কয় ॥
কৃষ্ণ লীলা মুই বুঝিতে নারি।
অপরাধ মম হইল ভারি ॥
শুনেছি কলিতে ব্রজেন্দ্র স্থত।
করিবে নদীয়া লীলা অদ্ভুত ॥
পাছে সে সময় মোহিত হব।
অপরাধী পুন হয়ে রহিব ॥
তুমিত স্থরভি সকল জান।
করহ এখন তাহার বিধান ॥
স্থরভি বলিল চলহ যাই।
নবদ্বীপধামে ভজি নিমাই ॥
দেবেন্দ্র স্থরভি হেথায় আসি।
গৌরাঙ্গ ভজন করিল বসি ॥
গৌরাঙ্গ ভজন সহজ অতি।
সহজ তাহার ফল বিততি ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্রন্দন করে।
গৌরাঙ্গ দর্শন হয় সত্বরে ॥
কিবা অপরূপ রূপলাবণি।
দেখিল গৌরাঙ্গ প্রতিমা খানি ॥
আধ আধ হাসি বরদ রূপ।
প্রেমে গদগদ রসের কূপ ॥
হাঁসিয়া বলেন ঠাকুর মোর।
জানিনু বাসনা অমিত তোর ॥
অল্পদিন আছে প্রকট কাল।
নদীয়ানগরে দেখিবে ভাল ॥
সে লীলা সময়ে সেবিবে মোরে।
মায়াজাল আর না ধরে তোরে ॥
এতবলি প্রভু অদৃশ্য হয়।
স্থরভি স্থন্দরী তথায় রয় ॥
অশ্বত্থ নিকটে রহিলা দেবী।
নিরন্তর গৌরচরণ সেবি ॥
গোদ্রুমদ্বীপ ত হইল নাম।
হেথায় পূরয় ভকত কাম ॥
হেথায় কুটীর বাঁধিয়া ভজে।
অনায়াসে গৌরচরণে মজে ॥
এই দ্বীপে কভু মৃকণ্ডস্থত।
প্রলয়ে আছিল কথা অদ্ভুত ॥
সাতকল্প আয়ু পাইল মুনি।
প্রলয়ে বড়ই বিপদ গণি ॥
জলময় হৈল সমস্ত স্থান।
কোথা বা রহিবে করে সন্ধান ॥
ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়।
কেন হেন বর লইনু হায় ॥

ষোলক্রোশ মাত্র নদীয়াধাম।
জাগিয়া ভকতে দেয় বিশ্রাম॥
জলের তরঙ্গে ভাসিয়া মুনি।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে অমনি॥
মহা কৃপা করি সুরভি তায়।
যতনে মুনিরে হেথা উঠায়॥
সম্বিত লভিয়া মৃকণ্ডুসুত।
দেখিল গোদ্রুমদ্বীপ অদ্ভুত॥
শতকোটীক্রোশ বিস্তার স্থান।
নদনদী শোভা প্রকাশ মান॥
তরুলতা কত শোভয় তথা।
পক্ষীগণ গায় শ্রীগৌরগাথা॥
যোজন বিস্তার অশ্বত্থ হের।
সুরভিকে তথা দর্শনকর॥
ক্ষুধায় আকুল মুনি তখন।
সুরভির প্রতি বলে বচন॥
তুমি ভগবতি রাখহ প্রাণ।
দুগ্ধ দিয়া মোরে করহ ত্রাণ॥
সুরভি তখন সদয় হয়ে।
পিয়াইল দুগ্ধ মুনিরে লয়ে॥
সবল হইয়া মৃকণ্ডুসূনু।
সুরভির প্রতি কহয় পুন॥
তুমি ভগবতি জননী মোর।
তোমার মায়ার জগত ভোর॥
না বুঝিয়া আমি লয়েছি বর।
সপ্তকল্প জীব হয়ে অমর॥
প্রলয় সময়ে বড়ই দুখ।
নানাবিধ ক্লেশ নাহিক সুখ॥
কি করি জননী বলগো মোরে।
কিসে বা যাইব এ দুখ তরে॥
সুরভি তখন বলিল বাণী।
ভজহ শ্রীগৌরপদ দুখানি॥
এই নবদ্বীপ প্রকৃতি পার।
কভু নাশ নাহি হয় ইহার॥
চর্ম্ম চক্ষে ইহা ষোড়শক্রোশ।
পরম বৈকুণ্ঠ সদা নির্দ্দোষ॥
অপ্রাকৃত দেশ কাল এখানে।
জড় মায়া কেবা কেহ না জানে॥
নয়দ্বীপে দেখ অপূর্ব্ব অতি।
চারি দিকে বেড়ে বিরজা সতী॥
শতকোটীক্রোশ প্রত্যেক খণ্ড।
মধ্যে মায়াপুর নগর গণ্ড॥
অষ্টদল অষ্টদ্বীপের মান।
অন্তর্দ্বীপ তার কেশর স্থান॥
সর্ব্ব তীর্থ সর্ব্ব দেবতা ঋষি।
গৌরাঙ্গ ভজিছে হেথায় বসি॥
তুমি মার্কণ্ডেয় গৌরাঙ্গপদ।
আশ্রয় করহ জানি সম্পদ॥
অকৈতব ধর্ম্ম আশ্রয় কর।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা সুদূরে ধর॥
গৌরাঙ্গ ভজন আশ্রয় বলে।
মধুর প্রেমত লভিবে ফলে॥
সেই প্রেম যবে হৃদয়ে বসে।
ভাসায় বিলাস কলার রসে॥
ব্রজে রাধা পদ আশ্রয় হয়।
যুগল সেবায় মানস রয়॥
সেবার সুখ অতুল জান।
অভেদ নির্ব্বাণে অপার্থ জ্ঞান॥

সুরভি বচন শুনিয়া মুনি ।
করযোড় করি বলে অমনি ॥
শ্রীগৌরচরণ ভজিব যবে ।
আমার অদৃষ্ট কোথায় রবে ॥
সুরভি কহিল সিদ্ধান্ত সার ।
শ্রীগৌর ভজনে নাহি বিচার ॥
শ্রীগৌর বলিয়া ডাকিবে যবে ।
সমস্ত করম বিনাশ হবে ॥
কিছু নাহি রবে বিপাক আর ।
ঘুচিবে তোমার ভব সংসার ॥
কর্ম্ম কেনে একা জ্ঞানের ফল ।
ঘুচিবে সমূলে হয়ে বিকল ॥
তুমিত মজিবে গৌরাঙ্গ রসে ।
ভজিবে তাঁহারে এদ্বীপে বসে ॥
মার্কণ্ডেয় শুনি আনন্দে ভাসে ।
গৌর বলি কাঁদে কখন হাঁসে ॥
এই দেখ জীব অপূর্ব্ব স্থান ।
মার্কণ্ডেয় যথা পাইল প্রাণ ॥
গৌরাঙ্গ মহিমা নিতাই মুখে ।
শুনি জীব ভাসে পরম সুখে ॥
সে স্থানে সে দিন যাপন করি ।
মধ্যদ্বীপে চলে বলিয়া হরি ॥
নিতাই জাহ্নবা চরণ সার ।
জানিয়া ভক্তিবিনোদ ছার ॥
নিতাই আদেশ মস্তকে ধরে ।
নদীয়া মহিমা বর্ণন করে ॥

নবম অধ্যায় : শ্রীমধ্যদ্বীপ ও নৈমিষ বর্ণন

জয় গৌরাচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ,
জয় জয় গদাধর ।
শ্রীবাসাদি জয়, জয় ভক্তালয়,
নবদ্বীপ ধামবর ॥
নিশি অবসানে, মত্ত গৌরগাণে,
চলিলেন নিত্যানন্দ ।
সঙ্গে ভক্তগণ, প্রেমেতে মগন,
বিস্তারিয়া পরানন্দ ॥
মধ্যদ্বীপে আসি, বলে হাঁসি হাঁসি,
এইত মাজিদা গ্রাম ।
হেথা সপ্তঋষি, ভজি গৌরশশী,
করিলেন সুবিশ্রাম ॥
পিতৃ সন্নিধানে, গৌর গুণ গানে,
সত্যযুগে ঋষিগণ ।
হইয়া মগন, যাচিল তখন,
গৌর প্রেম নিত্যধন ॥
ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, পেয়ে বড় সুখ,
সপ্তপুত্রে বলে তবে ।
নবদ্বীপে যাও, গৌরগুণ গাও,
অনায়াসে প্রেম হবে ॥
ধাম কৃপা সার, লাভ হয় যার,
তার হয় সাধুসঙ্গ ।
সাধু সঙ্গে ভজে, কৃষ্ণপ্রেমে মজে,
এইত পরম রঙ্গ ॥

নবদ্বীপে রতি, লভে যার মতি,
সেই পায় ব্রজ বাস।
অপ্রাকৃত ধাম, গৌরহরি নাম,
কেবল সাধুর আশ ॥
পিতৃ উপদেশ, বুঝিয়া বিশেষ,
সপ্তঋষি আসি তবে।
হরি বলি নাচে, গৌর প্রেমে যাচে,
গায় গুণ উচ্চরবে ॥
বলে গৌর হরি, অনুগ্রহ করি,
দেখা দাও একবার।
নানা ধর্ম্ম সাধি, হৈনু অপরাধী,
ভক্তি এবে কৈনু সার ॥
ভক্তি নিষ্ঠা করি, ভজি গৌরহরি,
ঋষিগণ করে তপ।
কিছু নাহি খায়, নিদ্রা নাহি যায়,
গৌরনাম করে জপ ॥
মধ্যাহ্ন সময়, গৌর দয়াময়,
দেখা দিল ঋষিগণে।
শতসূর্য্য প্রভা, যোগি মনোলোভা,
শুদ্ধ পঞ্চ তত্ত্ব সনে ॥
কিবা সেই রূপ, অতি অপরূপ,
সুবর্ণ সুন্দর মুর্ত্তি।
গলে বনমালা, দিক করে আলা,
তাহে আভরণ স্ফূর্ত্তি ॥
চাহনি সুন্দর, চিকুর চাঁচর,
চন্দনের বিন্দু ভালে।
ত্রিকচ্ছবসন, সূত্র সুশোভন,
শোভিত মল্লিকামালে ॥

সেরূপ দেখিয়া, মোহিত হইয়া,
সবে করে নিবেদন।
তোমার চরণ, লইনু শরণ,
দেহ পদে ভক্তি ধন ॥
শুনি গৌরহরি, বলে দয়া করি,
শুন ওহে ঋষিগণ।
ছাড়ি অভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্ম পাশ,
কর কৃষ্ণ আলোচন ॥
স্বল্প দিনান্তরে, নদীয়া নগরে,
হইবে প্রকট লীলা।
তুমি সবে তবে, দর্শন করিবে,
নাম সঙ্কীর্ত্তন খেলা ॥
একথা এখন, রাখহ গোপন,
আমার বচন ধর।
শ্রীকুমার হট্টে, নিজকৃত ঘট্টে,
কৃষ্ণের ভজন কর ॥
গৌর অদর্শনে, সপ্তর্ষি তখনে,
কুমার হট্টেতে যায়।
এস্থানে এখন, কর দরশন,
সপ্তটীলা শোভাপায় ॥
সপ্তর্ষি আকাশে, যেমত প্রকাশে,
সপ্তটীলা তার সম।
হেথাবাস করি, পায় গৌর হরি,
না সাধি নিয়ম যম ॥
ইহার দক্ষিণে, দেখহ নয়নে,
আছে এক জল ধার।
এইত গোমতী, সুপবিত্র অতি,
নৈমিষ কানন আর ॥

পুরা কল্পে কলি, হৈলে মহাবলী,
শৌনকাদি ঋষিগণ।
সুতের শ্রীমুখে, শুনে সবে সুখে,
গৌর ভাগবত ধন॥
হেথা যেইজন, পুরাণ পঠন,
করয় কার্ত্তিক মাসে।
সর্ব্বক্লেশ ত্যজে, গৌর রঙ্গে মজে,
ব্রজ লভে অনায়াসে॥
কভু পঞ্চানন, ছাড়ি বৃষাসন,
শ্রীহংস বাহন হয়ে।
শুনিল পুরাণ, গৌর গুণগান,
আপন ভকত লয়ে॥
গাইয়া গাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
শৈব যত কাশীবাসী।
পঞ্চাননে ঘেরি বলি গৌরহরি,
পুষ্প ফেলে রাশিরাশি॥
নিতাই বচন, শুনিয়া তখন,
জীবের উথলে ভাব।
গড়াগড়ি যায়, ধৈরয না পায়,
আস্বাদে ধাম প্রভাব॥
সেদিন যাপন, করে ভক্তগণ,
নিতাই চাঁদের সনে।
পরদিন সবে, চলিলেন তবে,
শ্রীপুষ্কর দরশনে॥
জাহ্নবা নিতাই, ভজন সদাই,
যাহার অন্তরে জাগে।
নদীয়া মহিমা, ভক্ত মধুরিমা,
গাইছে সেজন রাগে॥

দশম অধ্যায় : শ্রীব্রাহ্মণপুষ্কর, শ্রীউচ্চহট্টাদি দর্শন ও পরিক্রমা-ক্রম বর্ণন

জয় গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত সহিত।
জয় গদাধর জয় শ্রীবাসপণ্ডিত॥
জয় নবদ্বীপ শুদ্ধ প্রেম ভক্তি ধাম।
জয় জয় জয় গৌর নিত্যানন্দ নাম॥
শুনহে কলির জীব ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
নিতাই চৈতন্য ভজ ত্যজি ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
দয়ার সমুদ্র সেই গৌর নিত্যানন্দ।
অকাতরে দিবে ভাই সার ব্রজানন্দ॥
যামিনী প্রভাত হৈলে নিত্যানন্দ রায়।
জীবেরে লইয়া ধাম ভ্রমণেতে যায়॥
বলে দেখ জীব এই গ্রাম মনোহর।
এখন ব্রাহ্মণপুরা ডাকে সর্ব্বনর॥
ব্রাহ্মণপুষ্কর নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
হেথা যে রহস্য তাহা অতি গুহ্য হয়॥
সত্যযুগে দিবদাস নামেতে ব্রাহ্মণ।
গৃহ ত্যজি করে সর্ব্বতীর্থ দরশন॥
পুষ্করতীর্থেতে তার হৈল বড় প্রীত।
তথাপি ভ্রমিতে নবদ্বীপে উপস্থিত॥
এইস্থানে রাত্রযোগে দেখিল স্বপন।
হেথা বাস কর বিপ্র পাবে নিত্যধন॥

এই স্থানে কুটীর বাঁধিয়া দিবদাস ।
বৃদ্ধ কালাবধি তেঁহ করিলেন বাস ॥
বৃদ্ধকালে চলিতে অশক্ত দ্বিজবর ।
ইচ্ছা হৈল এবে আমি দেখিব পুষ্কর ॥
চলিতে না পারে দ্বিজ করয় ক্রন্দন ।
আর না পাইব আমি পুষ্কর দর্শন ॥
তখন পুষ্কররাজ সদয় হইল ।
দ্বিজরূপে দিবদাসে দরশন দিল ॥
দিবদাসে বলে বিপ্র না কর ক্রন্দন ।
তোমার সম্মুখে এই কুণ্ড সুশোভন ॥
এই কুণ্ডে স্নান তুমি কর একবার ।
প্রত্যক্ষ হইবে তীর্থ পুষ্কর তোমার ॥
তাহা শুনি কুণ্ডে স্নান করে দ্বিজবর ।
দিব্যচক্ষু লভি দেখে সম্মুখে পুষ্কর ॥
ক্রন্দন করিয়া দ্বিজ পুষ্করে বলিল ।
আমা লাগি বড় ক্লেশ তোমার হইল ॥
পুষ্কর বলেন শুন দ্বিজ ভাগ্যবান ।
দূর হৈতে না আসিনু হেথা বিদ্যমান ॥
এই নবদ্বীপধাম সর্ব্বতীর্থ ময় ।
নবদ্বীপে সেবি হেথা থাকে তীর্থ চয় ॥
আমার স্বরূপ এক পাশ্চাত্যে প্রকাশ ।
নিজে আমি এই স্থানে নিত্য করি বাস ॥
শতবার কেহ সেই তীর্থে করি স্নান ।
যেই ফল পায় হেথা সেফল বিধান ॥
অতএব নবদ্বীপ ছাড়ি যেই জন ।
অন্যতীর্থ আশা করে সে মূঢ় দুর্জ্জন ॥
সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি যদি হয় ফলোদয় ।
নবদ্বীপ তবে তার বাস স্থান হয় ॥
ঐ দেখ উচ্চ স্থান হট্টের সমান ।
কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত তথা বিদ্যমান ॥
সরস্বতী দৃষদ্বতী দুই পার্শ্বে তার ।
অতি শোভা পায় পুণ্য করয়ে বিস্তার ॥
ওহে বিপ্র গূঢ় কথা বলিব তোমায় ।
অতি অল্প কালে হবে আনন্দ হেথায় ॥
মায়াপুরে শচী গৃহে গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
প্রকট হইয়া প্রেম বিলাবে বিস্তর ॥
এইসব স্থানে প্রভু ভক্তবৃন্দ লয়ে ।
সঙ্কীর্ত্তন রসে নাচিবেন মত্ত হয়ে ॥
সর্ব্ব অবতারে ছিলা যে যে ভক্তগণ ।
সকলে লইয়া প্রভু করিবে কীর্ত্তন ॥
প্রেম-বন্যা জলে সর্ব্ব জগত ভাসাবে ।
কুতার্কিক বিনা সবে মহাপ্রেম পাবে ॥
এই ধামনিষ্ঠা করি যেবা করে বাস ।
তারে মিলে গৌরপদ ওহে দিবদাস ॥
কোটি কোটি বর্ষ করি শ্রীকৃষ্ণ ভজন ।
তথাপি নামেতে রতি না পায় দুর্জ্জন ॥
গৌরাঙ্গ ভজিলে দুষ্টভাব দূর যায় ।
অল্প দিনে ব্রজধামে রাধা-কৃষ্ণ পায় ॥
নিজ সিদ্ধদেহ পায় সখীর আশ্রয় ।
নিজকুঞ্জ শ্রীযুগলসেবা তার হয় ॥
ওহে বিপ্র হেথা থাকি করহ ভজন ।
সপার্ষদে শ্রীগৌরাঙ্গ পাবে দরশন ॥
এই কথা বলি তীর্থরাজ গেল চলি ।
শুনিল আকাশ বাণী আইসে ধন্য কলি ॥
তুমি বিপ্র সেই কালে জন্মিবে আবার ।
শ্রীগৌর কীর্ত্তন প্রেমে দিবেত সাঁতার ॥
এত শুনি দিবদাস নিশ্চিন্ত হইল ।
এই কুণ্ডতীরে বসি ভজন করিল ॥

এসব পুরাণ কথা শ্রীজীবে কহিয়া।
উচ্চহট্ট কুরুক্ষেত্রে প্রবেশিল গিয়া ॥
নিত্যানন্দ বলে হেথা সর্ব্বদেবগণ।
কুরুক্ষেত্রে তীর্থ সহ কৈল আগমন ॥
ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্রে যত তীর্থ ছিল।
সর্ব্বতীর্থ আসি হেথা বিরাজ করিল ॥
পৃথূদক আদি করি সব হেথা বৈসে।
সবে নবদ্বীপ সেবা করে অনায়াসে ॥
শতবর্ষ কুরুক্ষেত্রে বাসে যেই ফল।
হেথা এক রাত্র বাসে লভে সে সকল ॥
প্রভু বলে হেথা বাস করি দেবগণ।
হট্ট করি গৌর কথা করে আলোচন ॥
হট্টডাঙ্গা বলি নাম হইল ইহার।
ইহার দর্শনে পায় প্রেম পারাবার ॥
এই এক সীমা জীব দেখ নদীয়ার।
এবে চল যাই মোরা ভাগীরথী পার ॥
ভাগীরথী পার হয়ে মধ্যাহ্ন সময়।
কোলদ্বীপে নিত্যানন্দ হইল উদয় ॥
কুলিয়াপাহাড় পুরে যাইতে যাইতে।
শ্রীজীবে নিতাইচাঁদ লাগিল কহিতে ॥
যে ক্রমে আইনু মোরা হয়ে গঙ্গাপার।
সেই ক্রম সিদ্ধ ক্রম পরিক্রমা সার ॥
যবে প্রভু শ্রীচৈতন্য লয়ে নিজগণ।
করিলেন শ্রীচৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তন ॥
কাজিরে শোধিতে প্রভু সন্ধ্যা আগমনে।
মায়াপুর ছাড়ি চলে লয়ে ভক্তজনে ॥
সেইরাত্র ব্রহ্মরাত্র শীঘ্র নহে শেষ।
এই ক্রমে মহাপ্রভু ভ্রমে নিজদেশ ॥
তারপর প্রতি একাদশী তিথি ধরি।
ভ্রমিলা আমার প্রভু সঙ্কীর্ত্তন করি ॥
কভু পঞ্চক্রোশ ভ্রমে অন্তর্দ্বীপময়।
কভু অষ্টক্রোশ ভ্রমে যেন মনে লয় ॥
নিজ গৃহ হৈতে বারকোণা ঘাট ছাড়ি।
দীর্ঘিকা বেষ্টনে যায় শ্রীধরের বাড়ী ॥
তথাহৈতে অন্তর্দ্বীপ সীমা ভ্রমি আসে।
পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা হয় অনায়াসে ॥
সিমুলিয়া হয়ে কাজিগৃহে বেড়ি চলে।
শ্রীধরে সম্ভাসি আইসে গাদিগাছা স্থলে ॥
মাজিদা হইতে হয় ভাগীরথী পার।
পারডাঙ্গা ছিনাডাঙ্গা পুলিন বিস্তার ॥
ছাড়িয়া জাহ্নবী পার হইয়া তখন।
অষ্টক্রোশ ভ্রমি চলে আপন ভবন ॥
সিদ্ধ পরিক্রমা হয় পূর্ণ ষোলক্রোশ।
সেই পরিক্রমা কৈলে প্রভুর সন্তোষ ॥
সেই পরিক্রমা আমি তোমারে করাই।
ইহার সমান পরিক্রমা আর নাই ॥
বৃন্দাবন ষোলক্রোশ দ্বাদশ কানন।
এই পরিক্রমা মধ্যে পাবে দরশন ॥
নবরাত্রে এই পরিক্রমা শেষ হয়।
নবরাত্র বলি এর নাম শাস্ত্রে কয় ॥
পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা একদিনে করে।
রাত্রত্রয় অষ্ট ক্রোশ পরিক্রমা ধরে ॥
একরাত্র মায়াপুরে দ্বিতীয় গোদ্রুমে।
পুলিনে তৃতীয় রাত্র এই ক্রমে ভ্রমে ॥
শুনি পরিক্রমা তত্ত্ব জীবমহাশয়।
প্রেমেতে অধৈর্য্য হয়ে কতক্ষণ রয় ॥
নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া আশ যার।
নদীয়া মহিমা বর্ণে অকিঞ্চন ছার ॥

একাদশ অধ্যায় : শ্রীশ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীসমুদ্রগড়, শ্রীচম্পাহট্ট ও শ্রীজয়দেব-কথা বর্ণনা

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় গৌড় ভূমি সর্ব্বভূমি সার।
যথা নাম সহ শ্রীচৈতন্য অবতার ॥
নিত্যানন্দপ্রভু বলে শুন সর্ব্বজন।
পঞ্চবেণী রূপে গঙ্গা হেথায় মিলন ॥
মন্দাকিনী অলকা সহিত ভাগীরথী।
গুপ্তভাবে হেথায় আছেন সরস্বতী ॥
পশ্চিমে যমুনা সহ আইসে ভোগবতী।
তাহাতে মানস গঙ্গা মহা বেগবতী ॥
মহা মহা প্রয়াগ বলিয়া ঋষিগণে।
কোটী কোটী যজ্ঞ হেথা কৈল ব্রহ্মা সনে ॥
ব্রহ্মসত্র স্থান এই মহিমা অপার।
হেথা স্নান করিলে জনম নহে আর ॥
ইহার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে।
শুষ্কধারাসম কোন তীর্থ হইতে নারে ॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ত্যজিয়া জীবন।
সর্ব্বজীব পায় শ্রীগোলোক বৃন্দাবন ॥
কুলিয়াপাহাড় বলি খ্যাত এই স্থান।
গঙ্গাতীরে উচ্চভূমি পর্ব্বত সমান ॥
কোলদ্বীপ নাম শাস্ত্রে আছয় বর্ণন।
সত্যযুগ কথা এক শুন সর্ব্বজন ॥
বাসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
বরাহ দেবের সেবা করে বারবার ॥
শ্রীবরাহমূর্ত্তি পূজি করে উপাসনা।
সর্ব্বদা বরাহ দেবের করয় প্রার্থনা ॥
প্রভু মোরে কৃপা করি দেহ দরশন।
সফল হউক মোর নয়ন জীবন ॥
এই বলি কাঁদে বিপ্র গড়াগড়ি যায়।
প্রভু নাহি দেখা দিলে জীবন বৃথায় ॥
কতদিনে শ্রীবরাহ অনুকম্পা করি।
দেখা দিলা বাসুদেবে কোলরূপ ধরি ॥
নানারত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর।
পদ গ্রীবা নাসা মুখ চক্ষু মনোহর ॥
পর্ব্বত সমান উচ্চ শরীর তাঁহার।
দেখি বিপ্র নিজে ধন্য মানে বারবার ॥
ভূমে পড়ি বিপ্র প্রণমিয়া প্রভুপায়।
কাঁদিয়া আকুল হৈল গড়াগড়ি যায় ॥
বিপ্রের ভকতি দেখি বরাহ তখন।
কহিলেন বাসুদেবে মধুর বচন ॥
ওহে বাসুদেব তুমি ভকত আমার।
বড় তুষ্ট হৈনু পূজা পাইয়া তোমার ॥
এই নবদ্বীপে মোর প্রকট বিহার।
কলি আগমনে হবে শুন বাক্য সার ॥
নবদ্বীপ সম ধাম নাহি ত্রিভুবনে।
অতি প্রিয়ধাম মোর আছে সংগোপনে ॥
ব্রহ্মাবর্ত্ত সহ আছে পুণ্য তীর্থ যত।
সে সব আছয়ে হেথা শাস্ত্রের সম্মত ॥
যে স্থানে ব্রহ্মার যজ্ঞে প্রকাশ হইয়া।
নাশিলাম হিরণ্যাক্ষ দন্তে বিদারিয়া ॥

সেই স্থান পুণ্যভূমি এই স্থানে রয়।
যথায় আমার এবে হইল উদয় ॥
নবদ্বীপ সেবি সর্ব্ব তীর্থ বিরাজয়।
নবদ্বীপ বাসে সর্ব্ব তীর্থ বাস হয় ॥
ধন্য তুমি নবদ্বীপে সেবিলে আমায়।
শ্রীগৌর প্রকটকালে জন্মিবে হেথায় ॥
অনায়াসে দেখিবে সে মহাসঙ্কীর্ত্তন।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গরূপ পাবে দরশন ॥
এতবলি শ্রীবরাহ হৈল অন্তর্দ্ধান।
দৈববাণী হৈল বিপ্রে বুঝিতে সন্ধান ॥
পরম পণ্ডিত বাসুদেব মহাশয়।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিচারিয়া জানিল নিশ্চয় ॥
বৈবস্বত মন্বন্তরে কলির সন্ধ্যায়।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু লীলা হবে নদীয়ায় ॥
ঋষিগণ সেই তত্ত্ব রাখিল গোপনে।
ইঙ্গিতে কহিল সব বুঝে বিজ্ঞজনে ॥
প্রকট হইলে লীলা হইবে প্রকাশ।
এবে গোপ্য এই তত্ত্ব পাইল আভাস ॥
পরম আনন্দে বিপ্র করে সঙ্কীর্ত্তন।
গৌর নাম গায় মনে মনে সর্ব্বক্ষণ ॥
পর্ব্বত প্রমাণ কোলদেবের শরীর।
দেখি বাসুদেব মনে বিচারিল ধীর ॥
কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এই স্থান হয়।
সেই হইতে পর্ব্বতাখ্য হৈল পরিচয় ॥
ওহে জীব নিত্যলীলাময় বৃন্দাবনে।
গিরিগোবর্দ্ধন এই জানে ভক্তজনে ॥
শ্রীবহুলবান দেখ ইহার উত্তরে।
রূপের ছটায় সর্ব্বদিক্ শোভা করে ॥
বৃন্দাবনে যে যে ক্রমে দ্বাদশ কানন।
সে ক্রম নাহিক হেথা বল্লভ নন্দন ॥
প্রভু ইচ্ছামতে হেথা ক্রম বিপর্য্যয়।
ইহার তাৎপর্য্য জানে প্রভু ইচ্ছাময় ॥
যেইরূপ আছে হেথা দেখ সেইরূপ।
বিপর্য্যয়ে প্রেমবৃদ্ধি এই অপরূপ ॥
কিছু দূর গিয়া প্রভু বলেন বচন।
এই যে সমুদ্রগড়ি কর দরশন ॥
সাক্ষাৎ দ্বারকাপুরী শ্রীগঙ্গাসাগর।
দুই তীর্থ আছে হেথা দেখ বিজ্ঞবর ॥
শ্রীসমুদ্রসেন রাজা ছিল এই স্থানে।
বড় কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণবিনা নাহি জানে ॥
যবে ভীমসেন আইল নিজ সৈন্য লয়ে।
ঘেরিল সমুদ্রগড়ি বঙ্গদিগ্বিজয়ে ॥
রাজা জানে কৃষ্ণ এক পাণ্ডবের গতি।
পাণ্ডব বিপদে পৈলে আইসে যদুপতি ॥
যদি আমি পারি ভীমে দেখাইতে ভয়।
ভীম আর্ত্তনাদে হরি হবে দয়াময় ॥
দয়া করি আসিবেন এদাসের দেশে।
দেখিবে সে শ্যামমূর্ত্তি চক্ষে অনায়াসে ॥
এতভাবি নিজ সৈন্য সাজাইল রায়।
গজবাজি পদাতিক লয়ে যুদ্ধে যায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া রাজা বাণ নিক্ষেপয়।
বাণে জর জর ভীম পাইল বড় ভয় ॥
মনে মনে ডাকে কৃষ্ণ বিপদ দেখিয়া।
রক্ষা কর ভীমে নাথ শ্রীচরণ দিয়া ॥
সমুদ্রসেনের সহ যুঝিতে না পারি।
ভঙ্গ দিলে বড় লজ্জা তাহা সৈতে নারি ॥
পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ পাই পরাজয়।
বড়ই লজ্জার কথা ওহে দয়াময় ॥

ভীমের করুণানাদ শুনি দয়াময়।
সেই যুদ্ধস্থলে কৃষ্ণ হইল উদয় ॥
না দেখে সে রূপ কেহ অপূর্ব্ব ঘটনা।
শ্রীসমুদ্রসেন মাত্র দেখে একজনা ॥
নবজলধর রূপ কৈশোর মূরতি।
গলে দোলে বনমালা মুকুতার ভাতি ॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার অতি সুশোভন।
পীতবস্ত্র পরিধান অপূর্ব্ব গঠন ॥
সেরূপ দেখিয়া রাজা প্রেমে মূর্চ্ছা যায়।
মূর্চ্ছা সম্বরিয়া কৃষ্ণে প্রার্থনা জানায় ॥
তুমি কৃষ্ণ জগন্নাথ পতিতপাবন।
পতিত দেখিয়া মোরে তব আগমন ॥
তব লীলা জগজ্জন করয় কীর্ত্তন।
শুনি দেখিবার ইচ্ছা হইল কখন ॥
কিন্তু মোর ব্রত ছিল ওহে দয়াময়।
এই নবদ্বীপে তব হইবে উদয় ॥
হেথায় দেখিব তব রূপ মনোহর।
নবদ্বীপ ছাড়িবারে না হয় অন্তর ॥
সেই ব্রত রক্ষা মোর করি দয়াময়।
নবদ্বীপে কৃষ্ণরূপে হইলে উদয় ॥
তথাপি আমার ইচ্ছা অতি গূঢ়তর।
গৌরাঙ্গ হউন মোর অক্ষির গোচর ॥
দেখিতে দেখিতে রাজা সম্মুখে দেখিল।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারূপ মাধুর্য্য অতুল ॥
শ্রীকুমুদবনে কৃষ্ণ সখীগণ সনে।
অপরাহ্ণে করে লীলা গিয়া গোচারণে ॥
ক্ষণেকে হইল সেই লীলা অদর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ হেরে ভরিয়া নয়ন ॥
মহাসঙ্কীর্ত্তনবেশ সঙ্গে ভক্তগণ।
নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন কীর্ত্তন ॥
পুরট সুন্দর কান্তি অতি মনোহর।
নয়ন মাতায় অতি কাঁপায় অন্তর ॥
সেইরূপ হেরি রাজা নিজে ধন্য মানে।
বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গ চরণে ॥
কত ক্ষণে সে সকল হৈল অদর্শন।
কাঁদিতে লাগিল রাজা হয়ে অন্য মন ॥
ভীমসেন এই পর্ব্ব না দেখে নয়নে।
ভাবে রাজা যুদ্ধে ভীত হৈল এতক্ষণে ॥
অত্যন্ত বিক্রম করে পাণ্ডুর নন্দন।
রাজা তুষ্ট হয়ে কর যাচে ততক্ষণ ॥
কর পেয়ে ভীমসেন অন্য স্থানে যায়।
ভীম দিগ্বিজয় সর্ব্ব জগতেতে গায় ॥
এই সে সমুদ্রগড়ি নবদ্বীপ সীমা।
ব্রহ্মা নাহি জানে এই স্থানের মহিমা ॥
সমুদ্র আসিয়া হেথা জাহ্নবী আশ্রয়ে।
প্রভুপদ সেবা করে ভক্ত ভাব লয়ে ॥
জাহ্নবী বলেন সিন্ধু অতি অল্প দিনে।
তব তীরে প্রভু মোর রহিবে বিপিনে ॥
সিন্ধু বলে শুন দেবি আমার বচন।
নবদ্বীপ নাহি ছাড়ে শচীর নন্দন ॥
যদ্যপিও কিছুদিন রহে মম তীরে।
অপ্রতক্ষে রহে তবু নদীয়া ভিতরে ॥
নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রভুর হেথায়।
প্রকট ও অপ্রকট লীলা বেদে গায় ॥
হেথা তবাশ্রয়ে আমি রহিব সুন্দরী।
সেবিব শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥
এই বলি পয়োনিধি নবদ্বীপে রয়।
গৌরাঙ্গের নিত্যলীলা সতত চিন্তয় ॥

তবে নিত্যানন্দ আইলা চম্পাহট্ট গ্রাম।
বাণীনাথ গৃহে তথা করিল বিশ্রাম ॥
অপরাহ্নে চম্পাহট্ট করয় ভ্রমণ।
নিত্যানন্দ বলে শুন বল্লভনন্দন ॥
এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে চম্পক কানন।
খদির বনের অংশ সুন্দর দর্শন ॥
চম্পলতা সখী নিত্য চম্পক লইয়া।
মালা গাঁথি রাধাকৃষ্ণ সেবিতেন গিয়া ॥
কলি বৃদ্ধি হৈলে সেই চম্পক-কাননে।
মালীগণ ফুল লয় অতি হৃষ্টমনে ॥
হট্ট করি চম্পককুসুম লয়ে বসি।
বিক্রয় করয় লয় যত গ্রামবাসী ॥
সেই হৈতে শ্রীচম্পকহট্ট হৈল নাম।
চাঁপাহাটি সবে বলে মনোহর ধাম ॥
যেকাল লক্ষ্মণসেন নদীয়ার রাজা।
জয়দেব নবদ্বীপে হন তাঁর প্রজা ॥
বল্লালদীর্ঘিকাকূলে বাঁধিয়া কুটীর।
পদ্মাসহ বৈসে তথা জয়দেব ধীর ॥
দশ অবতার স্তব রচিল তথায়।
সেই স্তব লক্ষ্মণের হস্তে কভু যায় ॥
পরম আনন্দে স্তব করিল পঠন।
জিজ্ঞাসিল রাজা স্তব কৈল কোন জন ॥
গোবর্দ্ধন আচার্য্য রাজারে তবে কয়।
মহাকবি জয়দেব রচয়িতা হয় ॥
কোথা জয়দেব কবি জিজ্ঞাসে ভূপতি।
গোবর্দ্ধন বলে এই নবদ্বীপে স্থিতি ॥
শুনিয়া গোপনে রাজা করিয়া সন্ধান।
রাত্রযোগে আইল তবে জয়দেব স্থান ॥
বৈষ্ণব বেশেতে রাজা কুটীরে প্রবেশে।
জয়দেবে নতি করি বৈসে এক দেশে ॥
জয়দেব জানিলেন ভূপতি এজন।
বৈষ্ণব বেশেতে আইল হয়ে অকিঞ্চন ॥
অল্পক্ষণে রাজা তবে দেয় পরিচয়।
জয়দেবে যাচে যাইতে আপন আলয় ॥
অত্যন্ত বিরক্ত জয়দেব মহামতি।
বিষয়ি গৃহেতে যেতে না করে সম্মতি ॥
কৃষ্ণভক্ত জয়দেব বলিল তখন।
তব দেশ ছাড়ি আমি করিব গমন ॥
বিষয়ি সংসর্গ কভু না দেয় মঙ্গল।
গঙ্গা পার হয়ে যাব যথা নীলাচল ॥
রাজা বলে শুন প্রভু আমার বচন।
নবদ্বীপ ত্যাগ নাহি কর কদাচন ॥
তব বাক্য সত্য হবে মোর ইচ্ছা রবে।
হেন কার্য্য কর দেব মোরে কৃপা যবে ॥
গঙ্গা পারে চম্পহট্ট* স্থান মনোহর।
সেই স্থানে থাক তুমি দু এক বৎসর ॥
মম ইচ্ছামতে স্বামি তথা না যাইব।
তব ইচ্ছা হলে তব চরণ হেরিব ॥
রাজার বচন শুনি মহা কবিবর।
সম্মত হইয়া বলে বচন সত্বর ॥
যদ্যপি বিষয়ী তুমি এরাজ্য তোমার।
কৃষ্ণভক্ত তুমি তব নাহিক সংসার ॥
পরীক্ষা করিতে আমি বিষয়ী বলিয়া।
সম্ভাষিনু তবু তুমি সহিলে শুনিয়া ॥
অতএব জানিলাম তুমি কৃষ্ণভক্ত।
বিষয় লইয়া ফির হয়ে অনাসক্ত ॥

---

* “তথা চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ।” মহাভারত।

চম্পকহট্টেতে আমি কিছু দিন রব।
গোপনে আসিবে তুমি ছাড়িয়া বৈভব ॥
হৃষ্টচিত্ত হয়ে রাজা অমাত্য দ্বারায়।
চম্পকহট্টেতে গৃহ নির্ম্মাণ করায় ॥
তথা জয়দেব কবি রহে দিন কত।
শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে রাগমার্গ মত ॥
পদ্মাবতী দেবী আনে চম্পকের ভার।
জয়দেব পূজে কৃষ্ণ নন্দেরকুমার ॥
মহাপ্রেমে জয়দেব করয় পূজন।
দেখিল শ্রীকৃষ্ণ হৈল চম্পক বরণ ॥
পুরট স্থন্দর কান্তি অতি মনোহর।
কোটি চন্দ্র নিন্দি মুখ পরম স্থন্দর ॥
চাঁচর চিকুর শোভা গলে ফুলমালা।
দীর্ঘবাহু রূপে আল করে পর্ণশালা ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ মহাকবিবর।
প্রেমে মুর্চ্ছা যায় চক্ষে অশ্রু ঝর ঝর ॥
পদ্মাবতী দেবী সেই রূপ নিরখিয়া।
হইল চৈতন্যহীন ভূমেতে পড়িয়া ॥
পদ্মহস্ত দিয়া প্রভু তোলে দুই জনে।
কৃপাকরি বলে তবে অমিয়-বচনে ॥
তুমি দোঁহে মম ভক্ত পরম উদার।
দরশন দিতে ইচ্ছা হইল আমার ॥
অতি অল্পদিনে এই নদীয়ানগরে।
জনম লইব আমি শচীর উদরে ॥
সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত সনে।
শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে বিতরিব প্রেম ধনে ॥
চব্বিশ বৎসরে আমি করিয়া সন্ন্যাস।
করিব অবশ্য নীলাচলেতে নিবাস ॥
তথা ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রেমাবেশে।
শ্রীগীতগোবিন্দ আস্বাদিব অবশেষে ॥
তব বিরচিত গীতগোবিন্দ আমার।
অতিশয় প্রিয়বস্তু কহিলাম সার ॥
এই নবদ্বীপধাম পরম চিন্ময়।
দেহান্তে আসিবে হেথা কহিনু নিশ্চয় ॥
এবে তুমি দোঁহে যাও যথা নীলাচল।
জগন্নাথে সেব গিয়া পাবে প্রেমবল ॥
এতবলি গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন।
প্রভুর বিচ্ছেদে মুর্চ্ছা হয় দুই জন ॥
মূর্চ্ছাশেষে অনর্গল কাঁদিতে লাগিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে সব নিবেদন কৈল ॥
হায় কিবা রূপ মোরা দেখিনু নয়নে।
কেমনে বাঁচিবে এবে তার অদর্শনে ॥
নদীয়া ছাড়িতে প্রভু কেন আজ্ঞা কৈল।
বুঝি এই ধামে কিছু অপরাধ হৈল ॥
এই নবদ্বীপধাম পরম চিন্ময়।
ছাড়িতে মানস এবে বিকলিত হয় ॥
ভাল হৈত নবদ্বীপে পশু পক্ষী হয়ে।
থাকিতাম চিরদিন ধাম চিন্তালয়ে ॥
পরাণ ছাড়িতে পারি তবু এই ধাম।
ছাড়িতে না পারি এই গূঢ় মনস্কাম ॥
ওহে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা বিতরিয়া।
রাখ আমা দোঁহে হেথা শ্রীচরণ দিয়া ॥
বলিতে বলিতে দোঁহে কাঁদে উচ্চরায়।
দৈববাণী সেইক্ষণে শুনিবারে পায় ॥
দুঃখ নাহি কর দোঁহে যাও নীলাচল।
দুই কথা হবে চিত্ত না কর চঞ্চল ॥
কিছুদিন পূর্ব্বে দোঁহে করিলে মানস।
নীলাচলে বাস করি কতকদিবস ॥

সেই বাঞ্ছা জগবন্ধু পূরাইল তব ।
জগন্নাথ চাহে তব দর্শন সম্ভব ॥
জগন্নাথে তুষি পুন ছাড়িয়া শরীর ।
নবদ্বীপে দুইজনে নিত্য হবে স্থির ॥
দৈববাণী শুনি দোঁহে চলে ততক্ষণ ।
পাছে ফিরি নবদ্বীপ করেন দর্শন ॥
ছল ছল করে নেত্র জলধারা বহে ।
নবদ্বীপবাসিগণে দৈন্যবাক্য কহে ॥
তোমরা করিয়া কৃপা এই দুই জনে ।
অপরাধ করিয়াছি করহ মার্জ্জনে ॥
অষ্টদল পদ্ম সম নবদ্বীপ ভায় ।
দেখিতে দেখিতে দোঁহে কতদূরে যায় ॥
দূরে গিয়া নবদ্বীপ নাহি দেখে আর ।
কাঁদিতে কাঁদিতে গৌড়ভূমি হয় পার ॥
কতদিনে নীলাচলে পৌঁছিয়া দুজনে ।
জগন্নাথ দরশন কৈল হৃষ্ট মনে ॥
ওহে জীব এই জয়দেব স্থান হয় ।
উচ্চভূমি মাত্র আছে বৃদ্ধলোকে কয় ॥
জয়দেব স্থান দেখি শ্রীজীব তখন ।
প্রেমে গড়াগড়ি যায় করয় রোদন ॥
ধন্য জয়দেব কবি ধন্য পদ্মাবতী ।
শ্রীগীতগোবিন্দ ধন্য ধন্য কৃষ্ণরতি ॥
জয়দেব ভোগ কৈল যেই প্রেমসিন্ধু ।
কৃপাকরি দেহ মোরে তার একবিন্দু ॥
এই কথা বলি জীব ধরণী লোটায় ।
নিত্যানন্দ শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায় ॥
সেই রাত্র সবে রয় বাণীনাথ ঘরে ।
বংশ সহ বাণী নিত্যানন্দ সেবা করে ॥
নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া আশ যার ।
নদীয়া মাহাত্ম্য গায় অকিঞ্চন ছার ॥

দ্বাদশ অধ্যায় : শ্রীশ্রীঋতুদ্বীপ ও শ্রীরাধাকুণ্ড বর্ণন

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ,
জয়াদ্বৈত জয় গদাধর ।
শ্রীবাসাদি ভক্ত জয়, জয় জগন্নাথালয়,
জয় নবদ্বীপ ধামবর ॥
প্রভাত হইল রাত্র, ভক্তগণ তুলে গাত্র,
শ্রীগৌর নিতাই চাঁদে ডাকে ।
ভক্তসহ নিত্যানন্দ, চলে ভজি পরানন্দ,
চম্পাহট্ট পশ্চাতেতে রাখে ॥
তথা হৈতে বাণীনাথ, চলে নিত্যানন্দ সাথ,
বলে হেন দিন কবে পাব ।
নিতাই চাঁদের সঙ্গে, পরিক্রমা করি রঙ্গে,
মায়াপুর প্রভু গৃহে যাব ॥
দেখিতে দেখিতে তবে, রাতুঃপুর চলে সবে,
দেখি সেই নগরের শোভা ।
প্রভু নিত্যানন্দ বলে, ঋতুদ্বীপে আইল চলে,
এই স্থানে অতি মনোলোভা ॥
বৃক্ষ সব নতশির, পবন বহয়ে ধীর,
কুসুম ফুটেছে চারিভিত ।
ভৃঙ্গের ঝঙ্কার রব, কুসুমের গন্ধাসব,
মাতায় পথিকগণ চিত ॥

বলিতে বলিতে রায়, হৈল পাগলের প্রায়,
বলে শিঙ্গা আন শীঘ্রগতি।
বৎসগণ যায় দূরে, কানাই নিদ্রিতপুরে,
এখন না আইসে শিশুমতি ॥
কোথায় সুবল দাম, আমি একা বলরাম,
গোচারণে যাইতে না পারি।
কানাই কানাই বলি, ডাক ছাড়ে মহাবলী,
লাফ মারে হাত দুই চারি ॥
সে ভাব দর্শন করি, ভক্তগণ ত্বরা করি,
নিবেদয় নিতাইয়ের পায়।
ওহে প্রভু নিত্যানন্দ, ভাই তব গৌরচন্দ্র,
নাহি এবে আছেন হেথায় ॥
সন্ন্যাস করিয়া হরি, গেল নীলাচলোপরি,
আমাদের কাঙ্গাল করিয়া।
তাহা শুনি নিত্যানন্দ, হইলেন নিরানন্দ,
কাঁদি লোটে ভূমেতে পড়িয়া ॥
কি দুঃখে কানাই ভাই, আমা সবে ছাড়ি যাই,
সন্ন্যাসী হইল নীলাচলে।
এজীবন না রাখিব, যমুনায় ঝাঁপ দিব,
বলি অচেতন সেই স্থলে ॥
নিত্যানন্দে মহাভাব, করি সবে অনুভাব,
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে।
চারিদণ্ড দিন হৈল, নিত্যানন্দ না উঠিল,
ভক্ত সব গৌর গীত ধরে ॥
গৌরাঙ্গের নাম শুনি, নিতাই উঠে অমনি,
বলে এই রাধাকুণ্ড স্থান।
হেথা ভক্ত সঙ্গে করি, অপরাহ্নে গৌরহরি,
করিতেন কীর্ত্তন বিধান ॥
হেথা ছয় ঋতু মেলি, গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনকেলি,
পুষ্টকৈল শোভা বিস্তারিয়া।
রাধাকুণ্ড ব্রজে যেই, ঋতুদ্বীপ হেথা সেই,
ভক্ত হেথা মজে প্রেম পিয়া ॥
দেখ শ্যামকুণ্ড শোভা, জগজ্জন-মনোলোভা,
সখীগণ কুঞ্জ নানাস্থানে।
হেথা অপরাহ্নে গোরা, সঙ্কীর্ত্তনে হয়ে ভোরা,
তুষিলেন সবে প্রেমদানে ॥
এস্থান সমান ভাই, ত্রিজগতে নাহি পাই,
ভক্তের ভজন স্থান জান।
হেথায় বসতি যার, প্রেমধন লাভ তার,
সুশীতল হয় তার প্রাণ ॥
সে দিন সে স্থানে থাকি, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ডাকি,
প্রেমে মগ্ন সর্ব্ব ভক্তগণ।
ঋতুদ্বীপে সবে বসি, ভজে শ্রীচৈতন্য শশী,
রাত্রদিন করিল যাপন ॥
নাচিতে নাচিতে তবে, নিত্যানন্দ চলে যবে,
শ্রীবিদ্যানগরে উপনীত।
বিদ্যানগরের শোভা, মুনিজন মনলোভা,
ভক্তগণ দেখি প্রফুল্লিত ॥
নিতাই জাহ্নবা পদ যে জনার সুসম্পদ,
সে ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন।
নদীয়া মাহাত্ম্য গায়, ধরি ভক্তজন পায়,
যাচে মাত্র কৃষ্ণভক্তি ধন ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় : শ্রীবিদ্যানগর ও শ্রীজহ্নুদ্বীপ বর্ণন

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর।
শ্রীবাস শ্রীনবদ্বীপ কীর্ত্তন সাগর ॥
শ্রীবিদ্যানগরে আসি নিত্যানন্দরায়।
বিদ্যানগরের তত্ত্ব শ্রীজীবে শিখায় ॥
নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রলয় সময়ে।
অষ্টদল পদ্মরূপে থাকে শুদ্ধ হয়ে ॥
সর্ব্ব অবতার আর ধন্যজীব যত।
কমলের একদেশে থাকে কত শত ॥
ঋতুদ্বীপ অন্তর্গত এ বিদ্যানগরে।
মৎস্যরূপী ভগবান সর্ব্ববেদ ধরে ॥
সর্ব্ব বিদ্যা থাকে বেদ আশ্রয় করিয়া।
শ্রীবিদ্যানগর নাম এই স্থানে দিয়া ॥
পুন যবে সৃষ্টি মুখে ব্রহ্মা মহাশয়।
অতি ভীত হন দেখি সকল প্রলয় ॥
সেই কালে প্রভু কৃপা হয় তাঁর প্রতি।
এই স্থানে পেয়ে ভগবানে করে স্তুতি ॥
মুখ খুলিবার কালে দেবী সরস্বতী।
ব্রহ্ম জিহ্বা হৈতে জন্মে অতি রূপবতী ॥
সরস্বতী শক্তি পেয়ে দেব চতুর্ম্মুখ।
শ্রীকৃষ্ণে করেন স্তব পেয়ে বড় সুখ ॥
সৃষ্টি যবে হয় মায়া সর্ব্বদিক ঘেরি।
বিরজার পারে থাকে গুণত্রয় ধরি ॥
মায়া প্রকাশিত বিশ্বে বিদ্যার প্রকাশ।
করে ঋষিগণ তবে করিয়া প্রয়াস ॥
এইত সারদা পীঠ করিয়া আশ্রয়।
ঋষিগণ করে অবিদ্যার পরাজয় ॥
চৌষট্টী বিদ্যার পাঠ লয়ে ঋষিগণ।
ধরাতলে স্থানে স্থানে করে বিজ্ঞাপন ॥
যে যে ঋষি যে যে বিদ্যা করে অধ্যয়ন।
এই পীঠে সে সবার স্থান অনুক্ষণ ॥
শ্রীবাল্মিকী কাব্যরস এই স্থানে পায়।
নারদ কৃপায় তেঁহ আইল হেথায় ॥
ধন্বন্তরী আসি হেথা আয়ুর্ব্বেদ পায়।
বিশ্বামিত্র আদি ধনুর্ব্বিদ্যা শিখি যায় ॥
শৌনকাদি ঋষিগণ পড়ে বেদ মন্ত্র।
দেবদেব মহাদেব আলোচয় তন্ত্র ॥
ব্রহ্মা চারিমুখ হৈতেবেদ চতুষ্টয়।
ঋষিগণ প্রার্থনায় করিল উদয় ॥
কপিল রচিল সাঙ্খ্য এই স্থানে বসি।
ন্যায় তর্ক প্রকাশিল শ্রীগৌতম ঋষি ॥
বৈশেষিক প্রকাশিল কণভুক্ মুনি।
পাতঞ্জলি যোগশাস্ত্র প্রকাশে আপনি ॥
জৈমিনি মীমাংসা শাস্ত্র করিল প্রকাশ।
পুরাণাদি প্রকাশিল ঋষি বেদব্যাস ॥
পঞ্চরাত্র নারদাদি ঋষি পঞ্চজন।
প্রকাশিয়া জীবগণে শিখায় সাধন ॥
এই উপবনে সর্ব্ব উপনিষদগণ।
বহুকাল শ্রীগৌরাঙ্গ করে আরাধন ॥
অলক্ষ্যে শ্রীগৌরহরি সে সবে কহিল।
নিরাকার বুদ্ধিতব হৃদয় দূষিল ॥
তুমি সবে শ্রুতিরূপে মোরে না পাইবে।
আমার পার্ষদ রূপে যবে জন্ম লবে ॥

প্রকট লীলায় তবে দেখিবে আমায় ।
মমগুণ কীর্ত্তন করিবে উভরায় ॥
তাহা শুনি শ্রুতিগণ নিস্তব্ধ হইয়া ।
গোপনে আছিল হেথা কাল অপেক্ষিয়া ॥
এই ধন্য কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার ।
যাহাতে হইল শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার ॥
বিদ্যালীলা করিবেন গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
গণ সহ বৃহস্পতি জন্মে অতঃপর ॥
বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেই বৃহস্পতি ।
গৌরাঙ্গে তুষিতে যত্ন করিলেন অতি ॥
প্রভু মোর নবদ্বীপে শ্রীবিদ্যাবিলাস ।
করিবেন জানি মনে হইয়া উদাস ॥
ইন্দ্রসভা পরিহরি নিজগণ লয়ে ।
জন্মিলেন স্থানে স্থানে আনন্দিত হয়ে ॥
এই বিদ্যানগরেতে করি বিদ্যালয় ।
বিদ্যা প্রচারিল সার্ব্বভৌম মহাশয় ॥
পাছে বিদ্যাজালে ডুবে হারাই গৌরাঙ্গ ।
এই মনে করি এক করিলেন রঙ্গ ॥
নিজ শিষ্যগণে রাখি নদীয়া নগরে ।
গৌর জন্ম পূর্ব্বে তেঁহ গেলা দেশান্তরে ॥
মনে ভাবে যদি আমি হই গৌর দাস ।
কৃপা করি মোরে প্রভু লইবেন পাশ ॥
এই বলি সার্ব্বভৌম যায় নীলাচল ।
মায়াবাদ শাস্ত্র তথা করিল প্রবল ॥
হেথা প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীবিদ্যাবিলাসে ।
সার্ব্বভৌম শিষ্যগণে জিনে পরিহাসে ॥
ন্যায় ফাঁকি করি প্রভু সকলে হারায় ।
কভু বিদ্যানগরেতে আইসে গৌররায় ॥
অধ্যাপকগণ আর পড়ুয়ারগণ ।
পরাজিত হয়ে সবে করে পলায়ন ॥
গৌরাঙ্গের বিদ্যালীলা অপূর্ব্ব কথন ।
অবিদ্যা ছাড়ায়ে তার যে করে শ্রবণ ॥
শুনি জীব প্রেমানন্দে সে বেদ নগরে ।
ব্যাসপীঠে গড়াগড়ি যায় প্রেমভরে ॥
নিত্যানন্দ শ্রীচরণে করে নিবেদন ।
আমার সংশয় ছেদ করহ এখন ॥
সাঙ্খ্য বিদ্যা তর্ক বিদ্যা অমঙ্গলময় ।
কেমনে এ নিত্যধামে সে সকল রয় ॥
শুনি প্রভু নিত্যানন্দ জীবে দেয় কোল ।
আদর করিয়া বলে হরি হরি বোল ॥
প্রভুর পবিত্র ধামে নাহি অমঙ্গল ।
তর্ক সাঙ্খ্য স্বতঃ নহে হেথায় প্রবল ॥
ভক্তির অধীন সব ভক্তি দাস্য করে ।
কর্ম্মদোষে দুষ্ট জনে বিপর্য্যয় ধরে ॥
ভক্তি মহাদেবী হেথা আর সব দাস ।
সকলে করয় ভক্তিদেবীর প্রকাশ ॥
নবদ্বীপে নববিধ ভক্তি অধিষ্ঠান ।
ভক্তিরে সেবয় সদা কর্ম্ম আর জ্ঞান ॥
বহির্ম্মুখ জনে শাস্ত্র দেয় দুষ্টমতি ।
শিষ্টজনে সেই শাস্ত্র দেয় কৃষ্ণরতি ॥
প্রৌঢ়ামায়া গৌরদাসী অধিষ্ঠাত্রী দেবী ।
সর্ব্বযুগে এই স্থানে থাকে গৌরসেবী ॥
অতি কর্ম্মদোষ যার বৈষ্ণবেতে দ্বেষ ।
তারে মায়া অন্ধ করি দেয় নানা ক্লেশ ॥
সর্ব্বপাপ সর্ব্বকর্ম্ম হেথা হয় ক্ষয় ।
প্রৌঢ়ামায়া বিদ্যারূপে করে কর্ম্ম লয় ॥
কিন্তু যদি শ্রীবৈষ্ণবে অপরাধ থাকে ।
তবে দূর করে তারে কর্ম্মের বিপাকে ॥

বিদ্যাপড়ি নদীয়ায় সে সব দুর্জ্জন।
কভু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেম ধন॥
বিদ্যার অবিদ্যা লাভ করে সেই সব।
নাহি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়া বৈভব॥
অতএব বিদ্যা নহে অমঙ্গলময়।
বিদ্যার অবিদ্যা ছায়া অমঙ্গল হয়॥
এ সব স্ফুরিবে জীব গৌরাঙ্গ কৃপায়।
লিখিবে আপন শাস্ত্রে প্রভুর ইচ্ছায়॥
তোমা দ্বারা করিবেন শাস্ত্র পরকাশ।
এবে চল যাই মোরা জহ্নুর আবাস॥
বলিতে বলিতে সবে জান্নগর যায়।
জহ্নু তপোবন শোভা দেখিবারে পায়॥
নিত্যানন্দ বলে এই জহ্নুদ্বীপ নাম।
ভদ্রবন নামে খ্যাত মনোহর ধাম॥
এই স্থানে জহ্নুমুনি তপ আচরিল।
সুবর্ণ প্রতিমা গৌর দর্শন করিল॥
হেথা জহ্নুমুনি বৈসে সন্ধ্যা করিবারে।
ভাগীরথী বেগে কোশাকোশী পড়ে ধারে॥
ধারে পড়ি কোশাকোশী ভাসিয়া চলিল।
গণ্ডুষে গঙ্গার জল সব পান কৈল॥
ভগীরথ মনে ভাবে কোথা গঙ্গা গেল।
বিহ্বল হইয়া তবে ভাবিতে লাগিল॥
জহ্নুমুনি পান কৈল সব গঙ্গাজল।
জানি ভগীরথ মনে হইল বিকল॥
কতদিনে মুনিরে পূজিল মহাধীর।
অঙ্গ বিদারিয়া গঙ্গা করিল বাহির॥
সেই হৈতে জাহ্নবী হইল নাম তাঁর।
জাহ্নবী বলিয়া ডাকে সকল সংসার॥
কতদিন পরে হেথা গঙ্গারনন্দন।
ভীষ্মদেব কৈল মাতামহ দরশন॥
ভীষ্মরে আদর করে জহ্নু মহাশয়।
বহুদিন রাখে তারে আপন আলয়॥
জহ্নু স্থানে ভীষ্ম ধর্ম্ম শিখিল অপার।
যুধিষ্ঠিরে শিক্ষা দিল সেই ধর্ম্ম সার॥
নবদ্বীপে থাকি ভীষ্ম পাইল ভক্তিধন।
বৈষ্ণব মধ্যেতে ভীষ্ম হইল গণন॥
অতএব জহ্নুদ্বীপ পরম পাবন।
হেথা বাস করে সদা ভাগ্যবান জন॥
সেইদিন জহ্নুদ্বীপে নিত্যানন্দরায়।
ভক্তগণ সহ রহে ভক্তের আলয়॥
পরদিন প্রাতে প্রভু লয়ে ভক্তগণ।
মোদদ্রুমদ্বীপে তবে করিল গমন॥
জাহ্নবা নিতাই পদ যাহার গরিমা।
এ ভক্তিবিনোদ গায় নদীয়া মহিমা॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় : শ্রীশ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীরামলীলা বর্ণন

জয় জয় পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরহরি।
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বোপরি॥
মামগাছিগ্রামে গিয়া নিত্যানন্দরায়।
বলে এই মোদদ্রুম অযোধ্যা হেথায়॥
পূর্ব্বকল্পে যবে রাম হৈল বনবাসী।
লক্ষ্মণ জানকী লয়ে এই স্থানে আসি॥

মহাবট বৃক্ষতলে কুটীর বান্ধিয়া ।
কত দিন বাস কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥
নবদ্বীপ প্রভা রাম করি দরশন ।
অল্প অল্প হাস্য করে শ্রীরঘুনন্দন ॥
কিবা দুর্ব্বাদল শ্যামরূপ মনোহর ।
রাজীবলোচন হস্তে ধনুক সুন্দর ॥
ব্রহ্মচারী বেশ শিরে জটা শোভা করে ।
দর্শনে সকল প্রাণীগণ মনোহরে ॥
হাসি হাসি মুখ দেখি জানকী তখন ।
জিজ্ঞাসে শ্রীরামে দেবী হাস্যের কারণ ॥
রাম বলে শুন সীতা জনকনন্দিনি ।
অতি গোপনীয় এক আছেত কাহিনী ॥
ধন্যকলি যবে হয় এই নদীয়ায় ।
পীত বর্ণ রূপ মোর দেখিবারে পায় ॥
জগন্নাথমিশ্র গৃহে শ্রীশচী উদরে ।
গৌরাঙ্গ রূপেতে জন্ম লভির সত্বরে ॥
বাল্যলীলা দেখিবে যে সব ভাগ্যবান ।
করিব সে সবে আমি পরা প্রেম দান ॥
করিব সে কালে প্রিয়ে বিদ্যার বিলাস ।
শ্রীনাম মাহাত্ম্য আমি করিব প্রকাশ ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি যাব নীলাচলে ।
কাঁদিবে জননী স্বীয় বধু লয়ে কোলে ॥
এই কথা শুনি সীতা বলেন বচন ।
জননী কাঁদাবে কেন রাজীবলোচন ॥
সন্ন্যাস করিবে কেন ছাড়িয়া গৃহিণী ।
পত্নী দুঃখ দিয়া সুখ কিবা নাহি জানি ॥
শ্রীরাম বলেন প্রিয়ে তুমি সব জান ।
জীবেরে শিখাতে এবে হইল অজ্ঞান ॥
আমাতে যে প্রেম ভক্তি তার আস্বাদন ।
দুই মতে হয় সীতা শুনহ বচন ॥
আমার সংযোগে সুখ সম্ভোগ বলয় ।
আমার বিয়োগে সুখ বিপ্রলম্ভ হয় ॥
ভক্ত মোর নিত্য সঙ্গী সম্ভোগ বাঞ্ছয় ।
মম কৃপা বশে তার বিপ্রলম্ভ হয় ॥
বিপ্রলম্ভে দুঃখ যেই আমার কারণ ।
পরম আনন্দে তাহা জানে ভক্তজন ॥
বিপ্রলম্ভ শেষে যবে সম্ভোগ উদয় ।
পূর্ব্বাপেক্ষা কোটিগুণ সুখ তাহে হয় ॥
সেই ত সুখের হেতু আমার বিচ্ছেদ ।
স্বীকার করহ তুমি বলে চারি বেদ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে কৌশল্যা জননী ।
শচীদেবী অদিতি বেদেতে যার ধ্বনি ॥
তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সেবিবে আমারে ।
বিচ্ছেদে শ্রীগৌরমূর্ত্তি করিবে প্রচার ॥
তোমার বিচ্ছেদে কভু স্বর্ণসীতা করি ।
ভজিব তোমারে আমি অযোধ্যানগরী ॥
তার বিনিময়ে তুমি নদীয়ানগরে ।
গৌরাঙ্গ প্রতিমা করি পূজিবে আমারে ॥
এই গূঢ় কথা সীতা গোপনীয় অতি ।
লোকেতে প্রকাশ নাহি হইবে সম্প্রতি ॥
এই নবদ্বীপ মোর বড় প্রিয়স্থান ।
অযোধ্যাদি নাহি হয় ইহার সমান ॥
এই রামবট বৃক্ষ কলি আগমনে ।
অদর্শন হয়ে সীতা রবে সঙ্গোপনে ॥
এই রূপে রাম সীতা লক্ষ্মণ সহিত ।
এই স্থানে কত দিন হয়ে অবস্থিত ॥ ॥
দণ্ডক অরণ্যে গেলা কার্য্য সাধিবারে ।
রামের কুটীর স্থান পাও দেখিবারে ॥

রামমিত্র গুহক প্রভুর ইচ্ছা বশে ।
এই স্থানে জন্মিলেন বিপ্রের ঔরসে ॥
সদানন্দ বিপ্র ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ।
রাম বিনা ত্রিজগতে নাহি জানে আর ॥
যেই দিন প্রভু মোর জন্মে মায়াপুরে ।
সেই দিন সদানন্দ ছিল মিশ্র ঘরে ॥
প্রভুর জনম কালে যত দেবগণ ।
মিশ্রের ভবনে শিশু করে দরশন ॥
পরম সাধক বিপ্র চিনে দেবগণে ।
জানিল আমার প্রভু জন্মিল এখানে ॥
পরম কৌতুকে বিপ্র আইল নিজ ঘরে ।
ইষ্ট ধ্যানে দেখে বিপ্র গৌরাঙ্গ সুন্দরে ॥
সিংহাসনে বসিয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গরায় ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ চামর ঢুলায় ॥
পুন দেখে রামচন্দ্র দুর্ব্বাদল শ্যাম ।
নিকটে লক্ষ্মণবীর শ্রীঅনন্তধাম ॥
বামে সীতা সম্মুখে ভকত হনুমান ।
দেখিয়া বিপ্রের হৈল প্রভুতত্ত্ব জ্ঞান ॥
পরম আনন্দে বিপ্র মায়াপুরে গিয়া ।
অলক্ষ্যে গৌরাঙ্গ দেখে নয়ন ভরিয়া ॥
ধন্য আমি ধন্য আমি বলে বারবার ।
গৌররূপে রামচন্দ্র সম্মুখে আমার ॥
কত দিনে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল ।
সদানন্দ গৌর বলি তাহাতে নাচিল ॥
ওহে জীব এই স্থানে শ্রীভাণ্ডীর বন ।
নির্ম্মল ভকতগণ করে দরশন ॥
সেই সব কথা শুনি নিত্যধামে হেরি ।
নাচেন ভকতগণ নিত্যানন্দে ঘেরি ॥
শ্রীজীবের অঙ্গে হয় সাত্ত্বিক বিকার ।
হা গৌরাঙ্গ বলি জীব করেন চীৎকার ॥
সেই গ্রামে সেই দিন নারায়ণী ঘরে ।
রহিলেন নিত্যানন্দ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
পরম পবিত্র সতী ব্যাসের জননী ।
শ্রীবৈষ্ণবগণে সেবা করিল আপনি ॥
পর দিন প্রাতে সবে চলি কত দূর ।
প্রবেশিল অনায়াসে শ্রীবৈকুণ্ঠপুর ॥
নিতাই জাহ্নবা আজ্ঞা করিতে পালন ।
নদীয়া মাহাত্ম্য গায় দীন অকিঞ্চন ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় : শ্রীবৈকুণ্ঠপুর, শ্রীরুদ্রপুর ও পুলিন বর্ণন

পঞ্চতত্ত্ব সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ।
জয় জয় নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ আলয় ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে আসি প্রভুনিত্যানন্দ ।
শ্রীজীবে কহেন তবে হাসি মন্দ মন্দ ॥
নবদ্বীপ অষ্টদল এক পার্শ্বে হয় ।
এইত বৈকুণ্ঠপুরি শুনহ নিশ্চয় ॥
পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠ নারায়ণ স্থান ।
বিরজার পারে স্থিতি এইত সন্ধান ॥
মায়ার নাহিক তথা গতি কদাচন ।
শ্রীভূলীলা শক্তি সেব্য তথা নারায়ণ ॥
চিন্ময় ভূমির ব্রহ্ম হয় ত কিরণ ।
চর্ম্মচক্ষে জড়দৃষ্টি করে সর্ব্বজন ॥
এই নারায়ণধামে নিত্য নিরঞ্জনে ।
নারদ দেখিল কভু চিন্ময় লোচনে ॥

নারায়ণে দেখে পুন গৌরাঙ্গসুন্দর।
দেখি হেথা কতদিনে রহে মুনিবর ॥
আর এক কথা গূঢ় আছে পুরাতন।
জগন্নাথ ক্ষেত্রে আইল আচার্য্য লক্ষ্মণ ॥
বহু স্তবে তুষ্ট কৈল দেব জগন্নাথে।
কৃপা করি জগন্নাথ আইল সাক্ষাতে ॥
সাক্ষাতে আসিয়া প্রভু বলিল বচন।
নবদ্বীপধাম তুমি করহ দর্শন ॥
অতি অল্প দিনে আমি নদীয়ানগরে।
প্রকট হইব জগন্নাথমিশ্র ঘরে ॥
নবদ্বীপ হয় মোর অতি প্রিয় স্থান।
পরব্যোম তার একদেশে অধিষ্ঠান ॥
তুমি মোর নিত্যদাস ভকত প্রধান।
অবশ্য দেখিবে তুমি নবদ্বীপ স্থান ॥
তব শিষ্যগণ দাস্য-রসেতে মগন।
হেথায় থাকুক তুমি করহ গমন ॥
নবদ্বীপ না দেখে যে পাইয়া শরীর।
মিথ্যা তার জন্ম ওহে রামানুজ ধীর ॥
রঙ্গস্থান শ্রীবেঙ্কট যাদব অচল।
নবদ্বীপ-কলা মাত্র হয় সে সকল ॥
অতএব নবদ্বীপে করিয়া গমন।
দেখ গৌরাঙ্গের রূপ কেশবনন্দন ॥
ভক্তি প্রচারিতে তুমি আইলে ধরাতলে।
সার্থক হউক জন্ম গৌর কৃপা বলে ॥
নবদ্বীপ দেখি তুমি যাও কূর্ম্মস্থান।
শিষ্যগণ সনে তথা হইবে মিলন ॥
এত শুনি লক্ষ্মণাচার্য্য যুড়ি দুই কর।
জগন্নাথে নিবেদন করে অতঃপর ॥
তোমার কৃপায় প্রভু গৌর কথা শুনি।
কোন তত্ত্ব গৌরচন্দ্র তাহা নাহি জানি ॥
রামানুজে কৃপা করি জগবন্ধু বলে।
গোলোকের নাথ কৃষ্ণ জানেন সকলে ॥
যাঁহার বিলাস মূর্ত্তি প্রভু নারায়ণ।
সেই কৃষ্ণ পরতত্ত্ব ধাম বৃন্দাবন ॥
সেই কৃষ্ণ পূর্ণ রূপে নিত্য গৌরহরি।
সেই বৃন্দাবনধাম নবদ্বীপপুরী ॥
নবদ্বীপে আমি নিত্য গৌরাঙ্গসুন্দর।
নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ ধাম জগত ভিতর ॥
আমার কৃপায় ধাম আছে ভুমণ্ডলে।
মায়া গন্ধ নাহি তথা সর্ব্ব শাস্ত্র বলে ॥
ভূমণ্ডলে আছে বলি যদি ভাব হীন।
তবে তব ভক্তি ক্ষয় হবে দিনদিন ॥
আমার অচিন্ত্য শক্তি সে চিন্ময় ধামে।
আমার ইচ্ছায় রাখিয়াছে মায়াশ্রমে ॥
যুক্তির অতীত তত্ত্ব শাস্ত্র নাহি পায়।
কেবল জানেন ভক্ত আমার কৃপায় ॥
জগন্নাথ বাক্য শুনি রামানুজ ধীর।
শ্রীগীরাঙ্গ প্রেমে তবে হইল অস্থির ॥
বলে প্রভু বড়ই আশ্চর্য্য লীলা তব।
বেদ শাস্ত্র নাহি জানে তোমার বৈভব ॥
শাস্ত্রেতে বিশেষ রূপে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা।
কেন প্রভু জগন্নাথ ব্যক্ত না করিলা ॥
গাঢ় রূপে শ্রুতি পুরাণাদি দেখি যবে।
কভু গৌরতত্ত্ব স্ফুর্ত্তি চিত্তে পাই তবে ॥
তব আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে ছাড়িল সংশয়।
গৌরলীলা রস হৃদে হইল উদয় ॥
আজ্ঞাহয় নবদ্বীপ করিয়া গমন।
প্রচারিব গৌরলীলা এ তিন ভুবন ॥

গূঢ়শাস্ত্র ব্যক্ত করি জানাব সবারে ।
গৌরভক্ত করি বল এ তিন সংসারে ॥
রামানুজ আগ্রহ দেখিয়া জগন্নাথ ।
বলে রামানুজ নাহি বল ঐছে বাত ॥
গৌরলীলা অতি গূঢ় রাখিবে গোপনে ।
সে লীলার অপ্রকটে পাবে সর্ব্বজনে ॥
তুমি দাস্যরস মোর করহ প্রচার ।
নিজে নিজ চিত্তে গৌর ভজ অনিবার ॥
সঙ্কেত পাইয়া রামানুজ মহাশয় ।
গোপনে শ্রীনবদ্বীপে হইল উদয় ॥
পাছে ব্যক্ত হয় গৌর লীলা অসময়ে ।
সে কারণে রামানুজে বিশ্বক্সেন লয়ে ॥
পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠপুরেতে রাখয় ।
এই স্থান দেখি রামানুজ মুগ্ধ হয় ॥
শ্রীভূলীলা নিসেবিত পরব্যোমপতি ।
দেখা দিল রামানুজে কৃপা করি অতি ॥
রামানুজ নিজ ইষ্টদেবের দর্শনে ।
আপনারে ধন্য মানি গণে মনে মনে ॥
ক্ষণেকে লক্ষণ দেখে পুরট সুন্দর ।
জগন্নাথমিশ্রসুত রূপ মনোহর ॥
রূপের ছটায় রামানুজ মূর্চ্ছা যায় ।
শ্রীগৌর ধরিল পদ তাঁহার মাথায় ॥
দিব্যজ্ঞানে রামানুজ করিল স্তবন ।
নদীয়া প্রকট লীলা পাব দরশন ॥
এই বলি প্রেমে কাঁদে রামানুজস্বামী ।
বলে নবদ্বীপ ছাড়ি নাই যাব আমি ॥
কৃপা করি গৌর হরি বলিল বচন ।
পূর্ণ হবে ইচ্ছা তব কেশবনন্দন ॥
যে কালে নদীয়ালীলা প্রকট হইবে ।
তখন দ্বিতীয় জন্ম নবদ্বীপে পাবে ॥
এই বলি গৌরহরি হৈল অন্তর্দ্ধান ।
স্বস্থ হয়ে রামানুজ করিল প্রয়ান ॥
কতদিনে কূর্ম্মস্থানে হৈল উপস্থিত ।
তথা দেখা হৈল শিষ্যগণের সহিত ॥
দাক্ষিণাত্যে গিয়া দাস্যরস ব্যক্ত করে ।
নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবিয়া অন্তরে ॥
গৌরাঙ্গের কৃপাবশে এই নিত্যধামে ।
জনমিল রামানুজ শ্রীঅনন্ত নামে ॥
বল্লভ আচার্য্য গৃহে করিয়া গমন ।
লক্ষ্মী গৌরাঙ্গের বিভা করে দরশন ॥
অনন্তের গৃহ স্থান দেখ ভক্তগণ ।
হেথা নারায়ণ ভক্ত ছিল বহুজন ॥
তাৎকালিক রাজাগণ এই পীঠস্থানে ।
নারায়ণ সেবা প্রকাশিল সবে জানে ॥
নিঃশ্রেয়স বন এই বিরজার পার ।
ভক্তগণ দেখি পায় আনন্দ অপার ॥
এইরূপ পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে ।
সবে উপনীত মহৎপুর সন্নিহিতে ॥
প্রভু বলে এই স্থানে আছে কাম্যবন ।
পরম ভকতি সহ কর দরশন ॥
পঞ্চবট এই স্থানে ছিল পূর্ব্ব কালে ।
প্রভুর ইচ্ছায় এবে গেল অন্তরালে ॥
এবে এই স্থানে মাতাপুর নামে কয় ।
পূর্ব্ব নাম শাস্ত্রসিদ্ধ মহৎপুর হয় ॥
দ্রৌপদীর সহ পাণ্ডু পুত্র পঞ্চজন ।
অজ্ঞাতবাসেতে গৌড়ে কৈল আগমন ॥
একচক্রা গ্রামে স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির ।
নদীয়া মাহাত্ম্য জানি হইল অস্থির ॥

পরদিন নবদ্বীপ দর্শনের আশে।
এই স্থানে আইল সবে পরম উল্লাসে ॥
নবদ্বীপ শোভা হেরি পাণ্ডুপুত্রগণ।
গৌড়বাসীগণ ভাগ্য করে প্রশংসন ॥
কতদিন করিলেন এই স্থানে বাস।
অসুর রাক্ষসগণে করিল বিনাশ ॥
যুধিষ্ঠির-টিলা এই দেখ সর্ব্বজন।
দ্রৌপদীর কুণ্ড হেথা কর দরশন ॥
স্থানের মাহাত্ম্য জানি রাজা যুধিষ্ঠির।
এই স্থানে কত দিন হইলেন স্থির ॥
এক দিন স্বপ্নে দেখে গৌরাঙ্গের রূপ।
সর্ব্বদিক্ আল করে অতি অপরূপ ॥
হাঁসিতে হাঁসিতে গৌর বলিল বচন।
অতি গোপ্যরূপ এই কর দরশন ॥
আমি কৃষ্ণ নন্দসুত তোমার আলয়ে।
মিত্র ভাবে থাকি সদা নিজ জন হয়ে ॥
এই নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার।
কলিতে প্রকট হয়ে নাশে অন্ধকার ॥
তুমি সবে আছ চিরকাল দাস মম।
আমার প্রকট কালে পাইবে জনম ॥
উৎকল দেশেতে সিন্ধুতীরে তোমা সহ।
একত্রে পুরুষোত্তমে রব অহরহ ॥
এই স্থানে হৈতে এবে যাহ ওড্র দেশ।
সে দেশ পবিত্র করি নাশ জীব ক্লেশ ॥
স্বপ্ন দেখি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে বলে।
যুক্তি করি ছয় জনে ওড্র দেশে চলে ॥
নবদ্বীপ ছাড়িতে হইল বড় ক্লেশ।
তথাপি পালন করে প্রভুর আদেশ ॥
এই স্থানে মধ্বমুনি শিষ্যগণ লয়ে।
রহিলেন কতদিন ধামবাসী হয়ে ॥
মধ্বরে করিয়া কৃপা গৌরাঙ্গ সুন্দর।
স্বপ্নে দেখাইল রূপ অতি মনোহর ॥
হাঁসি হাঁসি গৌরচন্দ্র মধ্বাচার্য্যে বলে।
তুমি নিত্যদাস মম জানেত সকলে ॥
নবদ্বীপে যবে আমি প্রকট হইব।
তব সম্প্রদায় আমি স্বীকার করিব ॥
এবে সর্ব্বদেশে তুমি করিয়া যতন।
মায়াবাদ অসচ্ছাস্ত্র কর উৎপাটন ॥
শ্রীমূর্ত্তিমাহাত্ম্য তুমি কর পরকাশ।
তব শুদ্ধ মত আমি করিব বিকাশ ॥
এত বলি গৌরচন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রা ভাঙ্গি মধ্বমুনি হইল অজ্ঞান ॥
আর কি দেখিব রূপ পুরট সুন্দর।
বলিয়া ক্রন্দন করে মধ্ব অতঃপর ॥
দৈববাণী হৈল তবে নির্ম্মল আকাশে।
আমারে গোপনে ভজি আইস মম পাশে ॥
সুস্থির হইয়া মধ্বাচার্য্য মহাশয়।
মায়াবাদী দিগ্বিজয়ে করিল বিজয় ॥
এই সব পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে।
রুদ্রদ্বীপে উপনীত দেখিতে দেখিতে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ বলে এই রুদ্রখণ্ড।
ভাগীরথী প্রভাবে হইল দুই খণ্ড ॥
লোক বাস নাহি হেথা প্রভুর ইচ্ছায়।
পশ্চিমের দ্বীপ দেখ পূর্ব্বপারে যায় ॥
হেথা হৈতে দেখ ঐ শ্রীশঙ্করপুর।
শোভা পায় গঙ্গাতীরে দেখ কতদূর ॥
শঙ্কর আচার্য্য যবে করে দিগ্বিজয়।
নবদ্বীপ জয়ে তথা উপস্থিত হয় ॥

মনেতে বৈষ্ণবরাজ আচার্য্য শঙ্কর ।
বাহিরে অদ্বৈতবাদী মায়ার কিঙ্কর ॥
নিজে রুদ্র অংশ সদা প্রতাপে প্রচুর ।
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের মত প্রচারেতে শূর ॥
প্রভুর আজ্ঞায় রুদ্র এই কার্য্য করে ।
আইলেন যবে তেঁহ নদীয়া নগরে ॥
স্বপ্নে প্রভু গৌরচন্দ্র দিলা দরশন ।
কৃপা করি বলে তারে মধুর বচন ॥
তুমিত আমার দাস মম আজ্ঞা ধরি ।
প্রচারিছ মায়াবাদ বহু যত্ন করি ॥
এই নবদ্বীপধাম মম প্রিয় অতি ।
হেথা মায়াবাদ কভু না পাইবে গতি ॥
বৃদ্ধশিব হেথা প্রৌঢ়ামায়ারে লইয়া ।
কল্পিত আগমগণে দেন প্রচারিয়া ॥
মম ভক্তগণে দ্বেষ করে যেই জন ।
তাহারে কেবল তেঁহ করেন বঞ্চন ॥
এই স্থানে সাধারণে মম ভক্ত হয় ।
দুষ্ট মত প্রচারের স্থান ইহা নয় ॥
অতএব তুমি কর অন্যত্র গমন ।
নবদ্বীপবাসিগণে না কর পীড়ন ॥
স্বপ্নে নবদ্বীপ তত্ত্ব জানিয়া তখন ।
ভক্ত্যাবেশে অন্য দেশে করিল গমন ॥
এই রুদ্রদ্বীপ হয় রুদ্রগণ স্থান ।
হেথা রুদ্রগণ গৌরগুণ করে গান ॥
শ্রীনীললোহিতরুদ্রগণ অধিপতি ।
মহানন্দে নৃত্য হেথা করে নিতি নিতি ॥
রুদ্র নৃত্য দেখি আকাশেতে দেবগণ ।
আনন্দেতে করে সবে পুষ্প বরিষণ ॥
কদাচিৎ বিষ্ণুস্বামী আসি দিগ্বিজয়ে ।
রুদ্রদ্বীপে রহে রাত্রে শিষ্যগণ লয়ে ॥
হরি হরি বলি নৃত্য করে শিষ্যগণ ।
বিষ্ণুস্বামী শ্রুতি স্তুতি করেন পঠন ॥
ভক্তি আলোচনা দেখি হয়ে হরষিত ।
কৃপা করি দেখা দিল শ্রীনীললোহিত ॥
বৈষ্ণব সভায় রুদ্র হৈল উপনীত ।
দেখি বিষ্ণুস্বামী অতি হৈল চমকিত ॥
করযুড়ি স্তব করে বিষ্ণু ততক্ষণ ।
দয়ার্দ্র হইয়া রুদ্র বলেন বচন ॥
তোমরা বৈষ্ণবজন মম প্রিয় অতি ।
ভক্তি আলোচনা দেখি তুষ্ট মম মতি ॥
বর মাগ দিব আমি হইয়া সদয় ।
বৈষ্ণবে অদেয় মোর কিছু নাহি হয় ॥
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া বিষ্ণু মহাশয় ।
করযুড়ি বর মাগে প্রেমানন্দময় ॥
এই বর দেহ প্রভু আমা সবাকারে ।
ভক্তি সম্প্রদায় সিদ্ধি লভি অতঃপরে ॥
পরম আনন্দে রুদ্র বর করি দান ।
নিজ সম্প্রদায় বলি করিল আখ্যান ॥
সেই হৈতে বিষ্ণুস্বামী স্বীয় সম্প্রদায় ।
শ্রীরুদ্র নামেতে খ্যাতি দিয়া নাচে গায় ॥
রুদ্র কৃপা বলে বিষ্ণু এ স্থানে রহিয়া ।
ভজিল শ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমের লাগিয়া ॥
স্বপ্নে আসি শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুরে বলিল ।
মম ভক্ত রুদ্র কৃপা তোমারে হইল ॥
ধন্য তুমি নবদ্বীপে পাইলে ভক্তি ধন ।
শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচারহ এইক্ষণ ॥
কতদিনে হবে মোর প্রকট সময় ।
শ্রীবল্লভভট্ট রূপে হইবে উদয় ॥

শ্রীক্ষেত্রে আমারে তুমি করি দরশনে ।
সম্প্রদায় সিদ্ধি পাবে গিয়া মহাবনে ॥
ওহে জীব শ্রীবল্লভ গোকুলে এখন ।
তুমি তথা গেলে পাবে তার দরশন ॥
এত বলি নিত্যানন্দ দক্ষিণাভিমুখে ।
পারডাঙ্গা শ্রীপুলিনে চলিলেন সুখে ॥
পুলিনে যাইয়া প্রভু নিত্যানন্দরায় ।
শ্রীরাসমণ্ডল ধীরসমীর দেখায় ॥
বলে জীব এই দেখ নিত্য-বৃন্দাবন ।
বৃন্দাবন-লীলা হেথা পায় দরশন ॥
বৃন্দাবন শুনি জীব প্রেমেতে বিহ্বল ।
নয়নেতে বহে দরদর প্রেমজল ॥
প্রভু বলে শ্রীগৌরাঙ্গ লয়ে ভক্তজন ।
এই স্থানে রাসপদ্য করিল কীর্ত্তন ॥
মহারাস লীলাস্থান যথা বৃন্দাবনে ।
তথা এই স্থান জীব জাহ্নবী পুলিনে ॥
নিত্যরাস হয় হেথা গোপীগণ সনে ।
দরশন করে কভু ভাগ্যবান জনে ॥
ইহার পশ্চিমে দেখ শ্রীধীরসমীর ।
ভজনের স্থান এই শুন ওহে ধীর ॥
ব্রজে ধীরসমীর যে-যমুনার তীরে ।
সেই স্থান হেথা গঙ্গাপুলিন ভিতরে ॥
দেখিতে গঙ্গার তীর বস্তুত তা নয় ।
গঙ্গার পশ্চিমধারে শ্রীযমুনা বয় ॥
যমুনার তীরে এই পুলিন সুন্দর ।
অতএব বৃন্দাবন বলে বিশ্বম্ভর ॥
বৃন্দাবনে যতস্থান লীলার আছয় ।
সে সব জানহ জীব এই স্থানে হয় ॥
বৃন্দাবনে নবদ্বীপে কিছু নাহি ভেদ ।
গৌর কৃষ্ণে কভু নাহি করিবে প্রভেদ ॥
মহাভাবে গরগর নিত্যানন্দরায় ।
বৃন্দাবন দেখাইয়া জীবে লয়ে যায় ॥
কতদূরে উত্তরেতে করিয়া গমন ।
রুদ্রদ্বীপে সেই রাত্রি করিল যাপন ॥
নিতাই জাহ্নবা পদ যাহার সম্পদ ।
নদীয়া মাহাত্ম্য গায় সে ভক্তিবিনোদ ॥

ষোড়শ অধ্যায় : শ্রীবিল্বপক্ষ ও শ্রীভরদ্বাজটিলা বর্ণন

জয় জয় নদীয়াবিহারী গৌরচন্দ্র ।
জয় একচক্রাপতি প্রভু নিত্যানন্দ ॥
জয় শান্তিপুর নাথ অদ্বৈত ঈশ্বর ।
রামচন্দ্রপুরবাসী জয় গদাধর ॥
জয় জয় গৌড়ভূমি চিন্তামণি সার ।
কলিযুগে কৃষ্ণ যথা করিলা বিহার ॥
শ্রীজাহ্নবী পার হয়ে পদ্মারনন্দন ।
কিছুদূরে গিয়া বলে দেখ ভক্তগণ ॥
বিল্বপক্ষ নাম এই স্থান মনোহর ।
বেলপুখরিয়া বলি বলে সর্ব্ব নর ॥
ব্রজধামে যারে শাস্ত্রে বলে বিল্ববন ।
নববদ্বীপে সেই স্থান কর দরশন ॥
পঞ্চবক্ত্র বিল্বকেশ আছিল হেথায় ।
একপক্ষ বিল্বদলে আরাধিয়া তাঁয় ॥

ব্রাহ্মণ সজ্জনগণে তুষিল তাঁহারে ।
কৃষ্ণভক্তি বর দিল তাহা সবাকারে ॥
সেই বিপ্রগণ মধ্যে নিম্বাদিত্য ছিল ।
বিশেষ করিয়া পঞ্চবক্ত্রে আরাধিল ॥
কৃপা করি পঞ্চবক্ত্র কহিল তখন ।
এই গ্রাম প্রান্তে আছে দিব্য বিল্ববন ॥
সেই বন মধ্যে চতুঃসন আছে ধ্যানে ।
তাঁদের কৃপায় তব হবে দিব্য জ্ঞানে ॥
চতুঃসন গুরু তব তাঁদের সেবায় ।
সর্ব্ব অর্থ লাভ তব হইবে হেথায় ॥
এত বলি মহেশ্বর হৈল অন্তর্দ্ধান ।
নিম্বাদিত্য অন্বেষণ করি পায় স্থান ॥
বিল্ববন মধ্যে দেখে বেদী মনোহর ।
চতুঃসন বসিয়াছে তাহার উপর ॥
সনক সনন্দ আর ঋষি সনাতন ।
শ্রীসনৎকুমার এই ঋষি চারি জন ॥
বৃদ্ধকেশ সন্নিধানে অন্য অলক্ষিত ।
বস্ত্রহীন সুকুমার উদার চরিত ॥
দেখি নিম্বাদিত্যাচার্য্য পরম কৌতুকে ।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ডাকি বলে সুখে ॥
হরিনাম শুনি কাণে ধ্যান ভঙ্গ হৈল ।
সম্মুখে বৈষ্ণবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া সবে হয়ে হৃষ্টমন ।
নিম্বাদিত্যে ক্রমে ক্রমে দেয় আলিঙ্গন ॥
কে তুমি কেন বা হেথা বল পরিচয় ।
তোমার প্রার্থনা মোরা পূরিব নিশ্চয় ॥
শুনি নিম্বাদিত্য দণ্ডবৎ প্রণমিয়া ।
নিজ পরিচয় দেয় বিনীত হইয়া ॥
নিম্বার্কের পরিচয় করিয়া শ্রবণ ।
শ্রীসনৎকুমার কয় সহাস্য বদন ॥
কলি ঘোর হইবে জানিয়া কৃপাময় ।
ভক্তি প্রচারিতে চিত্তে করিল নিশ্চয় ॥
চারিজন ভক্তে শক্তি করিয়া অর্পণ ।
ভক্তি প্রচারিতে বিশ্বে করিল প্রেরণ ॥
রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণু এই তিন জন ।
তুমিত চতুর্থ হও ভক্ত মহাজন ॥
শ্রীদেবী করিল রামানুজে অঙ্গীকার ।
ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যে রুদ্র বিষ্ণুকে স্বীকার ॥
আমরা তোমাকে আজ জানিনু আপন ।
শিষ্য করি ধন্য হই এই প্রয়োজন ॥
পূর্ব্বে মোরা অভেদ-চিন্তায় ছিনু রত ।
কৃপাযোগে সেই পাপ হৈল দূরগত ॥
এবে শুদ্ধ ভক্তি অতি উপাদেয় জানি ।
সংহিতা রচনা করিয়াছি একখানি ॥
সনৎকুমার সংহিতা ইহার নাম হয় ।
এইমতে দীক্ষা তব হইবে নিশ্চয় ॥
গুরু অনুগ্রহ দেখি নিম্বার্ক ধীমান ।
অবিলম্বে আইলা করি ভাগীরথী স্নান ॥
সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া বলে সদৈন্য বচন ।
এ অধমে তার নাথ পতিতপাবন ॥
চতুঃসন কৈল শ্রীযুগল মন্ত্র দান ।
ভাবমার্গে উপাসনা করিল বিধান ॥
মন্ত্র লভি নিম্বাদিত্য সিদ্ধ পীঠস্থানে ।
উপাসনা করিলেন সংহিতা বিধানে ॥
কৃপা করি রাধাকৃষ্ণ তারে দেখা দিল ।
রূপের ছটায় চতুর্দ্দিক আলো হৈল ॥
মৃদু মৃদু হাঁসি মুখে বলেন বচন ।
ধন্য তুমি নিম্বাদিত্য করিলে সাধন ॥

অতি প্রিয় নবদ্বীপ আমা দোঁহাকার।
হেথা দোঁহে একরূপ শচীর কুমার॥
বলিতে বলিতে গৌররূপ প্রকাশিল।
রূপ দেখি নিম্বাদিত্য বিহ্বল হইল॥
বলে কভু নাহি দেখি নাহি শুনি কাণে।
এহেন অপূর্ব্ব রূপ আছে কোনখানে॥
কৃপা করি মহাপ্রভু বলিল তখন।
এরূপ গোপন এবে কর মহাজন॥
প্রচারহ কৃষ্ণভক্তি যুগল বিলাস।
যুগল বিলাসে মোর অত্যন্ত উল্লাস॥
যে সময়ে গৌররূপ প্রকট হইবে।
শ্রীবিদ্যাবিলাসে তবে বড় রঙ্গ হবে॥
সে সময়ে কাশ্মীর প্রদেশে জন্ম লয়ে।
ভ্রমিবে ভারতবর্ষ দিগ্বিজয়ী হয়ে॥
কেশবকাশ্মীরী নামে সকলে তোমায়।
মহাবিদ্যাবান বলি সর্ব্বত্রেতে গায়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এই নবদ্বীপধামে।
আসিয়া থাকিবে তুমি মায়াপুরগ্রামে॥
নবদ্বীপে বড় বড় অধ্যাপকগণ।
তব নাম শুনি করিবেক পলায়ন॥
আমিত তখন বিদ্যাবিলাসে মাতিব।
পরাজিয়া তোমা সবে আনন্দ লভিব॥
সরস্বতী কৃপাবলে জানি মম তত্ত্ব।
আশ্রয় করিবে মোরে ছাড়িয়া মহত্ত্ব॥
ভক্তি দান করি আমি তোমারে তখন।
ভক্তি প্রচারিতে পুনঃ করিব প্রেরণ॥
অতএব দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচারিয়া।
তুষ্ট কর এবে মোরে গোপন করিয়া॥
যবে আমি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিব।
তোমাদের মতসার নিজে প্রচারিব॥
মাধ্ব হইতে সারদ্বয় করিব গ্রহণ।
এক হয় কেবল অদ্বৈত নিরসন॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি নিত্য জানি তাহার সেবন।
সেইত দ্বিতীয় সার জান মহাজন॥
রামানুজ হৈতে আমি লই দুই সার।
অনন্য ভকতি ভক্তজন সেবা আর॥
বিষ্ণু হৈতে দুই সার করিব স্বীকার।
ত্বদীয় সর্ব্বস্ব ভাব রাগমার্গ আর॥
তোমা হৈতে লব আমি দুই মহাসার।
একান্ত রাধিকাশ্রয় গোপীভাব আর॥
এত বলি গৌরচবন্দ্র হৈল অদর্শন।
প্রেমে নিম্বাদিত্য কত করিল রোদন॥
গুরুপাদপদ্ম নমি চলে দেশান্তর।
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে হইলা তৎপর॥
দূর হৈতে রামতীর্থ জীবেরে দেখায়।
কোলাসুরে হলধর বধিল যথায়॥
করিলেন গঙ্গাস্নান লয়ে যদুগণ।
রুক্মপুর বলি নাম প্রকাশ এখন॥
নবদ্বীপ পরিক্রমা ঐ একশেষ।
কার্ত্তিক মাসেতে তথা মাহাত্ম্য বিশেষ॥
বিল্বপক্ষ ছাড়ি প্রভু লয়ে ভক্তগণ।
ভরদ্বাজটিলা গ্রামে করে আরোহণ॥
নিত্যানন্দ বলে এই স্থানে মুনিবর।
আইলেন দেখি তীর্থ শ্রীগঙ্গাসাগর॥
হেথা শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র করি আরাধনা।
রহিলেন কতদিন মুনি মহাজন॥
তাঁর আরাধনে তুষ্ট হয়ে বিশ্বম্ভর।
নিজরূপে দেখা দিলা সদয় অন্তর॥

মুনিরে বলিল তব ইষ্ট সিদ্ধ হবে।
আমার প্রকট কালে আমারে দেখিবে ॥
এই কথা বলি প্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।
ভরদ্বাজ মহাপ্রেমে হইল অজ্ঞান ॥
কতদিন থাকি এই টিলার উপর।
অন্যতীর্থ দরশনে গেলা মুনিবর ॥
লোকেতে ভারুইডাঙ্গা বলে এই স্থানে।
মহাতীর্থ হয় এই শাস্ত্রের বিধানে ॥
বলিতে বলিতে সবে যায় মায়াপুর।
আগুবাড়ি লয় সবে ঈশানঠাকুর ॥
মহাপ্রেমে নিত্যানন্দ করেন নর্ত্তন।
সকল বৈষ্ণব মেলি করেন কীর্ত্তন ॥
জগন্নাথ মিশ্রালয় সর্ব্ব পীঠ সার।
নাম সহ যথা শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার ॥
সেইদিন প্রভু গৃহে প্রভুর জননী।
বৈষ্ণবগণেরে অন্ন খাওয়ান আপনি ॥
কি আনন্দ হৈল তথা না হয় বর্ণন।
মহা সমারোহে হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া যার আশ।
এ ভক্তিবিনোদ গায় নদীয়া বিলাস ॥

সপ্তদশ অধ্যায় : শ্রীজীবগোস্বামীর প্রশ্নোত্তর

জয় জয় গোরাচাঁদ জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত গদাধর প্রেম-রসানন্দ ॥
জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত নবদ্বীপ জয়।
জয় নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রেমের নিলয় ॥
বসিয়াছে নিত্যানন্দ শ্রীবাসঅঙ্গণে।
গৌরপ্রেমে বারিধারা বহে দুনয়নে ॥
চারিদিকে বৈষ্ণব সজ্জন অগণন।
গৌরপ্রেম পারাবারে মগ্ন সর্ব্বজন ॥
কতক্ষণে শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়।
শ্রীযুগল প্রেমে মত্ত হইল উদয় ॥
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া নিত্যানন্দ পায়।
শ্রীবাসঅঙ্গণে তবে গড়াগড়ি যায় ॥
যতনে শ্রীনিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে বচন।
কতদিন পরে যাবে তুমি বৃন্দাবন ॥
জীব বলে প্রভু আজ্ঞা সর্ব্বোপরি হয়।
আজ্ঞা পাইলে করি আমি বৃন্দাবনাশ্রয় ॥
দুই এক কথা মোর আছে জিজ্ঞাসিতে।
উত্তর দেও হে প্রভু এ দাসের হিতে ॥
এই নবদ্বীপধাম হয় বৃন্দাবন।
তবে কেন বৃন্দাবন গমনে যতন ॥
জীব প্রশ্ন শুনি প্রভু করেন উত্তর।
বড় গুহ্যকথা এই শুন অতঃপর ॥
প্রভু প্রকট লীলা যতদিন রয়।
দেখ যেন বহির্ম্মুখ জনে না জানয় ॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবন হয় এক তত্ত্ব।
পরস্পর কিছু নাহি হীনত্ব মহত্ত্ব ॥
সেই বৃন্দাবনধাম রসের আধার।
সে রস না পায় যার নাহি অধিকার ॥
কৃপা করি সেই ধাম নবদ্বীপ হয়।
হেথা রস অধিকার জীবে উপজয় ॥

রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় সর্ব্ব রস সার।
সহসা তাহাতে নাহি হয় অধিকার ॥
কত জন্ম তপস্যা করিয়া হয় জ্ঞান।
জ্ঞান পরিপক্কে পায় রসের সন্ধান ॥
তাহাতে ব্যাঘাত বহু আছে সর্ব্বক্ষণ।
অতএব সুদুর্ল্লভ রস মহাধন ॥
যেই সেই ব্রজে গিয়া নাহি পায় রস।
অপরাধ বশে রস হয়ত বিরস ॥
ঘোর কলিকালে অপরাধ সর্ব্বকাল।
জীবের জীবন স্বল্প বড়ই জঞ্জাল ॥
ইচ্ছা করিলেও ব্রজরস লভ্য নয়।
অতএব কৃষ্ণ কৃপা রস হেতু হয় ॥
রাধাকৃষ্ণ কৃপা করি জীবের উপর।
বৃন্দাবন সহ সমুদিতে অতঃপর ॥
এক মূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ প্রভু গৌরহরি।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে এবে অবতরি ॥
রস অধিকার জীবে করেন প্রদান।
অপরাধ বাধা কভু নাহি পায় স্থান ॥
হেথা বাস করি নাম করিলে আশ্রয়।
রসে অধিকার জন্মে অপরাধ ক্ষয় ॥
স্বল্পদিনে কৃষ্ণপ্রেম হয়ত উজ্জ্বল।
যুগল-রসের বার্ত্তা হয়ত প্রবল ॥
তবে জীব গৌরকৃপা করিয়া অর্জ্জন।
যুগল-রসের পীঠ পায় বৃন্দাবন ॥
গূঢ় তত্ত্ব এই নাহি কহ যারে তারে।
নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদ হইতে নারে ॥
তোমার আশ্রয় এবে রসপীঠ হয়।
অতএব বৃন্দাবন করহ আশ্রয় ॥
এই ধামে বৃন্দাবন হয়ত উদয়।
তবু ব্রজধাম তব হউক আশ্রয় ॥
ব্রজরস অধিকারে নবদ্বীপাশ্রয়।
জীবের কর্ত্তব্য সদা বল্লভতনয় ॥
ব্রজরস প্রাপ্তিস্থলে বৃন্দাবন বাস।
জীবের যথায় হয় রসের উল্লাস ॥
নবদ্বীপ কৃপা যবে লভে সাধুজন।
তবে অনায়াসে লভে ধাম বৃন্দাবন ॥
প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনি জীব মহাশয়।
পরম আনন্দে প্রভুচরণ ধরয় ॥
চরণ ধরিয়া বলে কথা এক আর।
আছে মোর শুন প্রভু সর্ব্বসারাৎসার ॥
এই নবদ্বীপে বাস করে বহুজন।
সবে কেন কৃষ্ণভক্তি না করে অর্জ্জন ॥
ধামে বৈসে তবু কেন অপরাধ রয়।
আমার হইল এবে বিষম সংশয় ॥
কিসে তবে নিশ্চিন্ত হইবে বিষ্ণুজন।
বল প্রভু বিশ্বধাম নিত্য নিরঞ্জন ॥
নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া আশ যার।
সে ভক্তিবিনোদ কহে অকিঞ্চন ছার ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় : শ্রীজীব গোস্বামীর সংশয় ছেস ও তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শচীর নন্দন ।
জয় পদ্মাবতীসুত জাহ্নবাজীবন ॥
জয় সীতাপতি জয় জয় গদাধর ।
জয় শ্রীবাসাদি যত গৌর পরিকর ॥
শুনিয়া জীবের প্রশ্ন নিত্যানন্দরায় ।
বলেন নিগূঢ় তত্ত্ব বৈষ্ণবসভায় ॥
শুন জীব বৃন্দাবন নবদ্বীপধাম ।
অজস্র আনন্দময় জীবের বিশ্রাম ॥
শুদ্ধজীবগণ জড়াপ্রকৃতির পার ।
সদা বাস করে হেথা কৃষ্ণপরিবার ॥
এই ধাম নিত্যধাম বিশুদ্ধ চিন্ময় ।
জড়দেশকাল হেথা পায় পরাজয় ॥
এ ধামের দেশকাল চিদানন্দময় ।
জড়ধর্ম্ম বিপর্য্যয় সদা লক্ষ্য হয় ॥
গৃহ দ্বারা নদ নদী কানন চত্বর ।
চিন্ময় সকল জান অতি মনোহর ॥
সেই ত আনন্দধাম প্রকৃতির পার ।
অচিন্ত্য কৃষ্ণের শক্তি পরম উদার ॥
সেই শক্তিক্রমে ধাম হেথা অবতার ।
জীবের নিস্তার জন্য কৃষ্ণ ইচ্ছা সার ॥
ধাম মধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি ।
জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেথা গতি ॥
ধামের উপরে জড়মায়া পাতি জাল ।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যার নাহিক সম্বন্ধ ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ ॥
মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপপুরে ।
প্রৌঢ়ামায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে দূরে ॥
যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ পায় ।
তবে কৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধ আসে তায় ॥
সম্বন্ধ নিগূঢ় তত্ত্ব বল্লভনন্দন ।
সহজে না বুঝে বদ্ধ জীব সেই ধন ॥
মুখে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মোর ।
হৃদয় সম্বন্ধহীন সদা মায়াভোর ॥
সেই সব লোক বৈসে মায়াজালোপরি ।
কভু শুদ্ধভক্তি নাহি পায় হরি হরি ॥
ধর্ম্মধ্বজি সুকপটী সদা দৈন্যহীন ।
দম্ভগুণে আপনাকে ভাবে সমীচীন ॥
সেই দম্ভ ছাড়ে সাধু চরণ প্রসাদে ।
তৃণ হৈতে আপনাকে দীন করি সাধে ॥
বৃক্ষাপেক্ষা হয় তারে সহিষ্ণুতাগুণ ।
অমানী আপনি অন্যে সম্মানে নিপুণ ॥
এই চারি গুণে গুণী কৃষ্ণগুণ গায় ।
চৈতন্য সম্বন্ধ তার বসেন হিয়ায় ॥
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ শান্ত দাস্য সখ্য আর ।
বাৎসল্য মধুর ইতি পঞ্চপরকার ॥
শান্ত দাস্য ভাবে করি গৌরাঙ্গ ভজন ।
লভে বাৎসল্যাদি-রস কৃষ্ণে সাধুজন ॥

যার যেই সম্বন্ধ জনিত সিদ্ধভাব।
তাহার ভজনে সেই ভাবের প্রভাব ॥
গৌর কৃষ্ণে ভেদ যার সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ কভু না হয় তাহার ॥
সাধুসঙ্গে দৈন্য আদি গুণ যার হয়।
সেই জীব দাস্যরসে গৌরাঙ্গ ভজয় ॥
দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ ভজনে।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বলে সাধুজনে ॥
মধুর প্রেমেতে যার হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌর ভজন তাহার ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐক্য আবার শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
যুগল বিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায় ॥
দাস্য পরিপক্কে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুররস উদে মূর্ত্তিমান হয়ে ॥
সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হয়ে ব্রজে অবতরি ॥
নিত্যলীলা রসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ব্রজধাম পায় ॥
নবদ্বীপে ব্রজে সেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হয়ে দুই হয় নাহি দেখে অন্ধ ॥
সেই ত সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার।
মধুররসেতে গৌর যুগল আকার ॥
সেই সব তত্ত্ব তোরে রূপ-সনাতন।
জানাইবে অল্পদিনে বল্লভনন্দন ॥
তোরে বৃন্দাবনে প্রভু দিল অধিকার।
বিলম্ব না কর জীব ব্রজে যেতে আর ॥
এতবলি প্রভু তার মস্তকে চরণ।
অর্পণ করিয়া শক্তি করে সঞ্চরণ ॥
মহাপ্রেমে শ্রীজীব গোস্বামী কতক্ষণ।
নিত্যানন্দ পদতলে রহে অচেতন ॥
শ্রীবাসঅঙ্গনে জীব গড়াগড়ি যায়।
সাত্ত্বিক বিকার সব দেহে শোভা পায় ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে দুর্ভাগ্য আমার।
না দেখিনু এ নয়নে নদীয়াবিহার ॥
জীব নিস্তারিতে লীলা কৈল গৌররায়।
সে লীলা না দেখি মোর দিন বৃথা যায় ॥
শ্রীজীব যাইবে ব্রজে করিয়া শ্রবণ।
শ্রীবাসঅঙ্গনে আইল যত সাধুজন ॥
বৃদ্ধ সব শ্রীজীবে করেন আশীর্ব্বাদ।
কনিষ্ঠ বৈষ্ণব মাগে শ্রীজীবপ্রসাদ ॥
করযুড়ি বলে জীব সকল বৈষ্ণবে।
মম অপরাধ কিছুমাত্র নাহি লবে ॥
তোমরা চৈতন্যদাস জগতের গুরু।
এ ক্ষুদ্র জীবেরে দয়া কর কল্পতরু ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে মোর থাক্ রতি মতি।
নিত্যানন্দ প্রভু হক্ জন্মে জন্মে গতি ॥
নাহি বুঝি বাল্যকালে ছাড়িলাম ঘর।
তুমি সব জীবনের বন্ধু অতঃপর ॥
বৈষ্ণবানুকম্পা বিনা কৃষ্ণ নাহি পাই।
বৈষ্ণবচরণধূলি দেহ সবে ভাই ॥
এতবলি সকলে করিয়া স্তুতি নতি।
নিত্যানন্দ প্রভুর লইয়া অনুমতি ॥
জগন্নাথ গৃহে গিয়া শচীর চরণে।
ব্রজে যাইতে আজ্ঞা লয় বিকলিত মনে ॥
শ্রীচরণরেণু দিয়া শচীদেবী তায়।
আশীর্ব্বাদ করি জীবে করিল বিদায় ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে জীব ভাগীরথী পার ।
হা গৌরাঙ্গ বলি যায় আজ্ঞা জানি সার ॥
কতক্ষণ চলি চলি নবদ্বীপ সীমা ।
পার হয়ে যায় জীব অনন্ত মহিমা ॥
নবদ্বীপধাম ছাড়ি শ্রীজীব তখন ।
সাষ্টাঙ্গ প্রণমি চলে যথা বৃন্দাবন ॥
ব্রজধাম শ্রীযমুনা রূপসনাতন ।
জাগিতে লাগিল হৃদে জীবের তখন ॥
পথিমধ্যে রাত্রে স্বপ্নে দেখে গৌররায় ।
জীবেরে বলেন তুমি যাও মথুরায় ॥
অতি প্রিয় তুমি আর রূপসনাতন ।
একত্রে করহ ভক্তিশাস্ত্র প্রকটন ॥
আমার যুগল সেবা তোমার জীবন ।
শ্রীব্রজবিলাস সদা করহ দর্শন ॥
স্বপ্ন দেখি জীবের আনন্দ হৈল অতি ।
ব্রজধাম প্রতি ধায় সুসত্বর গতি ॥
ব্রজে গিয়া শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয় ।
যে যে কার্য্য সাধিল তা বর্ণন না হয় ॥
ভাগ্যবান জন পরে করিবে বর্ণন ।
শুনিবে আনন্দচিত্তে যত সাধুজন ॥
ছারবুদ্ধি এ ভক্তিবিনোদ অভাজন ।
শ্রীধাম ভ্রমণবার্ত্তা করিল বর্ণন ॥
বৈষ্ণবচরণে মোর এই সে প্রার্থনা ।
শ্রীগৌরসম্বন্ধ মোর হউক যোজনা ॥
শ্রীগৌর সম্বন্ধ সহ নবদ্বীপ বাস ।
হউক অচিরে মোর এই অভিলাষ ॥
বিষয় গর্ত্তের কীট অতি দুরাচার ।
ভক্তিহীন কাম রত ক্রোধ মত্ত আর ॥
এ হেন দুর্জ্জন আমি মায়ার কিঙ্কর ।
শ্রীগৌর সম্বন্ধ কিসে পাই অতঃপর ॥
নবদ্বীপধাম মোরে অনুগ্রহ করি ।
উদয় হউন হৃদে তবে আমি তরি ॥
প্রৌঢ়ামায়া কুলদেবী কৃপা অকপট ।
ভরসা তরিতে মাত্র অবিদ্যা সঙ্কট ॥
বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন সদয় ।
চিদ্ধাম আমার চক্ষে হউন উদয় ॥
নবদ্বীপবাসী যত গৌরভক্তগণ ।
এ পামর শিরে সবে ধরুন চরণ ॥
এই ত প্রার্থনা মোর শুন সর্ব্বজন ।
অচিরেতে যেন পাই চৈতন্যচরণ ॥
নিত্যানন্দ শ্রীজাহ্নবা আদেশ পাইয়া ।
বর্ণিলাম নবদ্বীপ অতি দীন হৈয়া ॥
নবদ্বীপ গৌর নিত্যানন্দ নামময় ।
এই গ্রন্থ বিরচিত হইল নিশ্চয় ॥
অতএব এই গ্রন্থ পরম পাবন ।
রচনা দোষেতে দোষী নহে কদাচন ॥
এই গ্রন্থ পাঠ করি' গৌরভক্তজন ।
পরিক্রমা ফল সদা করেন অর্জ্জন ॥
পরিক্রমাকালে গ্রন্থ কৈলে আলোচন ।
শতগুণ ফল হয় শাস্ত্রের বচন ॥
নিতাই জাহ্নবা পদ ছায়া আশ যার ।
নদীয়া মাহাত্ম্য গায় দীন হীন ছার ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যের পরিক্রমাখণ্ড সমাপ্ত ।

নিন্দন্তং পুলকোত্করেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং
প্রোদ্ধ্বীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরিহরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ।
নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমূর্বীতলং
গায়ন্তং নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং নুমঃ॥

(শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী)

“রাধারসশুধা আস্বাদন করতে করতে একদম উন্মাদী হইয়ে মহাপ্রভুর সমস্ত দেহের লোম খাড়া হয় বলে তাঁর রূপ কদম্বফুলের মত পরিবর্তন হয়। বাহু তুলে তিনি গোলোকাভিমুখে দেখিয়ে দিয়ে হেঁটে হেঁটে সারাক্ষণ ‘হরি হরি! হরিবল হরিবল!’ উচ্চারণ করেন। যখন তিনি নাচেন, তখন যে অশ্রু-নির্ঝর তাঁর কমললোচন থেকে পড়ে, সে মাটিতে সেচন করে। তাঁর নিকটে সব পার্ষদগণ—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস ঠাকুর, নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীমুরারীগুপ্ত, ইত্যাদি। সমস্ত ভক্তগণ তাঁর সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপধামে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। আমরা এই শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।”

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ)

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা

অনন্তশ্রীবিভূষিত ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি বিশ্ববরেণ্য জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের

পদ্মমুখের হরিকথামৃত

ধাম-পরিক্রমা সম্বন্ধে

“অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, নানাস্থান ভ্রমণ করে কি প্রয়োজন ? বিশেষতঃ যদি বাড়ীতে ব’সে থেকে হরিসেবা হয়, তে অন্যত্র যাওয়ারই বা কি দরকার ?

বাড়ীতে ব’সে থাকলে আমরা সাধুগণের সহিত মিলিত হ’তে পারি না। তাঁদের নিকট কথাবার্ত্তা শুনবার অবসর পাই না,—আমাদের যখন কাজ না থাকে, তখন অপকর্ম্ম ক’রে বসি—বাজে গল্পে গুজবে, পরিনিন্দায়, পরচর্চ্চায় সময় কাটায়ে দিই। সাধুসঙ্গে থাকলে হরিকথা শুনতে পারি, নিজত্বের বিচারে ভ্রান্তি হওয়ায় যে সকল অপকর্ম্ম ক’রে থাকি, তা’ হ’তে নিরম্মুক্ত হ’তে পারি। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা আমাদের যে অসুবিধা হয়, সাধুর সঙ্গে থেকে হরিকথা শুনলে আমরা সেই অসুবিধার হাত থেকে ছুটী পেতে পারি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দৈবীমায়া ভগবদ্বিমুখতার রাজ্যে উপস্থিত করাচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমাদের কক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ’য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক’রবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। শাস্ত্র বলেন,

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥”

—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ

— আত্মনিবেদন —

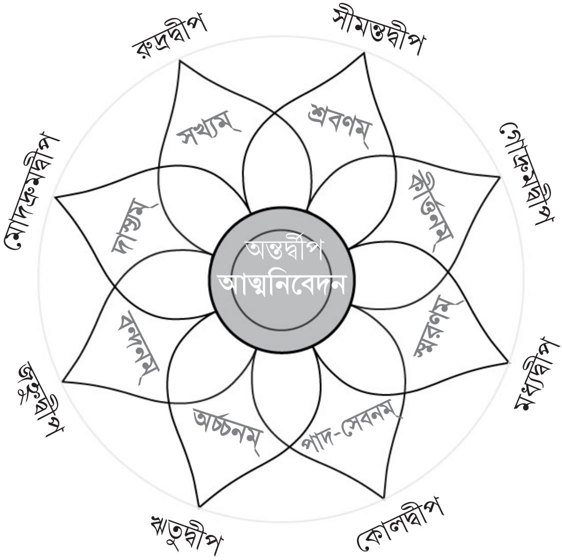
অন্তর্দ্বীপ
আত্মনিবেদন
সীমন্তদ্বীপ
শ্রবণম্
গোদ্রুমদ্বীপ
কীর্ত্তনম্
মধ্যদ্বীপ
স্মরণম্
কোলদ্বীপ
পাদ-সেবনম্
ঋতুদ্বীপ
অর্চ্চনম্
জহ্নুদ্বীপ
বন্দনম্
মোদদ্রুমদ্বীপ
দাস্যম্
রুদ্রদ্বীপ
সখ্যম্

শুদ্ধ ভকত- চরণ-রেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা পরম সিদ্ধি
প্রেমলতিকার মূল ॥
মাধব-তিথি ভক্তি জননী
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি'
পরম আদরে বরি ॥
গৌর আমার যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥
মৃদঙ্গবাদ্য, শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শুনি'
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥
যুগলমূর্ত্তি, দেখিয়া মোর,
পরম আনন্দ হয়।
প্রসাদ-সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ-জয় ॥
যে দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণসীধু দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ॥
তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ,
মাধবতোষণী জানি'।
গৌর-প্রিয় শাক সেবনে
জীবন সার্থক মানি ॥
ভকতিবিনোদ কৃষ্ণভজনে
অনুকূল পায় যাহা।
প্রতি দিবসে পরম সুখে
স্বীকার করয়ে তাহা ॥

শ্রীগঙ্গানগর

শ্রীগুরুপাদপদ্ম, ভক্তবৃন্দ, বৈষ্ণববৃন্দের অহৈতুকি কৃপায় আমরা প্রতি বছরের মত এই বছরেও বহু ভাগ্যের ফলে আবার এই পরম শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে সুযোগ পেয়েছি। আমাদের প্রথম দিনের পরিক্রমা হচ্ছে শ্রীঅন্তর্দ্বীপে। যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেছিলেন, তিনি প্রথম শ্রীঅন্তর্দ্বীপের প্রান্তে উপস্থিত শ্রীগঙ্গানগর দেখিয়ে দিলেন। আমরাও তাঁদের শ্রীকমলচরণে অনুসরণ করে, তাঁদের দিব্য আলোচনা স্মরণ করতে করতে এবং সমস্ত ধামবাসীগণের শ্রীপদরেণুর জন্য বারবার ভিক্ষা প্রার্থনা করে থেকে এই শ্রীঅন্তর্দ্বীপে প্রথম প্রবেশ করে আমাদের শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা শুরু করি। "গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে, সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে।"

যে শ্রীগঙ্গানগরে আমরা গঙ্গামায়ী পেরিয়ে এসেছি, সে নগর প্রাচীন কালে মহারাজ ভগীরথ স্থাপন করেছিলেন।

এক সময় গঙ্গাদেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ভগীরথ মহারাজ অনেক বছর ধরে কঠোর তপস্যা করতেন। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাদেবী তাঁর সামনে হাজির হয়ে বললেন, "মহারাজ, আমি তোমার তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট, বল তুমি কী বর আমার কাছে চাও?" ভগীরথ মহারাজ উত্তরে বললেন, "হে দেবী, যদি তুমি আমার সঙ্গে এই পৃথিবীতে নেমে আসবে, তাহলে আমার আত্মীয়-স্বজন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোক রেহাই পেতে পারবেন। তুমি না আসলে, আমার আর কোন উপায় নেই।" কিন্তু গঙ্গাদেবী রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "আমি যাব না! আমি এই পৃথিবীতে যদি আসব, তাহলে সমস্ত পাপিষ্ঠ লোকগুলো আমার জলের মধ্যে স্নান করবে আর মলিন হয়ে আমি নরকে যাব! আমার কী লাভ হবে?" ভগীরথ মহারাজ তাঁকে আশ্বাস দিলেন, "কেন রে, মা? যাঁরা নিষ্কাম সাধুগণ কামনা-বাসনা-বিহীন, তাঁদের হৃদয়ে স্বয়ং ভগবান্ সব সময় বিশ্রাম করেন—এমন

সাধুগণ যখন তোমার জলে স্নান করবে, তখন ভগবান্ সব পাপ তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। তুমি নিত্যকাল পবিত্র থাকবে।” শেষ পর্যন্ত দয়াময়ী গঙ্গাদেবী ভগীরথ মহারাজের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন।

শঙ্খ বাজিয়ে ভগীরথ মহারাজ এগিয়ে গেলেন আর করুণাময়ী গঙ্গাদেবী পিছনে তাঁকে অনুসরণ করলেন। যখন তাঁরা এই শ্রীনবদ্বীপধামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ গঙ্গাদেবী স্থির হয়ে থেমে গেলেন। কিছু ক্ষণ পর ভগীরথ মহারাজ লক্ষ্য করলেন, গঙ্গাদেবী পিছনে আর আসছেন না ; ভয় পেয়ে তিনি ওঁকে খুঁজে বের করবার জন্য ফিরে গেলেন। তিনি দেখলেন, গঙ্গা দেবী আর যেতে চাইছেন না। সর্বনাশ ! এবার কী হবে? কোন উপায় রইল না—ভগীরথ মহারাজ এই গঙ্গানগরে (মায়াপুরে) বসে আবার তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট হলে গঙ্গাদেবী আবার তাঁর কাছে এসে কথা বলতে লাগলেন। ভগীরথ মহারাজ প্রার্থনা করে বললেন, “হে মা, তুমি এগিয়ে না গেলে, আমার পিতৃলোক কখনও উদ্ধার পাবেন না। কৃপা কর, আমার সঙ্গে চল।” গঙ্গাদেবী বললেন, “শুন বাছা, ভগীরথ বীর। তুমি এখানে কিছু দিন ধরে থাক। আমরা এই মাঘমাসে শ্রীনবদ্বীপধামে এসেছি ! ফাল্গুনের শেষ হবে, আমি আবার তোমার সঙ্গে যাব। তুমি বুঝতে চেষ্টা কর—যাঁর শ্রীচরণ-জল আমি, তাঁর নিজের প্রিয় ধামে আমি এসেছি, সুতরাং আমি একটা লালিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হাওয়ার জন্য এখানে থাকতে চাই। ফাল্গুন পূর্ণিমায় আমার প্রভুর জন্মদিন, আমি সেই দিনে একটি ব্রত করব, তারপর তোমার সঙ্গে যাব। চিন্তা কর না।”

সেইভাবে ভগীরথ মহারাজ এই গঙ্গানগরে এক মাস ধরে বাস করেছিলেন। শাস্ত্রে বলা হয় : যে ফাল্গুন পূর্ণিমায় গঙ্গানগরে থাকেন, গঙ্গায় স্নান করেন, উপবাস করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভজন করেন, তিনি সংসার পার করে শ্রীগোলোক পৌঁছে যান এবং তাঁর সহস্র পূর্ব্বপুরুষগণও রেহাই পেয়ে তাঁর সঙ্গে শ্রীগোলোকে যান। সেটা হচ্ছে এই শ্রীগঙ্গানগরের মহিমা।

জয় শ্রীল গুরু মহারাজ কি জয়। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কি জয়।

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

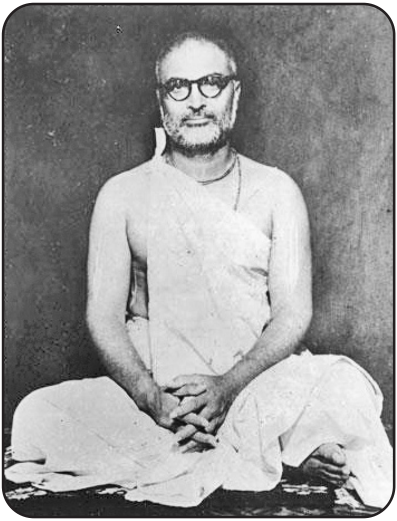

মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় পরিক্রমা করতে করতে আমরা আজকের দিনের প্রথম তীর্থ পৌঁছে গিয়েছি—পূজ্যপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ। শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ আমাদের মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের খুব প্রিয় গুরুভ্রাতা ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বে তাঁর নাম ছিল শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী। তাঁর সম্বন্ধে আমরা শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীমুখে কিছু শুনেছি।

শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ খুব কঠিন ও দৃঢ় বৈষ্ণব ছিলেন। আমরা শুনেছি যে, মঠে প্রসাদ নেওয়ার সময় যখন মন্দিরে ঘণ্টা বাজত, তখন সমস্ত ব্রহ্মচারীবৃন্দ প্রসাদ-ঘরে এসে হাজির হত। এটা দেখে শ্রীল মাধব মহারাজ ভাবলেন, “এটা কী? আমি যখন পাঠ করি তখন শুধু পাঁচ-ছয়জন ব্রহ্মচারী উপস্থিত হন, আর প্রসাদ নেওয়ার সময় বিশজন আসেন!” তখন কাউকে কিছু না বলে প্রসাদ-ঘরে এসে তিনি ব্যাসাসনে বসে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বের করে দিয়ে বললেন, “কিছু মনে করবেন না, আপনারা মুখ দিয়ে প্রসাদ নেন আর আমি পাঠ করছি,

আপনারা কান দিয়ে শুনুন।” সমস্ত শিষ্যগণ তখন লজ্জা পেলেন। সেইরকম ছিলেন শ্রীল মাধব মহারাজ।

আর একটা কথা আছে। এই ঘটনা শ্রীল মাধব মহারাজের সন্ন্যাস নেওয়ার আগে হয়েছিল। প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মথুরায় যেতে হল আর তার আগে তিনি শ্রীল মাধব মহারাজকে দিল্লি পাঠিয়ে দিলেন কিছু ঘর-টর ব্যবস্থা করবার জন্য। তখন শ্রীল মাধব মহারাজের জন্মাষ্টমী দিনে ট্রেনে মথুরায় যেতে হল। সাধারণভাবে জন্মাষ্টমী দিনে আমরা সারা দিন রাত পর্যন্ত উপবাস করি আর রাতে কিছু ‘অনুকল্প’ প্রসাদ (কিছু ফল, ছানা, আলু, প্রভৃতি) গ্রহণ করি। কিন্তু ওই দিন শ্রীল মাধব মহারাজকে দিল্লি যেতে হল, সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ ভাবলেন, “ওর খুব গুরুত্বপূর্ণ সেবা সেখানে আছে। যেন পরিশ্রম করে ক্লান্তি না হয়, ওকে ভালভাবে প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে।” তখন, যে একজন সেবকটি শ্রীল প্রভুপাদের জন্য রান্না করতেন, সেই সেবকটিকে শ্রীল প্রভুপাদ আদেশ দিলেন, “কাল হয়গ্রীব দিল্লি যাচ্ছে, এর জন্য কিছু প্রসাদ ব্যবস্থা করে দাও—অন্ন, ডাল, প্রভৃতি ওকে দিয়ে দাও।” সেবকটি অবাক হয়ে গেলেন, “বোধ হয় প্রভুপাদ ভুলে গেছেন যে, কাল ত জন্মাষ্টমী (উপবাস)। ওঁকে মনে করাতে হবে কি না?” তখন তিনি ইতস্তত করে বললেন, “প্রভুপাদ, কাল জন্মাষ্টমী...” শুনে প্রভুপাদ তক্ষণি উত্তরে বললেন, “আমি জানি ত!! আমাকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার নেই!” প্রভুপাদের গর্জন শুনে ব্রহ্মচারী ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন আর সব ঠিক মত ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু মাধব মহারাজের মন ছিল খুব কঠিন—প্রভুপাদের আদেশ শুনলেই তিনি ইতস্তত করলেন আর অন্ন গ্রহণ করলেন না। তিনি রান্নাঘরে গিয়ে সেবকটিকে বললেন, “যদি খেতে হয়, আমি সাবু, কিছু সবজি আর ছানা নেব, অন্ন-ডালের দরকার নেই।” শ্রীল প্রভুপাদের আর একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিল—প্রফেসর নিশিকান্ত সান্ন্যাল (ভক্তিসুধাকর প্রভু)। তাঁর মন ছিল অন্য রকম, তাঁর অত্যন্ত চরম আনুগত্য ছিল—যদি প্রভুপাদ তাঁকে জন্মাষ্টমী দিনে অন্ন গ্রহণ করতে বলে দিতেন, তখন তিনি বলতেন, “আমার অন্ন গ্রহণ করতে হবেই।” কিন্তু শ্রীল মাধব মহারাজ ভাবলেন, “না, না, ঐ সব দরকার নেই, আমার শক্তি যথেষ্ট আছে, আমি

কাজটা করব আর যদি প্রভুপাদের ইচ্ছা যে আমার এই উপবাস দিনে কিছু খেতে হয়, তখন আমি অনুকল্প প্রসাদ নেব।”

শ্রীল গুরুমহারাজ আর একটা কথা তাঁর সম্বন্ধে বললেন। একদিন শ্রীগৌড়ীয় মঠে উৎসব ছিল। সারা দিন উৎসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে শ্রীল মাধব মহারাজ (হয়গ্রীব প্রভু) হরিনাম করতে সময় পেলেন না বলে উৎসবের পর রাত দুপুর ছাদে গিয়ে হরিনাম করতে লাগলেন। হরিনাম করার রব শুনলে শ্রীল গুরু মহারাজ (শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ) ছাদে গেলেন আর মাধব মহারাজকে দেখে বললেন, “প্রভু, ঘুমিয়ে যান। কাল মঙ্গলারতিতে ভোর চারটা বাজে উঠতে হবে। কত মালা করেছেন?” মাধব মহারাজ বললেন, “৫ হয়েছে।” শ্রীল গুরু মহারাজ বললেন, “এটা যথেষ্ট। ঘুমিয়ে যান। বিশ্রাম করলে আপনি কালকে আরো বেশি সেবা করবার জন্য শক্তি পাবেন। নাম সংখ্যা পূর্ণ করতে চেষ্টা করলে আপনার কোন শক্তি থকবে না—কালকে কিছু করতে পারবেন না।”

সেটা হচ্ছে আমাদের লাইন (গতিপথ)। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন যে, আমাদের সেবা দরকার। সেবা-প্রবৃত্তি সব কিছু দিতে পারে। “এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ : গুরুভক্তি দ্বারা মানুষ অনায়াসে সকল সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ জয় করিতে সমর্থ হয়।” আমরা জড়ইন্দ্রিয়গুলো দমন করতে পারি না, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-সেবা দ্বারা সব অনায়াসে দমন করা হয়। সমস্ত শাস্ত্রে এটা বলা হয়। মহাপ্রভুর সময় সব নিয়মকানুন খুব কঠিন ছিল। মহাপ্রভু বললেন, “আমি শুধু লাখপতির ঘরে প্রসাদ গ্রহণ করব—যে প্রতিদিন এক লক্ষ হরিনাম করেন (৬৪ বার মালা করেন), আমি তার ঘরে এসে প্রসাদ গ্রহণ করব।” মহাপ্রভু এটা বললেন, কিন্তু ওই সময়ও সবাই এক লাখ হরিনাম করতেন না। পরে যখন শ্রীল স্বামী মহারাজ এসেছিলেন, তিনি বললেন, “১৬ বার মালা করতে হবে।” কিন্তু সবাই ১৬ বারও মালা করতেন না। হরিনাম করা উচিত কিন্তু সেবা দ্বারা হরিনাম করতে হবে।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

"অতএব শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুকর্ণাদি গ্রাহ্য নয় ; যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি-ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি লাভ করে।" সেবা করা দরকার। প্রথমত সেবা, আর সেবাটা আসল সেবা হতে হয় নতুবা সাধকের চেষ্টা অন্য দিকে যাবে। অহংকার যদি এসে যায়, তখন অহঙ্কারের চাপে আপনার নৌকা ডুবে যাবে। অহংকার ছেড়ে গুরু-বৈষ্ণবকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করলে চরম কল্যাণ বস্তু লাভ হবে।

ব্রহ্মচার্য্যের সময় হয়গ্রীব প্রভু মাঝে মাঝে শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের সঙ্গে প্রচারে যেতেন। তাঁরা এক সঙ্গে মাদ্রাসে যেতেন, গোদাবরী তীরে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ আবিষ্কার করলেন। শ্রীলমাধব মহারাজ শ্রীল শ্রীধর মহারাজের প্রতি খুব স্নেহ, ভালোবাসা করতেন—তিনি তাঁকে বড় ভাইয়ের মত মান্য করতেন। মাঝে মাঝে তিনি শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে আসতেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীল মাধব মহারাজ অনেক বার গুরু মহারাজকে বলতেন যে, শ্রীল গুরু মহারাজকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যের ভার গ্রহণ করতে হবে কিন্তু শ্রীল গুরু মহারাজ সেটা চাইলেন না। তিনি বললেন, "তাঁরা সবাই চাইলেন যে আমি আচার্য্য হব কিন্তু যদি আমি আচার্য্য হতাম, তখন মাধব মহারাজ, কেশব মহারাজ, যাযাবর মহারাজ, ইত্যাদি কখনও আচার্য্য হতে পারতেন না। যেহেতু আমি শিষ্য গ্রহণ করলাম না, সেহেতু তাঁরা শিষ্য গ্রহণ করতে লাগলেন। পরে মাধব মহারাজও বললেন যে, আমি রাজা নই, বরং আমি মন্ত্রীর মত। তিনি বললেন যে, আমি ভালো উপদেশ দিতে পারি, আমার পারদর্শিতা আছে, কিন্তু আমি রাজার কাজ করতে পারতাম না—আমি কাজ নিজের হাতে নিয়ে প্রোগ্রাম চালাতে পারতাম না ।" পরন্তু শ্রীল মাধব মহারাজ শ্রীল গুরু মহারাজের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন কিন্তু এক দিন তিনি গুরু মাহারাজের কাছে এসে তাঁর চরণে পড়ে বললেন, "মহারাজ, আমি মনে করলাম আপনার কাছে সন্ন্যাস ভিক্ষা করতে কিন্তু আমি মায়াপুর চৈতন্য মঠ ছেড়ে দিতে পারব না। আমি জানি আপনি সেখানে ফিরে

আসবেন না, সেই জন্য আমি আপনার কাছে সন্ন্যাস নিতে পারব না। কিন্তু আপনি কৃপা করুন, আমাকে সন্ন্যাস নাম নির্বাচন করে দেন।” তখন শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁকে নাম দিলেন ‘শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ’।

শ্রীল মাধব মহারাজ তাঁর শিষ্যগণের সম্মুখে নিজের আচার-আচরণে খুব দৃঢ় নিখুঁত গুরুর আদর্শ দেখাতেন কিন্তু শ্রীল গুরু মহারাজের কাছে এসে তিনি শিশু বা পুতুলের মত ব্যবহার করতেন—কোন বাধা নিষেধ রইল না, যদিও শিষ্যগণ তাঁর সঙ্গে আসতেন, তাঁদের সম্মুখে তাঁর কোন স্বাধীনতা থাকত না। তিনি নিচের তলায় শুয়ে থাকতেন, মাঝে মাঝে ভাজা অন্ন, পাকোড়া প্রভৃতি খেতেন আর শ্রীল গুরু মহারাজের প্রতি অবোধ ভাবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু বাহিরে যখন তিনি আলাদা থাকতেন, তিনি খুব কঠোর আচার্য্য আর সমস্ত নিয়মকানুন অনুসারে চলতেন যেন তাঁর শিষ্যগণ ভুল ধারণা করেন না।

তাছাড়া আমি শুনেছি যে, এক সময় শ্রীল মাধব মহারাজের একজন শিষ্য একজন লোককে ঘাড় ধরে শ্রীল মাধব মহারাজের কাছে নিয়ে এনে বললেন, “গুরুদেব, এইটা দেখুন । এই লোক আপনার বিরুদ্ধে লিফলেট বিতরণ করে যাচ্ছে!” শ্রীল মাধব মহারাজ বললেন, “ঠিক আছে। লোকটিকে ছেড়ে দাও। আমি কাগজটা দেখতে চাই।” কাগজটা দেখে শ্রীল মাধব মহারাজ বললেন, “এখানে যা লেখা আছে, সেটা কোন বড় ব্যাপার নয়। আমি এর চাইতে অনেক খারাপ! দেখ, তুমি দোকানে গিয়ে মিষ্টি নিয়ে এস।” শ্রীল মাধব মহারাজ ওই খারাপ লোকটিকে মিষ্টি খাওয়ালেন। সেটা হচ্ছে “প্রতিহিংসা ত্যাজি অন্যে করবি পালন”। আমাদের গুরুবর্গের কাছ থেকে এই সব শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পর্ব্ব-তালিকা অনুসারে আমরা প্রতিবছর শ্রীল মাধব মহারাজের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি স্মরণ করতে করতে এই বৈষ্ণব-ঠাকুরের কমল-চরণে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেখানে অবস্থান করুন না কেন আমাদের কৃপা দান করতে পারবেন।

জয় শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ কি জয়।

পরম করুণ পহুঁ দুই জন
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার- সার শিরোমণি
কেবল আনন্দ কন্দ ॥১॥

(কেবলই আনন্দ কন্দ)
(নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র কেবলই আনন্দ কন্দ)

ভজ ভজ ভাই চৈতন্য-নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি’।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি ॥২॥

(মুখে বল গৌরহরি)
(বিষয়-কথা পরিহরি’ মুখে বল গৌরহরি)
(গ্রাম্য-কথা পরিহরি’ মুখে বল গৌরহরি)

দেখ ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা।

(এমন দয়াল কে বা আছে)
(নিতাই গৌরেরমত এমন)
(মর খেয়েও নাম প্রেম যাচে)
(এমন দয়াল কে বা আছে)

পশুপাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে
শুনি’ যার গুণ-গাথা ॥৩॥

সংসার মজিয়া রহিলি পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম ভুঞ্জায় শমন
কহয়ে লোচন দাস ॥৪॥

শ্রীনন্দনাচার্য্যের ভবন

আপনাদের সবাইয়ের জানা উচিৎ যেখানে আমরা এসেছি আর কেন আমরা এখানে এসেছি। এটা হচ্ছে খবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটা হচ্ছে শ্রীনন্দনাচার্য্যের ভবন বা বাড়ী।

আপনারা জানেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মায়াপুরে আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু একচক্রা ধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন (একচক্রা গ্রামের নাম এখন হচ্ছে বীরচন্দ্রপুর)। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধা-কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন স্বয়ং বলরাম (আমরা কীর্ত্তনেও গাই 'বলরাম হৈল নিতাই')। আলাদা স্বরূপ অবলম্বন করেও কৃষ্ণ ও বলরাম বা গৌর ও নিত্যানন্দ 'ত্বুই দেহে একই রূপ'।

যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ১২ বছরের বলক ছিলেন, তখন তিনি এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে একচক্রা ধাম ছেড়ে দিয়ে সব ভারতবর্ষ ঘুরতে লাগলেন। শেষে, বৃন্দাবনে পৌঁছে গিয়ে তিনি সব সময় কৃষ্ণপ্রেমে বিভাবিত হয়ে কৃষ্ণকে কোঁজা করতে করতে এক দিন দৈব বাণী পেয়েছিলেন যে, “কৃষ্ণ এখন গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন আর নদিয়ায় বাস করছেন, তথায় গিয়ে তুমি কৃষ্ণকে পাবে।” শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তক্ষুনি বৃন্দাবন ছেড়ে দিয়ে নবদ্বীপে গিয়েছিলেন—পাগলের মত হেঁটে হেঁটে কোন দিন কিছু দুধ পেলেন, কোন দিন উপবাস করতেন। সেই ভাবে তিনি মায়াপুর ধামে প্রবেশ করলেন। কোথায় তিনি প্রথম এসেছিলেন ? এখানে, শ্রীনন্দনাচার্যের ভবন।

শ্রীনন্দনাচার্য্য প্রভু এক মহাভাগবত ভক্ত ছিলেন যে, নবদ্বীপে তাঁর সহধর্মিনী শ্রীসুদেবীমাতার সঙ্গে গঙ্গাতটে বসবাস করতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সূর্যসম তেজ দেখে উনি তাঁকে চিনতে না পেরেও ভক্তিভরে তাঁকে পূজাদি করতেন এবং বিনীতভাবে তাঁকে গৃহে থাকতে অনুরোধ করলেন। তাই নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীনন্দনাচার্য্যের বাড়িতে কয়েক দিন কাটিয়েছিলেন।

এদিকে মহাপ্রভু টের পেলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু এসে গিয়েছেন । সোজা কথা ভক্তগণকে বলতে না পেরে তাঁকে কিছু অজুহাত দিতে হল। প্রথম উনি ভক্তগণকে বললেন, “দিন দুই পরে মায়াপুরে একজন মহাপুরুষ আসবেন।” ভক্তগণ কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে কিছু উত্তর বরলেন না। পরে মহাপ্রভু আবার বললেন, “আমি আজ রাত একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি যে, এক তালধ্বজ রথ আমার বাড়ির সামনে এসে থামলো। সেখান থেকে একজন মহাপুরুষ নেমে এসে বারবার বললেন, ‘নিমাঞি পণ্ডিতের বাড়ি কোথায় ?’ তিনি নিশ্চয়ই মায়াপুরে আছেন। তোমরা যাও, ওঁকে খুঁজে বের করে আনো !”

যেরকম মায়াপুরের অবস্থা আপনারা আজ দেখতে পাচ্ছেন, সেরকম তা ওই সময় ছিল না—অনেক বাড়ি, বড় মঠ-মন্দির ছিল না, কিছু বিশেষ ভাবে ছিল না, মায়াপুর ছিল এক ছোট গ্রাম যেখানে বোধ

হয় শুধু দশ-বিশ বাড়ি ছিল। পরন্তু যোগপীঠ থেকে নন্দনাচর্য্যের বাড়ি পর্যন্ত অনেক বাড়িও ছিল না—কিন্তু ভক্তগণ নিত্যানন্দ প্রভুকে কোথাও খুঁজে পেলেন না এবং মহাপ্রভুর কাছে ফিরে এসে বললেন যে, কেউ আসেন নি। তখন মহাপ্রভু বললেন, "তোমরা ওঁকে খুঁজে পেলে না ? তাই আমি নিজেই যাব !"

সেরকম ছিল গৌর-নিতাইয়ের লীলা—শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু ভাবলেন, "আমার জন্য, আমাকে নিয়ে আনতে আমার প্রভুকে নিজে আসতে হয়।" অন্যদিকে, নিত্যানন্দ প্রভু এত গূঢ়, এত গুহ্য—তাঁকে কি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় ? সবাই কি নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পেতে পারেন ? সবাই কি নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পেতে পারেন ? না। তাঁকে খুঁজে বের করতে এত সহজ নয়।

তাই মহাপ্রভু সরাসরি নন্দনাচার্য্য ভবনে এসে হাজির হলেন। কৌতূহলী হয়ে ভক্তগণও ওঁর সঙ্গে এসেছিলেন। যখন মহাপ্রভু নন্দনাচার্য্যের ভবনে প্রবেশ করলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু বারান্দায় বসে ছিলেন। তাঁর প্রাণেশ্বর গৌরহরিকে দেখে নিত্যানন্দ প্রভু ওঁর দিকে গভীরভাবে তাকালেন আর ওঁর প্রতি প্রেমে বিভোর হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সেই ভাবে ওঁদের মিলন হয়েছিল।

তখন, মহাপ্রভুও প্রেমে বিভোর হয়ে নিত্যানন্দ প্রভুকে কোলে তুলে নিলেন এবং ওঁকে আলিঙ্গন করলেন। কোলাকুলি করে উভয় প্রেমে বিভাবিত হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। সবাই ভক্তগণ—হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য, ইত্যাদি—সেই রকম মিলন দেখে অবাক হয়ে পড়ে মহানন্দে কীর্ত্তন শুরু করলেন।

তারপর মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে চলে গেলেন । সেখানেই নিত্যানন্দ প্রভু বেশির ভাগে সময় শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁর সহধর্মিণী মালিনী দেবীর পুত্ররূপে থাকতেন।

সেইজন্য, বৈষ্ণবের আনুগত্যে থাকলে সব দেখা যায়—নইলে কিছু না করলে, কিছু না শুনলে, কিছু দেখা যাবে না, কিছু ফল হবে না।

এই মঠটা অত্যান্ত পূজনীয় মহাবৈষ্ণব এবং আমাদের পরম গুরু মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গুরুভ্রাতা—শ্রীল ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ—প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপনাদের জানা উচিত, শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ কে ছিলেন, কী কী সম্বন্ধগুলো তাঁর সঙ্গে আমাদের আছে আর এই সম্বন্ধগুলো মনে রাখতে হবে কারণ সম্বন্ধজ্ঞান না হলে, অভিধেয় ও প্রয়োজন আসবে না।

শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন (তাঁর ব্রহ্মচারী নাম ছিল শ্রীঅপ্রাকৃত প্রভু)। যখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন, তখন শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ (অপ্রাকৃত প্রভু) খুব বরিষ্ঠ প্রচারক ব্রহ্মচারী হয়েও ব্রহ্মচারী আশ্রম পরিত্যাগ করে নিজের বাড়িতে খুব দুঃখ কষ্টে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর জন্মস্থান পাত্রসায়ের গ্রামে—আমাদের যে মঠ বেতুড়ে আছে, সেটা তার পাশে। কিছু দিন পর শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ সেখানে এসে বললেন, “প্রভু, আপনি সংসার করছেন, যা হোক। কিন্তু আপনি এখানে থাকলে কে মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের কথা এই পৃথিবীতে প্রচার করবেন? আপনার কত সেবা-প্রচার অধিকার আছে, আপনাকে ফিরে যেতে হবেই।” তখন শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভু বললেন, “যদি আপনি আমাকে সন্ন্যাস দেবেন, তবে আমি আবার সব ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসব।” শ্রীল শ্রীধর মহারাজ তাঁকে সন্ন্যাস ও নাম ‘ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ’ দিয়েছিলেন। তিনি ওই সময় থেকে প্রচার-সেবায় ফিরে এসেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করতে শুরু করলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্ট যে কৃষ্ণকথা সব পৃথিবীতে বিতরণ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করে লন্ডনেও গিয়েছিলেন, সেখানেও তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করে প্রচার করতে করতে এক ছোট কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মন্দির কলকাতায়ও আছে, জলপাইগুড়িতেও আছে। তাঁর জীবনে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ বিভিন্ন স্থানে ২৪টী কেন্দ্র স্থাপিত করলেন, তার মধ্যে তিনি বৃন্দাবনে ইমলিতলায় মঠও স্থাপন করেছিলেন যেখানে কৃষ্ণ বসে ঠিক করেছিলেন যে, তিনি রাধারাণীর ভাব ও কান্তি চুরি করে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রূপে অবতীর্ণ হবেন। শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ অমাদের শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠেও সব সময় বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতেন, বিশেষ ভাবে পরিক্রমার সময় ও ভিক্ষা নিয়ে। তারপর, অবশেষে তিনি এই মঠ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যেখানে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুর প্রথম মিলন হয়েছিল। শ্রীল শ্রীধর মহারাজ তখন তাঁর সঙ্গে এই জমি দেখতে গিয়েছিলেন—তাঁকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন কি রকম মন্দির হবে, কি রকম নাট মন্দির হবে, ইত্যাদি।

শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের সম্বন্ধে আরো অনেক কথা আছে। তিনি ১৯৪০ সালে সন্ন্যাস নেওয়ার পরে সব সময় শ্রীল গুরু মহারাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। আমাদের শ্রীল গুরুদেব—ওঁ বিষ্ণুপদ জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ—বললেন:

“এক সময় সভাপতির সিংহাসন গ্রহণ করে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ এক বিশিষ্ট পাঠ দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে ‘সিংহ অবলোকন’ শব্দ প্রয়োগ করলেন। তিনি বললেন, ‘আমরা সব পৃথিবীতে প্রচার করে যাচ্ছি কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা পিছনে ফিরে তাকাই যে, শ্রীল শ্রীধর মহারাজ আমাদের প্রচারে খুশী হন কি না।’ ‘সিংহ অবলোকন’ মানে যখন সিংহ যাচ্ছে, তখন কিছু এগিয়ে গেলে ও পিছনে ফিরে তাকায়, দেখছে, পরিবেশ নিরাপদ কি না, সব স্থির কি

না। সেইভাবে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজও বলে দিয়েছেন যে, সমস্ত প্রচারকগণ বারবার পিছনে ফিরে তাকান, দেখছেন, শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁদের প্রচার অনুমোদন করেন কি না। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁর উপর নির্ভর করতেন। গৌড়ীয় মিশনে অত্যন্ত নিরুপম অবস্থায় থেকেও তিনি আমাদের শ্রীল গুরু মহারাজের প্রতি অনেক স্নেহ ও ভালোবাসা করতেন । আমি জীবনে কখনও দেখি নি যে, শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল গুরু মহারাজের বিরুদ্ধে যেতেন—যে শ্রীল গুরু মহারাজ বলে দিতেন, তাই অনুসারে, প্রায় অন্ধভাবে, তিনি চলতেন। কিন্তু তিনি অন্ধ ছিলেন না—তাঁর শ্রীল গুরু মহারাজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।”

শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের গুরুভাই ও সন্ন্যাস গুরু ছিলেন তবু কি রকম উনি গুরু মহারাজকে সম্মান করতেন? প্রতি বছর শ্রীল গোস্বামী মহারাজের শিষ্যগণ ভালো করে ওঁদের জন্মদিনে ব্যাসপূজা মহোৎসব আয়োজন করতেন আর সেই দিন শ্রীল গোস্বামী মহারাজ নিজে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে গিয়ে শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে নিমন্ত্রণ করতেন। শ্রীল শ্রীধর মহারাজ সাধারণভাবে কোন মঠে যেতেন না, কিন্তু শ্রীল গোস্বামী মহারাজের মঠে (এই শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবনে) তিনি আসতেন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ শুধু নিমন্ত্রণ দিতেন না—ওঁর জন্ম দিনে উনি শিষ্যগণের কাছ থেকে যত দক্ষিণা-প্রণামী-উপহারই পেতেন, সব কিছু তিনি তাঁর শিক্ষা-গুরু এবং সন্ন্যাস-গুরু শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজকে দিয়ে দিতেন।

অসুস্থাবস্থা দেখায়ে শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ একবার তাঁর জন্ম দিনে আসতে পারলেন না। তখন শ্রীল গোস্বামী মহারাজ বললেন, “প্রতি বছর শ্রীল শ্রীধর মহারাজ আসেন এবং আমি আর এক বছর আয়ু পাই কিন্তু এই বছর তিনি আসতে পারলেন না বলে আমি আর আগামী বছর বাঁচব না।” সেটা বলে আর কয়েক মাস পর (১৩৭১ বঙ্গাব্দ ; ইং ২৬ মে ১৯৬৪) তিনি নিত্য লীলায় প্রবেশ করে চলে গেলেন।

তারপর এখানে আচার্য্য ছিলেন শ্রীল ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন গোস্বামী মহারাজ। আমাদের শ্রীল গুরুদেবকে তিনি খুব ভালবাসতেন। ১৯৯৫ সালে যখন আমাদের মঠে শ্রীল শ্রীধর মহারাজের ১০০ বছর উৎসব ছিল, শ্রীল গুরুদেব আমাকে আদেশ দিলেন, "শ্রীল ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ আসতে চেয়েছেন, তুমি ওঁদেরকে নিয়ে এস।" আমি অ্যাম্বাসেডর গাড়িতে (যে এখনও নবদ্বীপ মঠে আছে) ড্রাইভারকে নিয়ে এখানে এসেছিলাম—শ্রীল সন্ত গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল অকিঞ্চন মহারাজকে নিয়েছিলাম।

মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রণাম মন্ত্র রচনা করেছিলেন :

দিব্যং দীর্ঘভুজারবিন্দনয়নং সারস্বতং সুন্দরং
তেজোদ্দীপ্তবপুবু ধৈকসুহৃদং কর্ব্বুরগর্ব্বাপহম্।
পাষণ্ডাসুর-চণ্ড-দণ্ড দলনং সম্ভাদ্রি-দম্ভোলিকং
বন্দে বন্দ্যকুলাব্জভাস্করবিভুং সারঙ্গগোস্বামিনম্॥

*** *** ***

এই মঠে এসে আমাদের আর এক পরম বৈষ্ণবের কথা বলা উচিত যে শ্রীল ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ আমাদের মঠের শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা প্রতি বছর পরিচালন করতেন, তিনিও অবশেষে এখানে বাস করতেন। তিনি শ্রীল শ্রীধর মহারাজের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন এবং শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রধান শিষ্য ছিলেন।

আমাদের শ্রীলগুরুদেব তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন : "শ্রীমদ্ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ আমার খুব পুরাতন বন্ধু এবং শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের খুব অন্তরঙ্গ সেবক। উনি আমাদের শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের অত্যন্ত স্নেহশীল শিষ্য। শৈশব কাল থেকে উনি আমারও প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, উনি আমাকে ভালভাবে জানেন। যখন আমি ওঁকে বললাম, 'আপনি আমাদের মঠে যোগদান না করলে আমার আর কোন উপায় নেই,' উনি বললেন, 'এটা আমার কর্তব্য, আমার আসতে হবেই।' সেইভাবে, আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন কি রকম আমাদের মঠের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক।

"শ্রীমদ্ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ আসলে আমাদের শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার নেতা বা সেনাপতি। উনি নিজের সেবা-প্রবৃত্তি দ্বারা আমাদেরকে অনেক উৎসাহ প্রদান করছেন এবং সব সময় শ্রীল গুরু মহারাজের কৃপা স্মরণ করাছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের শিষ্য হয়েও উনি আমাদের প্রিয়তম শ্রীল গুরু মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। উনি জানেন কি রকম ওঁর গুরুদেবের সঙ্গে ভাব ছিল—উনি সব পৃথিবীতে তাঁর কৃপা বিতরণ করছেন ; এবং উনি জানেন কত স্নেহ, কত ভালোবাসা ও সম্মান ওঁর গুরুদেবের শ্রীল গুরু মহারাজের প্রতি ছিল। তাই তিনি শ্রীল গুরু মহারাজের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

"প্রতি বছর উনি আমাদের মঠ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় শ্রীল গুরু মহারাজের সেবার জন্য যোগদান করেন, অন্য সময়ও আসেন। উনি শ্রীল গুরু মহারাজের সেবার জন্য আমাকে অনেক প্রেরণা দিচ্ছেন এবং উনি আমার খুব প্রিয় বন্ধু । আমাদের দেশে লোক সব সময় বলে, 'ও আমার বন্ধু', 'ও আমার বন্ধু', কিন্তু আসলে বন্ধুর অর্থটা কী ?

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যে প্রেমভক্তিদাতা ॥
অনেক জন্মে পিতা-মাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায় ॥

“যাঁরা আমাদের গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবার প্রতি প্রকৃত প্রেরণা দিচ্ছেন, তাঁরা হচ্ছেন আমাদের প্রকৃত বন্ধুগণ। সেইভাবে আমি বলতে পারি যে, শ্রীমদ্ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ আমার প্রকৃত বন্ধু—উনি আমাকে সব সময় শ্রীল গুরু মহারাজের সেবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। উনি খুব বিনীত এবং সব সময় শ্রীল গুরু মহারাজকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে থাকেন। আমি ওঁর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করে চিরকাল ওঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যে উনি আমার প্রতি কৃপা করবেন যেন আমি আমার প্রভুকে—শ্রীল গুরু মহারাজকে—সেবা করতে পারব। আমি ওঁর চরণে প্রার্থনা ভিক্ষা করছি যে, উনি কৃপা করে সব সময়, আমার মৃত্যু পর্যন্ত, আমার কাছে থাকবেন।”

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই ইচ্ছা শ্রীপাদ গিরি মহারাজ সম্পূর্ণ করলেন—তিনি শ্রীল গুরুদেবের চলে যাওয়া লীলার সময়ও আমাদের নবদ্বীপ মঠে এসেছিলেন আর ৬ বছর পরে (২০১৬ সালে) আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজের নিত্যলীলায় চলে গিয়েছেন।

* * *   * * *   * * *

এই পরম পূজনীয় তীর্থে এসে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করছি—যেখানে এই পরম বৈষ্ণবগণ এখন থাকুন না কেন, সেখান থেকে যেন তাঁরা কৃপা করে আমাদের মত পতিত অধম জীবের দিকে তাকাবেন এবং কিছু সেবাধিকার প্রদান করে আমাদের গুরুপাদপদ্মের সেবায় যেকোন তুচ্ছ ভাবে সব সময় নিযুক্ত করবেন।

জয় শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবন কি জয়। শ্রীনন্দনাচার্য্য প্রভু কি জয়।
শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভু কি জয়।
ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ কি জয়।
ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন গোস্বামী মহারাজ কি জয়।
পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ কি জয়।

(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি ।
দিয়া পদছায়া শোধহে আমারে
তোমার চরণ ধরি ॥
ছয় বেগ দমি’ ছয় দোষ শোধি
ছয় গুণ দেহ দাসে ।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে ॥*
একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম সংকীর্ত্তনে ।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে ॥
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে ।
আমি ত কাঙ্গাল ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি
ধাই তব পাছে পাছে ॥

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ প্রভুপাদের মিশন

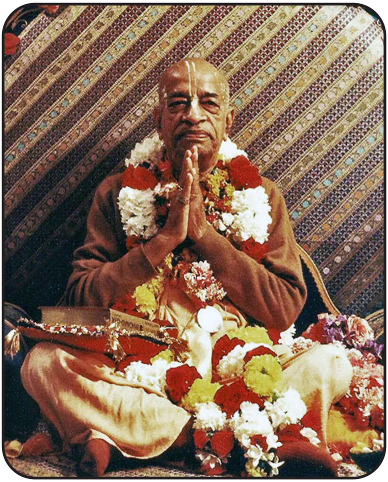

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীনন্দনাচার্য্যের ভবন থেকে আমরা এখন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ISKCON-এর) মূলমঠ ও শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ প্রভুপাদের পুষ্প-সমাধি-মন্দিরে এসেছি।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ প্রভুপাদ পশ্চিম দেশে একটা চ্যানেল করেছিলেন যার দ্বারা আমরা এখন দেখতে পাই, প্রচুর ভক্তগণ কৃষ্ণানুশীলন করবার জন্য আসছেন। তাঁর কৃপার বিনা আমরা কখনও ভাবতেও পারতাম না যে, এটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক ভক্তগণের সঙ্গ পেয়ে আমরা বড় আনন্দ পাই।

সবাই শুনেছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন :

পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণকথামৃত ও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণ করবার জন্য ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অনেক চেষ্টা করতেন, অনেক বার শিষ্যগণকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতেন কিন্তু তাঁরা বিশেষ ভাবে সফল ছিলেন না। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের একজন শিষ্য ছিলেন যাঁকে তিনি বিশেষ কৃপা প্রদান

করেছিলেন—সেই মহাপুরুষ ও পরম বৈষ্ণব হচ্ছেন শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ প্রভুপাদ। শ্রীল স্বামী মহারাজ সব পৃথিবীতে প্রচার করতে করতে সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলো কৃষ্ণকথার দ্বারা জয় করেছিলেন।

শ্রীল স্বামী মহারাজ ও আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল গুরু মহারাজের (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের) প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল এলাহাবাদে যখন শ্রীল গুরু মহারাজ সেখানে প্রচার করতে গিয়েছিলেন। উভয় তখন সন্ন্যাসী ছিলেন না—শ্রীল গুরু মহারাজ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীল স্বামী মহারাজ গৃহস্থ ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক উঠেছিল।

যখন প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর নিত্যলীলা প্রবেশ করলেন এবং কিছু পরে আমাদের শ্রীল গুরু মহারাজ নবদ্বীপ মঠ স্থাপন করেছিলেন, তখন শ্রীল স্বামী মহারাজ শ্রীল গুরু মহারাজকে তাঁর কলকাতায় বাড়িতে (৭-৮ সীতাকান্ত ব্যানার্জি লেনে) থাকতে নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে শ্রীল গুরু মহারাজ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের সঙ্গে সেখানে ৮-১০ বছর ধরে থাকতেন এবং কৃষ্ণকথা প্রচারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রীল স্বামী মহারাজ প্রভুপাদের সঙ্গে যোগদান করতেন।

শ্রীল স্বামী মহারাজ প্রভুপাদ সব সময় প্রচার করবার জন্য খুব উৎসাহিত ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিয়ে প্রচারে যেতেন—তিনি শ্রীল গুরুদেবকে (ওই সময় শ্রীল স্বামী মহারাজ গৃহস্থ আর শ্রীল গুরুদেব ব্রহ্মচারী ছিলেন) বললেন, “গৌরেন্দু, তুমি লাল কাপড় পর বলে ব্যাসাসনে বসে ভাগবতম্ পড়বে আর আমি নিচে তলায় বসে ব্যাখ্যা করব।” শ্রীল স্বামী মহারাজ শ্রীল শ্রীধর মহারাজকেও প্রচারে নিয়ে যেতেন—যেকোন ভাবে, যেকোন অনুষ্ঠান ছিল, তিনি সব সময় প্রচার করতে চাইতেন। গৃহস্থ হয়েও তিনি দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রচার করতে চেষ্টা করতেন।

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে শুনেছিলাম যে, যখন তিনি কলকাতায় থাকতেন, তখন তিনি মাঝে মাঝে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও প্রচারে যেতেন। একবার একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন তোমরা কালিমার বদলে কৃষ্ণকে ভজন কর?" গুরুদেব তখন নতুন ব্রহ্মচারী হয়ে কিছু বললেন নি কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে তিনি শ্রীল স্বামী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীল স্বামী মহারাজ হাসিমুখে বললেন,

"গৌরেন্দু, তুমি কি ওকে কিছু উত্তরে বলতে পারলে না? কেন তুমি ওই লোককে বল নি যে, মাকালির পূজা করলে তোমার কী লাভ হবে? কালিমার পূজা করলে তোমার খাবার-টাবার কী হবে, তোমার বন্ধুবান্ধব কে হবে? তুমি মাকালির মুণ্ডমালা দেখেছ? এই মুণ্ডমালার মধ্যে কি একটিও বৈষ্ণব-তিলক আছে? না, সব মুণ্ডটায় অসুরের তিলক ! আর মাকালি কি করে থাকে? উলঙ্গ অবস্থায় থেকে তোমার মাকালি জিহ্বা বেরিয়ে দিয়ে তোমাকে আকর্ষণ করে আর তুমি ওর সন্তান হলেও ওর কাছে ছুটে গিয়ে ভোগ করতে যাচ্ছ—যখন তুমি ওর কাছে এসে যাও, তখন কালি তোমার চুল ধরে মাথা কেটে দিয়ে নিজের গলায় পড়ে বা শিয়াল ও ভূতগুলোকে খেতে দেয় ! ও চারদিকে সব সময় ছুটে যায় আর ওকে থামার জন্য ওর স্বামী (শিবজী মহারাজ) ওর চরণে শুয়ে পড়ে ! সেটা হচ্ছে তোমার মা ! কিন্তু তুমি যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করবে, তখন অনেক ভালো জিনিস পাবে—যমুনা পুলিন, সুন্দর বন ও কুঞ্জগুলো, সুগন্ধি ফুল, সুস্বাদু ফুল, মিষ্টিগুলো, রস, ইত্যাদি। সেখানে চিন্ময়ধাম, চিন্ময় বৈশিষ্ট্য ! তুমি সেখানে গিয়ে ছানা, লাড্ডু, লুচি, সব ভালো জিনিস পাবে এবং কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করবে, নাচতে গাইতে রসলীলা করবে। আর যদি মাকালির পূজা করবে, তখন তুমি শ্মশান ঘাটে (যেখানে লাশগুলো পোড়া হয়) গিয়ে অনেক শিয়াল, দক্ষিণী, ভূত-পেত্নী দেখা যাবে— সেই রূপ পেয়ে তুমিও অসুরের রক্ত ও মদ পান করে নাচবে ! যা ইচ্ছা তাই কর।"

সেইরকম ছিল শ্রীল স্বামী মহারাজের প্রচার— "আমি আপনাদের একটা বিকল্প দিই। এদিকে গিয়ে এটা পাওয়া যায়, অন্য দিকে গিয়ে

ওটা পাওয়া যায়। যদি আপনারা রক্ত ও মদ, ভূত-পেত্নী পছন্দ করেন, তাহলে এগিয়ে যান—কালি পূজা করুন।”

যখন শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল স্বামী মহারাজের বাড়িতে থাকতেন, তখন প্রতি দিন তাঁদের মধ্যে অনেক কৃষ্ণকথা, হরিকথা হত—অনেক বছর পর তাঁদের উত্তেজিত আলাপ দেখে এবং ভাষা বুঝতে না পেরে একজন বিদেশী ভক্ত শ্রীল স্বামী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভুপাদ, আপনাদের কী কথা হয়েছিল?” উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ শুধু বললেন, “যদি আমি তোমাকে বলব, তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়বে!” সেইরকম ছিল শ্রীল স্বামী মহারাজ ও শ্রীল গুরু মহারাজের সম্পর্ক।

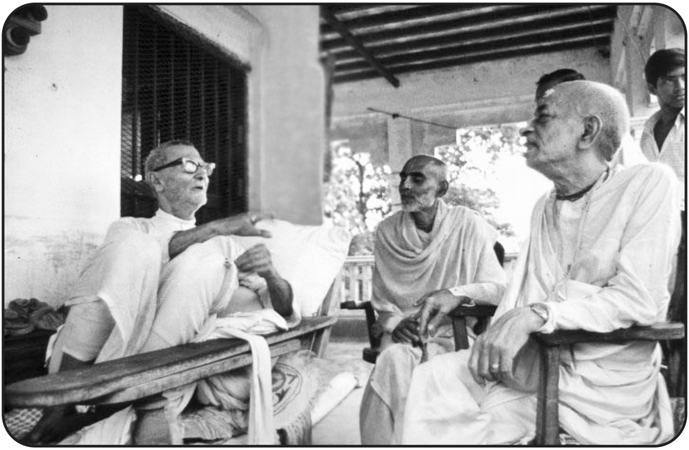

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ইচ্ছা স্পষ্ট ছিল—তিনি চাইছিলেন যে, কৃষ্ণকথা, মহাপ্রভুর বাণী ও ভবিষ্যদ্বাণী সব পৃথিবীতে দ্বারে দ্বারে বিস্তৃত হবে। যখন শ্রীল স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের কাছে প্রথম এলেন, তখন শ্রীল স্বামী মহারাজকে দেখে শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, “আপনার যোগ্যতাটা আছে, আপনি মহাপ্রভুর বাণী ইংরেজী লোককে প্রচার করতে পারেন—আপনি পশ্চিম দেশে প্রচার করতে পারেন।” এই কথা শ্রীল স্বামী মহারাজ সব সময় মনে

রাখতেন এবং প্রচারের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণ করবার জন্য তাঁর প্রেরণা এত তীব্র ছিল যে তিনি সংসার একদম ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে স্থির করলেন।

সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য শ্রীল স্বামী মহারাজ প্রথম শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের কাছে এলেন কিন্তু শ্রীল গুরু মহারাজ বললেন, "প্রভু, আপনার পরিবারের সাথে আমার কিছু সম্পর্ক আছে—যদি আমি আপনাকে সন্ন্যাস দেব, তাঁরা খুব ঘৃণা করে বলবেন যে, আমি তাঁদের বাড়িতে এত কাল ধরে আরামভাবে থাকলাম আর এখন তাঁর স্বামীকে কেড়ে নিচ্ছি। তাঁরা সবাই আমাকে দোষ দেবেন। এটা ভালো দেখতে নয়, আপনারও অকল্যাণ হবে। পরন্তু আমরা দুজনই বন্ধু—যদি আপনি আমার কাছে সন্ন্যাস নেবেন, তাহলে আমি কি করে আপনাকে শিষ্যের মত মনে করব? আপনিও আমাকে সন্ন্যাস গুরু রূপে সম্মান করতে পারবেন না। আপনি কাজ করুন। বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানে ৬ মাস বা এক বছর থাকবেন, তারপর সন্ন্যাস নিয়ে আপনি চলে যেতে পারেন—তখন কেউ আমাকে দোষ দেবেন না।" কিন্তু শ্রীল স্বামী মহারাজ রাজি হলেন না, তিনি বললেন, "না, মহারাজ, আমি এত কাল ধরে অপেক্ষা করতে পারি না—এখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করে বিদেশে চলে যেতে চাই।" তখন শ্রীল গুরু মহারাজ বললেন, "আপনি শ্রীপদ কেশব মহারাজের কাছে যান, আমি আপনার সন্ন্যাস-নাম বলে দেব আর মন্ত্রটি আমি ওঁকে দিয়ে দিয়েছি, তাই আপনি তাঁর কাছে সন্ন্যাস নিতে পারেন। এটাই ভালো হবে—তখন আপনি আমার সঙ্গে আগের মত সম্পর্ক রাখতে পারবেন।" শ্রীল স্বামী মহারাজ তাই করেছিলেন।

এরপর শ্রীল স্বামী মহারাজ বৃন্দাবনে গিয়ে রাধাদামোদরের মঠে থেকে শ্রীমদ্ভাগবতম্ অনুবাদ করতে লাগলেন। কিছু দিন পরে তাঁর প্রেরণা হয়েছিল যে, তাঁকে বিদেশে যেতে হবে। চলে যাওয়ার আগে তিনি শ্রীল শ্রীধর মহারাজের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে বললেন,

“মহারাজ, আমাকে কৃপা করুন, আমি পশ্চিম দেশে প্রচারে যাচ্ছি। কৃপা করে আমাকে আশীর্বাদ দেন যেন আমি সেখানে প্রচার করতে পারি।” এরপর ১৯৬৫ সালে, ৬৯ বছর বয়স(!) হয়েও শ্রীল স্বামী মহারাজ টাকা-পয়সা বিনা, প্রায় শূন্যহস্তে আমেরিকায় যাত্রা করলেন। তাঁর কাছে শুধু কিছু কাপড় এবং এক ট্রাঙ্ক গ্রন্থ ছিল। সব বিপদ ও কষ্ট সহ্য করে তিনি সেখানে প্রচার করতে শুরু করলেন—আমরা শুনেছিলাম যে, তিনি একাই পার্কে গিয়ে গাছের তলায় বসে করতাল বাজিয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গাইতেন এবং সব হিপি তাঁকে ঘিরে নাচতেন। আস্তে আস্তে কিছু লোক তাঁকে লক্ষ্য করে আসতে লাগলেন এবং তাঁর কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে লাগলেন। সেইভাবে, অনেক কষ্ট করে, অনেক পরিশ্রম করে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে সম্পূর্ণ শরণাপন্ন হয়ে শ্রীল স্বামী মহারাজ বিদেশের মন জয় করেছিলেন এবং ওই মাটিতে ভক্তিলতা-বীজ লাগিয়ে দিলেন। কিরকম শ্রীল স্বামী মহারাজের সেখানে গিয়ে কষ্ট সহ্য করতে হল এবং কিরকম শ্রীল স্বামী মহারাজ পরমহংসের চিত্তবৃত্তি সেখানে প্রকাশিত হল শুনে আমাদের গুরুপাদপদ্ম বললেন, “শ্রীল স্বামী মহারাজের শ্রীচরণে আমি মাথা ভেঙ্গে দিতে চাই !”

একবার আমেরিকায় থেকে শ্রীল স্বামী মহারাজ অনেক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছু ভয় পেয়ে তিনি শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে চিঠি পাঠিয়ে বললেন, “মহারাজ, আমি বৃন্দাবন ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত দূরে আছি। এখন খুব অসুস্থ হয়ে মনে করি, হয়তো আমি এই সময় বাঁচব না। আমি এখন কি করব? আমি কি দেশে ফিরে যাব না এখানে থাকব? আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।” উত্তরে শ্রীল গুরু মহারাজ লিখেছেন যে, “মহারাজ, আপনি সাধারণ মানুষ নন, আপনি পরম বৈষ্ণব। আপনি পশ্চিম দেশে প্রচার করছেন, সেটা আপনার সৌভাগ্য। যে অনেক বৈষ্ণবগণ আগে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু করতে পারেন নি, আপনার দ্বারা সেটা সফল হল ! তাই, আপনি যেখানে থাকেন, সেখানেই বৃন্দাবন। কোন চিন্তা করবেন না। পরন্তু, আপনি হরিকথা বিতরণ করতে করতে পশ্চিম দেশকে বৃন্দাবনে পরিণত

করছেন !” এই কথা শুনে শ্রীল স্বামী মহারাজ শান্তি পেলেন আর ওই সময় ফিরে এলেন না।

কয়েক বছর পর যখন শ্রীল স্বামী মহারাজ তাঁর বিদেশী শিষ্যগণের সঙ্গে দেশে ফিরে আসতে চাইছিলেন, তিনি তাঁর সব গুরুভ্রাতাগণকে চিঠি পাঠিয়েছেন কিন্তু কেউ তাঁকে স্বীকার করতে রাজি হলেন না—সবাই কঠোর ব্রাহ্মণ-বুদ্ধি বলে ভাবলেন যে, তিনি ম্লেচ্ছ দেশে গিয়ে নিজে ম্লেচ্ছের মত হয়ে গিয়েছেন, কেউ তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছিলেন না। কিন্তু শ্রীল শ্রীধর মহারাজ খুব উত্তেজিত ও আনন্দিত হয়ে আমাদের গুরুদেবকে বললেন, “গৌরেন্দু, এখনই ওঁকে চিঠি পাঠিয়ে দাও—বল যে, উনি এখানে থাকতে পারেন। আর ওঁর আসার জন্য নবদ্বীপে এক ঠিক মত অভিবাদন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চেষ্টা করো।” গুরুদেব (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ) সেটা সব ব্যবস্থা করলেন এবং সমস্ত গৌড়ীয় মঠের গুরুভ্রাতাগণ তখন সেখানে চলে এলেন কারণ শ্রীল শ্রীধর মহারাজ সেই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করেছিলেন—সবাই তাঁকে অনেক সম্মান দিতেন, তাই যখন তাঁরা দেখলেন যে, শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীল স্বামী মহারাজকে প্রশংসা করেছিলেন, তখন তাঁরাও শ্রীল স্বামী মহারাজকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

আপনারা সবাই জানেন কিরকম শ্রীল শ্রীধর মহারাজ জীবনযাপন করতেন। তিনি ভাঙ্গা চৌকিতে শুয়ে থাকতেন, তাঁর কাপড়ে বোধহয় একশো ছিদ্র ছিল—শ্রীল গুরু মহারাজ খুব সরল। কিন্তু শ্রীল স্বামী মহারাজ ফিরে আসার খবর পেয়ে শ্রীল শ্রীধর মহারাজ খুব উত্তেজিত ছিলেন এবং নিজের ঘর ও নিজের খাট ভালোভাবে পরিষ্কার করে তিনি ভাবলেন, “শ্রীল স্বামী মহারাজ এখানে শুয়ে থাকবেন !” কিন্তু যখন শ্রীল স্বামী মহারাজ আমাদের শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ নবদ্বীপে এসে দেখলেন যে, শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁর জন্য নিজের ঘর ব্যবস্থা করে দিলেন, তিনি শ্রীল গোবিন্দ মহারাজকে বললেন, “বাবা ! সেটা ত শ্রীল শ্রীধর মহারাজের ঘর ! যে ঘরের দিকে আমি প্রণাম করি,

সে ঘরে আমাকে থাকতে হবে? এটা অসম্ভব! আমার প্রভুর খাটে আমি শুয়ে থাকব না। শুয়ে থাকার দূরের কথা, আমি এর উপরে বসবও না! হে গৌরেন্দু, তোমার ঘরটা কোথায়? আমি তোমার সঙ্গে থাকব!" তাই শ্রীল স্বামী মহারাজ আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে ওই সময় মঠে কিছু দিন কাটিয়েছিলেন।

যখন শ্রীল স্বামী মহারাজ ভারতবর্ষ ফিরে এলেন, তিনি প্রথম শ্রীল শ্রীধর মহারাজের সঙ্গে দেখা করলেন আর তাঁকে সব কিছু বলে দিলেন—কিরকম তিনি প্রচার করতেন, কিরকম বিদেশে প্রচার বিস্তার করতেন, ইত্যাদি। সব কথা শুনে শ্রীল শ্রীধর মহারাজ খুব খুশী হলেন।

এরপর শ্রীল স্বামী মহারাজ এই শ্রীধাম মায়াপুরে জমি কিনে নিয়ে এখানে ইস্কনের হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করেছিলেন—১৯৭৩ সালে এই শ্রীচন্দ্রোদয় মন্দিরের প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান হচ্ছিল। শ্রীল স্বামী মহারাজ সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন এবং সেই নিমন্ত্রণ খেয়ে শ্রীল শ্রীধর মহারাজ আমাদের গুরুপাদপদ্ম (শ্রীল গোবিন্দ মহারাজ, তাঁর নাম ওই সময় গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ছিল) ও শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজকে নিয়ে ওই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। এখানে এসে শ্রীল গুরুদেব শ্রীল স্বামী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, আপনি আমাদেরকে মঠের প্রতিষ্ঠায় নিমন্ত্রণ করলেন কিন্তু সব যজ্ঞ-ব্যবস্থা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না!" শ্রীল স্বামী মহারাজ উত্তরে বললেন, "যজ্ঞের কী দরকার? শ্রীল শ্রীধর মহারাজ চলে এসেছেন, তাই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাটা হয়ে গিয়েছে!" সেই দিন পাঠের সময় শ্রীল স্বামী মহারাজ শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে কিছু হরিকথা বলতে অনুরোধ করলেন কিন্তু শ্রীল শ্রীধর মহারাজ বললেন, "আজ আমার শরীর ভালো নয় বলে গৌরেন্দু প্রভু আমার পক্ষে কিছু কথা বলবেন।" সেই পাঠে শ্রীল গুরুদেব একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন,

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম ॥

"কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেইবা তাহা প্রতীতি করিবে যে, সূর্য্যতনয়া-কুঞ্জে গোপবধুতিগের লম্পট পরম-ব্রহ্ম লীলা করেন?"

তিনি বললেন, “কাকে বলব, কাকে শুনাইব যে, পরম-ব্রহ্ম গোপীর সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে খেলা করছেন? কে বিশ্বাস করবে? সেইভাবে কাকে বলব, কাকে শুনাইব যে, আমাদের অভয় বাবু, যাকে আমরা সবাই সাধারণ গৃহস্থরূপে চিনতাম, এখন বিরাট জগৎগুরু হয়ে কৃষ্ণকথা সব পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন? তিনি অসম্ভব কাজ সম্পূর্ণ করেছেন !”

এই শ্লোকটি শোনা মাত্রই শ্রীল গুরুদেবের মন বুঝতে পেরে শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ লাফিয়ে উঠে চিৎকার করলেন, “হরি বল ! হরি বল!” সেই দিন শ্রীল গুরুদেবের কথা শুনে সবাই খুব খুশি হয়েছিলেন আর অবশেষে শ্রীল স্বামী মহারাজও আমাদের শ্রীল গুরুদেবের সম্বন্ধে বলেছিলেন, “তিনি আমার প্রিয়তম পুত্র !”

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীল স্বামী মহারাজের সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ

“আমাদের শ্রীল স্বামী মহারাজ একটি অদ্ভুত, অলৌকিক কার্য সম্পূর্ণ করেছেন ! যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কল্পনা করেছিলেন, যে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমরা দেখতে পাই যে, ওই সমস্ত দৈববাণী শ্রীল স্বামী মহারাজের দ্বারা ওঁর উত্তরজীবনে সম্পূর্ণ হয়েছিল ! আমরা আনন্দিত, আমরা খুশি, আমরা শ্রীল স্বামী মহারাজের জন্য গর্বিত হই ! উপরন্তু, যে শ্রীল স্বামী মহারাজের দ্বারা মহাপ্রভুর কৃপা সব পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল, সেটা তুচ্ছ জিনিস নয়—সঙ্গে সঙ্গে আমি উপলব্ধি করেছি যে, উনি শক্ত্যাবেশ অবতার, ওঁর মাধ্যমে একটি দৈবশক্তি নেমে এসেছিল। কেউ কেউ সাধারণ জিনিস বিস্তৃত করতে পারে, কিন্তু এইরকম উচ্চতম দান, পরম দান, এইরকম সর্বোৎকৃষ্ট ধন বিস্তৃত করা এত সহজ নয়। ওঁর মধ্যে একটি দৈবশক্তি নেমে এসেছিল। কোটি বৈষ্ণবের মধ্যে এইরকম সাধু পাওয়া খুব মুশকিল, কিন্তু আমরা দেখছি যে, সেই পরম ধন ওঁর কৃপায় এখন যথা তথা ছুড়ে ফেলা হয়। যে বৈকুণ্ঠময় বৈষ্ণব সিদ্ধি আমরা ওঁর মধ্যে দেখছি, সেটা অচিন্ত্য। মহাপ্রভু যে বলেছেন—‘পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম সর্ব্বত্র

প্রচার হইবে মোর নাম' — সেটাই হচ্ছে শ্রীল স্বামী মহারাজের স্বার্থ। আর যে উনি আমার প্রতি সব সময় অনেক স্নেহ ও দয়া করছেন, সেটা আমারই সৌভাগ্য হয়।"

অবশেষে ভগবান্ তাঁর প্রিয় ভক্তের ইচ্ছা সম্পূর্ণ করলেন — শ্রীল স্বামী মহারাজের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তিনি বৃন্দাবনে দেহ পরিত্যাগ করবেন। তাই শেষ সময় অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় বিছানায় শুয়ে তিনি হঠাৎ করে দুই বাহু তুলে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "হরে ! হরে কৃষ্ণ !!" এবং এরপর তাঁর নিত্যধাম ও নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন...

আমরা সবাই সেই শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ প্রভুপাদের কমলচরণের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি গোলোক বৃন্দাবনেই থাকলে আমাদের প্রতি কৃপা করবেন, যেন তাঁর কৃপায় আমরা সব সময় ভক্তগণকে সেবা করতে পারব। আমরা জানি না কত দিন আমরা এই জগতে বেঁচে থাকব, কিন্তু আমরা শুধু প্রার্থনা করে থাকি, "দয়া করে আমাদের প্রতি কিছু কৃপা বিধান করুন, দয়া করে আমাদেরকে আপনার শ্রীচরণে একটু তুচ্ছ স্থান দিন।" আমাদের সবাই শ্রীল স্বামী মহারাজের কৃপা ভিক্ষা করতে হবে।

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ প্রভুপাদ কি জয়।
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কি জয়।
শ্রীধাম পরিক্রমা পালনকারী ভক্তবৃন্দ কি জয়।

শ্রীবারকোণা ও শ্রীমাধাই ঘাটে

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করতে করতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা এখন শ্রীমাধাই ঘাটে এসেছি। এখানে পাশে বারকোণা ঘাটও (গঙ্গার স্রোত পতিবর্তন হওয়ার পর সেই ঘাটটা প্রচ্ছন্নভাবে এখন আছে), আর বারকোণা ঘাটের পাশে শ্রীশচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি বর্তমান। এই বারকোণা ঘাটে মহাপ্রভুর অনেক বিশেষ লীলা হয়েছিল।

আগে নবদ্বীপ ছিল বিখ্যাত বিদ্যার স্থান। এক সময় বুড়ো পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী নামে ছিল যে কাশ্মীর ও কাশীতে সবাইকে বিজয় করলে এখানে এসেছিলেন নবদ্বীপ বিজয় করবার জন্য। তিনি এসে প্রধান মায়াবাদী ও গোসাঞিের কাছে শুনলেন যে, নবদ্বীপে সমস্ত পণ্ডিতের মধ্যে নিমাই একবার বেশী পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন, সবাই শিক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে যায়।

মহাপ্রভু (নিমাই বিশ্বম্ভর) তখন শুধু ১৬ বছর বয়সের ছেলে হয়ে ব্যাকরণ পড়াতেন। এক দিন তিনি অনেক ছাত্রগণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে বসে কিছু ব্যাকরণের বিষয় আলাপ করছিলেন। সেখানে গিয়ে দিগ্‌-বিজয়ী পণ্ডিত নিমাইয়ের অসাধারণ সমুজ্জ্বল চেহারা দেখে ওঁর কাছে এসেছিলেন। নিমাই ওঁকে সম্মান দিয়ে উচ্চ জায়গায় বসতে দিলেন আর বললেন, “আমরা খুব ভাগ্যবান্ যে, আপনি আমাদের কাছে আজ এসেছেন। আপনি অনেক দেশ বিজয় করে এসেছেন, আপনার মত পণ্ডিত এই জগতে নেই।” এই মিষ্টি কথা শুনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আরো অভিমান হল। উনি বললেন, “সবাই বলছে, তুমি বিরাট পণ্ডিত। তুমি কি শিখাও ?”

“বিশেষ কিছু নয়। আসলে কিছু পড়াশোনা না করে আমি শুধু কলাপ (সংস্কৃত) ব্যাকরণ শিখাই।”

“সংস্কৃত ব্যাকরণ ? এটা ত সামান্য জিনিস ! বেদ-বেদান্তও পড় নি ?”

"ও সব পড়তে গুরু আমাকে আদেশ করেন নি। গুরু আমাকে মূর্খ দেখে সারাক্ষণ নাচতে গাইতে হরিকীর্ত্তন করতে বললেন। তাই এর ছাড়া আমি কিছু জানি না।"

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি , কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তখন বললেন, "আচ্ছা। কিন্তু সবাই তোমাকে প্রশংসা করছেন। আমিও তোমার নাম শুনেছি।"

"লোক আমার প্রতি স্নেহ করছেন, তাই অনেক কিছু বলে।" তখন নিমাই পণ্ডিত হাত জোর করে বললেন, "প্রভু, কথা বলব? আমরা এই গঙ্গার নিকটে বসে আছি—আপনি গঙ্গার মাহাত্ম্য একটু বলবেন?"

"আমি তো বলব কিন্তু তুমি গঙ্গার মাহাত্ম্য কি করে বুঝবে? তুমি তো শুধু ব্যাকরণ পড়াচ্ছ, বেদ বেদান্তও কিছুই পড় নি !"

"আমি বুঝতে চেষ্টা করব।"

তখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ঝড়ের বেগে অনেকগুকো শ্লোক বললেন। একশো শ্লোক বলার পর তিনি থেমে গেলেন। নিমাই পণ্ডিত তখন বললেন, "আমরা সব বুঝতে পারছি না কিন্তু যদি আপনি দুই-একটি শ্লোকের অর্থ আমাদেরকে শুনাবেন, আমরা বোধহয় কিছু বুঝতে পারব।"

নিমাইকে পরীক্ষা করার জন্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি অনেকগুলো শ্লোক বলেছিলাম, কী শ্লোকটার অর্থ তোমরা শুনতে চাও?"

নিমাই বললেন, "এইটার:

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥

"এই গঙ্গাদেবীর মহত্ত্ব সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, যেহেতু ইনি অতি সৌভাগ্যবতী। ইনি শ্রীবিষ্ণু-চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আর ইনি লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় সুর-নরগণ দ্বারা

অর্চ্চিত-চরণ হইয়াছেন। ইনি অদ্ভুতগুণবতী, ভবানীস্বামী মহাদেবের উপর প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অবাক হয়ে গেলেন—"আমি শ্লোকগুলো ঝড়ের বেগে বললাম, তুমি এই শ্লোকটা কি করে মনে রাখলে?"

প্রভু কহে, দেবের বরে তুমি—'কবিবর'।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয়—'শ্রুতিধর'॥

নিমাই পণ্ডিত উত্তরে বললেন, "আপনি সরস্বতী দেবীর কাছে বর পেয়েছেন, আমিও তাঁর কাছে একটা বর পেয়েছি—কথা শুনলেও আমার মনে থাকে।"

বিরক্ত হয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্লোকটার ব্যাখ্যা করলেন, কিন্তু সব ব্যাখ্যাটা মায়াবাদীর ব্যাখ্যা ছিল। নিমাই পণ্ডিত তখন বললেন, "অর্থটা শুনে আমরা খুবই ধন্য, কিন্তু শ্লোকটার মধ্যে কিবা গুণ কিবা দোষ আছে—ব্যাখ্যা করবেন?"

আরও বেশী বিরক্ত হয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বললেন, "দোষ?! কোন দোষ এখানে নেই! আমি যা বললাম, সেটা সব ঠিক!"

মহাপ্রভু তখন বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়, কিন্তু বড় পণ্ডিতেরও কিছু দোষ হতে পারে। আমি দেখছি শ্লোকটার মধ্যে কিছু দোষ ত আছে..."

"তুমি দেখছ, তাই তুমি বল।"

"যদি আপনি রাগ করবেন না, তাহলে আমি বলব।" আর মহাপ্রভু সব কিছু ব্যাখ্যা করলেন—তিনি এমন ভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের মাথা হেঁট হয়ে গেল। সব ছাত্ররা তখন হেসে উঠল কিন্তু মহাপ্রভু সবাইকে ধমক দিলেন, "ওই রে! তোমরা কী করছ? থামো, থামো!" তখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিনীতভাবে বললেন, "প্রভু আপনি অপরাধ নেবেন না, আমাকে ক্ষমা করবেন। ওরা কিছু জানে না, আপনি বিরাট পণ্ডিত, হয়তো আপনার শরীর বা মন আজ ভালো নয়। আপনি কালকে আসুন, আবার দেখা হবে।"

রাতের বেলায় ঘরে ফিরে এসে কেশব কাশ্মীরী কিছুই খেলেন না—ভাবতে থাকলেন, "আমি এখানে নবদ্বীপ পণ্ডিত হয়ে হারাতে

আসলাম, আর আজকে ছোট বাচ্চার কাছে হেরে গেলাম ! হে দেবী ! আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছিলাম? তুমি আমাকে বলেছ যে, জগতে আমাকে কেউ হারাতে পারবে না !” এ সব ভেবে ভেবে তিনি বিশ্রামে গেলেন। তখন সরস্বতী দেবী স্বপ্নে তাঁর কাছে এসে হাজির হয়ে বললেন, “হে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী ! এবার ওঠো ! আমি তোমার কাছে এসেছি। জান, তুমি আজকে কাঁর কাছে হেরেছ? সে কে? তুমি তাঁকে চেনো? আমি ঠিকই বলেছি—এই জগতের লোক তোমাকে কেউ হারাতে পারবে না কিন্তু উনি তো এই জগতের লোক নন, উনি সাধারণ মানুষের মত দেখতে হতে পারেন কিন্তু সে তো স্বয়ং ভগবান্ !”

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

“উনি আমার প্রভু, আমার স্বামী ! তুমি আমার শিষ্য হয়েছ, আর তুমি ওঁর কাছে উঁচ্চ শিক্ষা পেয়ে গেছ। কালকে তুমি ওঁর কাছে গিয়ে আবার ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নাও।”

পরের দিন মহাপ্রভু গঙ্গা ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছেন আর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ওঁকে দেখে দৌড়ে গিয়ে ডাকতে লাগলেন, “প্রভু ! দাঁড়ান ! দাঁড়ান !” আর কাছে গিয়ে নিমাই পণ্ডিতের পা জড়িয়ে ধরলেন—নিমাই অবাক হয়ে গেলেন, “এই, কাশ্মীরী ! আপনি? বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিত, আপনি আমার পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?! আপনি কি করছেন এ সব?” দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বললেন, “প্রভু আমার সঙ্গে আর ছলনা করবেন না। আমি আপনাকে আগে চিনতে পারি নি কিন্তু আমি যাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি সেই সরস্বতী দেবী আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন আপনি কে। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আপনার চরণে শরণাগত হলাম—আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।”

সেই ভাবে মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে উদ্ধার করেছিলেন এই বারকোণা ঘাটে। আর যে ঘাটে আমরা বসে আছি এখন, সেটা হচ্ছে মাধাই ঘাট। সেখানে একটা বিখ্যাত লীলা হয়েছিল।

যখন মহাপ্রভু প্রচার শুরু করলেন, তিনি প্রথম শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে তাঁর প্রচারের সেনাপতি মনোনীত করে তাঁদেরকে আদেশ দিলেন (চৈঃ ভাঃ ২/১৩/৮-১০),

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা' ॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥

মহাপ্রভু বললেন, "শুন নিতাই! শুন হরিদাস! আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি—দ্বারে দ্বারে গিয়ে লোককে কৃষ্ণকথা বলবে, লোককে কৃষ্ণনাম করতে বলবে আর কৃষ্ণ-শিক্ষা গ্রহণ করতে বলবে। রাত্রে আবার আমার কাছে ফিরে এস, সব ঘটনা আমাকে বলবে।" তাই মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর প্রতি দিন দ্বারে দ্বারে গিয়ে নদিয়ায় প্রচার করতে শুরু করলেন।

এক দিন দুই পাপিষ্ঠ ও মদ্যপ ভ্রাতা জগাই ও মাধাই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে মহাপ্রভুর স্নান ঘাটে এসেছিলেন এবং সেখানে থাকতে লাগলেন। রাতের সময় যে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন ছিল, সেটা শুনলে মত্ত হয়ে ওরা নাচতে গাইতে এবং আরো বেশী মদ ভোগ করতেন। এক রাত্রে নিত্যানন্দ প্রভু ওদের ঘাটের পাশে গিয়ে ওদেরকে প্রথম বার দেখতে পেলেন। পরের দিন তিনি হরিদাস ঠাকুরকে বললেন, "হরিদাস, জান, আমাদের প্রভুর ঘাটে দুই মদ্যপ ব্যক্তি বাস করছেন। সমস্ত লোক ওদেরকে দেখে ভয় পায়, কিন্তু যদি আমরা ওদের কাছে গিয়ে ওদেরকে কৃষ্ণনাম করতে বলব, তাহলে সবাই মনে করবেন যে, 'আরে দেখ—জগাই ও মাধাই কৃষ্ণনাম করছেন!'—তখন সবাই কৃষ্ণনাম করতে আরো বেশী উৎসাহিত হয়ে যাবে!" শ্রীল হরিদাস ঠাকুর রাজি হলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভু এত তাড়াতাড়ি করে ঘাটে হাঁটা শুরু করলেন—শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বয়স্ক, ওঁর সঙ্গে হেঁটে পারলেন না।

পিছনে ফিরে তাকিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু ডাকলেন, "আরে হরিদাস, তুমি কি আসছ? এস ! এস !" হরিদাস ঠাকুর বললেন, "যাচ্ছি, যাচ্ছি। তুমি এগিয়ে যাও, আমি পিছনে যাচ্ছি।" রাস্তায় লোক দেখল কোথায় নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর যাচ্ছিলেন এবং সাবধান করে দিলেন, "আরে তোমরা দুজন কোথায় যাচ্ছ? ওরা ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক মানুষ ! যেও না ! ওরা তোমাদেরকে মেরে ফেলবে !" কিছু ভয় পেয়ে হরিদাস ঠাকুর বললেন, "নিতাই, শুনেছ, লোক কী বলছে?" কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু কিছু মনে করলেন না, "ভয় পেও না ! আমার সঙ্গে চল !"

সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা জগাই ও মাধাইয়ের কাছে ঘাটে এসেছিলেন। মত্ত দুইজনকে দেখে পতিতপাবন পরমদয়াল নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "আরে ভাইরা, বল 'কৃষ্ণ' !" উভয় ভ্রাতা রেগে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুকে ভয় দেখালেন, বললেন, "তুমি কে? চলে যাও এখান থেকে নইলে আমরা তোমাকে মেরে ফেলব !" নিত্যানন্দ প্রভুর পিছনে থেকে কথাটা শুনে হরিদাস ঠাকুর পালিয়ে গেলেন। পরে নিত্যানন্দ প্রভু ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি পালিয়ে গেলে কেন? কালকে আমাদের সেখানে আবার যেতে হবে !"

তাই পরের দিন ওঁরা আবার ঘাটে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু জগাই ও মাধাইকে বললেন, "দয়া কর একবার 'কৃষ্ণ' বল !" খারাপ কথা উত্তরে বলে জগাই ও মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুকে মারতে যাচ্ছিলেন কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর কিছু ভয় ছিল না। উনি আবার বললেন, "তোমাদের পা ধরে বলছি—'কৃষ্ণনাম' কর !" তখন মাধাই ভীষণ রেগে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় ভাঙ্গা হাড়ীর টুকরা ছুড়ে মারলেন আর হাড়ীর টুকরার আঘাতে নিত্যানন্দ প্রভুর মাথা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। রক্তটা দেখে হরিদাস ঠাকুর আবার পালিয়ে গেলেন এবং এইবার মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে সব খবর বলে দিলেন, "প্রভু, তুমি নিতাইকে আদেশ দিলে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করবার জন্য কিন্তু তুমি জান কী আজ হয়েছিল? ওই মদ্যপ মাধাই নিতাইকে মেরে ফেলল ! নিতাইয়ের মাথা থেকে অনেক রক্ত পড়ছে !"

কথা শুনে মহাপ্রভু রেগে গিয়ে সুদর্শন চক্র ডাকতে শুরু করলেন। “চক্র-চক্র-চক্র” ক্রোধে ঘন ঘন বলে মহাপ্রভু ঘাটে ছুটে গেলেন। ইতিমধ্যে, আঘাত পেয়ে নিত্যানন্দ প্রভু ভয় পেলেন না—তিনি আবার হাসতে হাসতে মাধাইয়ের কাছে কৃষ্ণনাম করতে ভিক্ষা করলেন। আমরা কীর্ত্তনেই গাই, “মার খেয়েও নাম প্রেম যাচে !” এত বেশি রক্ত পড়ছে কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু কিছু বলেন নি—উনি শুধু সব সময় বলতে থাকলেন, “বল কৃষ্ণ ! দয়া কর কৃষ্ণনাম কর, বল ‘হরে কৃষ্ণ’ !”

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দ্বারে দ্বারে গিয়ে সবাইকে পা ধরে কৃষ্ণনাম বিতরণ করতেন, “নিয়ে নাও, নিয়ে নাও ! আমারে কিনিয়া লহ কৃষ্ণ নাম করে !”

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে ॥

তাই, নিত্যানন্দ প্রভুর কথা শুনে রেগে গিয়ে মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুকে পুনরায় মারতে যাচ্ছিলেন কিন্তু এই বার জগাই মাধাইয়ের হাত চেপে ধরে বললেন, “ছেড়ে দাও, ভাই। সন্ন্যাসীকে মেরে লাভ নেই !” ওই সময় মহাপ্রভু সুদর্শন চক্র নিয়ে এসেছিলেন। সুদর্শন চক্র দেখে নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, “প্রভু, তুমি প্রতিজ্ঞা করলে যে, এই কলি যুগে তুমি অস্ত্র দিয়া যুদ্ধ করবে না—তুমি শুধু স্নেহ ও ভালোবাসা বিস্তার করবে... প্রভু, রাগ কর না ! মাধাই আমাকে মারল কিন্তু জগাই আমাকে রক্ষা করল ! দয়া কর এই দুজনকে উদ্ধার কর ! এই জগতে ওদের আর কেউ নিস্তার করতে পারবে না !” মহাপ্রভুর ক্রোধ দেখে দুই পাপী ভয়ে কাঁপতে শুরু করলেন কিন্তু যে জগাই নিতাইকে রক্ষা করলেন, সেটা শুনলে মহাপ্রভুর সুখী হয়েছিলেন । তিনি জগাইকে আলিঙ্গন করে এবং প্রেমভক্তি প্রদান করে ওকে তাঁর চতুর্ভূজরূপ দেখালেন। ভগবানের দিব্যরূপ দেখে জগাই প্রেমে বিভাবিত হয়ে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

ভাইয়ের অবস্থা দেখে মাধাইয়ের মন পরিবর্তন হয়ে গেল—ও কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়ল। কিন্তু মহাপ্রভু ওকে বললেন, “তুমি নিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত করলে বলে আমি

তোমাকে গ্রহণ করব না ! নিতাইয়ের দেহ আমার চাইতে বড়, তাই যে নিতাইয়ের চরণে অপরাধ করে, আমি তাকে কখনও স্বীকার করব না।” কাঁদতে কাঁদতে মাধাই বললেন, “তবে আমার কি হবে, প্রভু? তুমি আমাকে কৃপা না করলে, আমি কি করে এই জগতে নিস্তার পাব?” পতিতপাবন শ্রীমন মহাপ্রভু তখন ওকে বললেন, “নিতাইয়ের চরণ ধরে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা ভিক্ষা কর, তখন তুমি নিস্তার পাবে।” মাধাই তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে পড়ে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা ভিক্ষা করলেন। “যদি আমার কোন জন্মে কিছু সুকৃতি আছে, আমি সব সুকৃতি মাধাইকে দিচ্ছি !”—এই বলে নিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে বুকে তুলে আলিঙ্গন করে ওর দেহে প্রবেশ করলেন। সবাই তখন হরিধ্বনিতে মুখরিত করতে লাগলেন।

সেইরকম জগাই ও মাধাই উদ্ধার লাভ করলেন। ওই সময় থেকে উভয় ভ্রাতা বড় ভক্ত হয়ে গেলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে ওরা প্রতি দিন হরিনাম করতে লাগলেন আর পূর্ব্বপাপের কথা সব সময় স্মরণ করতে ওরা অত্যন্ত লজ্জিত হতেন। বিশেষতঃ মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে রক্তপাত করাতে অপরাধটা স্মরণ করে ক্রন্দন করতেন। একদিন মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। পরমদয়ালু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ওকে বুকে তুলে আলিঙ্গন করে বললেন, “তুমি কাজ কর, এখানে একটা ঘাট স্থাপন করে ঘাটটাকে সেবা করবে।” নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ অনুসারে মাধাই এই ঘাটটা স্থাপন করার পর প্রতি দিন ঘাটটা পরিষ্কার করতেন এবং যে লোক এখানে গঙ্গাস্নান করতে আসতেন, সবাইয়ের কাছে গিয়ে ও অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করতে লাগলেন। আগের যুগে পায়খানা বাথরুম ছিল না বলে সবাই গঙ্গাধারে পায়খানা করত, তাই জগাই ও মাধাই সেই সব পায়খানা এখানে পরিষ্কার করতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলা হয় (২/১৫/৯২-৯৪):

পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
‘ব্রহ্মচারী’ হেন খ্যাতি হইল তথাই॥

নিরবধি গঙ্গা দেখি’ থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে ॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
‘মাধাই ঘাট’ বলি’ সর্ব্বলোকে গায় ॥

আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, মাধাই অত্যন্ত ভীষণ মদ্যপ ছিলেন—উনি ডাকাতি করতে পারেন, খুন করতে পারেনও ; কিন্তু ওর একটা গুণ ছিল—তিনি কখনও বৈষ্ণব অপরাধ করেন নি। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, “কিন্তু উনি নিত্যানন্দ প্রভুকে মেরেছে ! সেটা কি অপরাধ ছিল না ?” সেটা ঠিক কথা কিন্তু শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুকে না মারলে ওর কি করে উদ্ধার হবে ? উপরন্তু, যদি মাধাই ওঁকে না মারতেন, তাহলে নিত্যানন্দের মহিমা এই জগতে প্রকাশিত হত না !

সেইভাবে আমরা সবাই এই ঘাটে এসে প্রণাম করে প্রার্থনা করি যেন আমাদের মত পাপিষ্ঠ পামর জীব (“জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ / পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ”) যেকোন রকম এক দিন নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকি কৃপা ও তাঁর ভক্তদের সেবা লাভ করতে পারব। এটাই আমাদের ভরসা।

জয় শ্রীজগাই-মাধাই প্রভু কি জয়। জয় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়।

হরিবল হরিবল হরিবল ভাই রে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ নিতাই রে ॥ (মোদের দুঃখ দেখে রে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে।
হরিনামে শুদ্ধ হ’ল জগাই মাধাই রে ॥ (বড় পাপী ছিল রে)
মিছে মায়াবদ্ধ হ’য়ে জীবন কাটাই রে। (আমি আমার বলে রে)
আশাপশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে ॥ (নিরাশ ত সুখ রে)
হরি বলে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে। (নিরাশা ত’ সুখ রে)
ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি’ হরিনাম গাই রে ॥ (শুদ্ধসত্ত্ব হ’য়ে রে)
না চেয়েও নামের গুণে ওসব ফল পাই রে। (তুচ্ছ ফলের প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই ল’য়ে নামের বালাই রে ॥ (নামের বালাই ছেড়ে রে)

জয় শচীনন্দন সুর-মুনিবন্দন
ভবভয়-খণ্ডন জয় হে।
জয় হরিকীর্ত্তন নর্ত্তনা বর্ত্তন
কলিমল-কর্ত্তন জয় হে॥
নয়ন-পুরন্দর বিশ্বরূপ স্নেহধর
বিশ্বম্ভর বিশ্বের কল্যাণ।
জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর-প্রিয়হিয়া
জয় প্রিয় কিঙ্কর ঈশান॥

শ্রীসীতা-অদ্বৈতরায় মালনী-শ্রীবাস জয়
জয় চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দরায় গদাধর জয় জয়
জয় হরিদাস নামাচার্য্য॥
মুরারি মুকুন্দ জয় প্রেমনিধি মহাশয়
জয় যত প্রভু পারিষদ।
বন্দি সবাকার পায় অধমেরে কৃপা হয়
ভক্তি সপার্ষদ-প্রভুপাদ॥

শ্রীযোগপীঠ

(১) শ্রীমন্মহাপুর ধামশিরোমণি

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করতে আমরা শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে এসেছি। মন্দিরের পাশে অঙ্গনে একটা নিম-গাছ আছে, সেই নিম-গাছের তলায় মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে শচীমাতার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়, "শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ—শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করলেন")। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার আশ্রয় করে শ্রীমন মহাপ্রভু এখানে এসেছিলেন—যেহেতু তিনি নিম-গাছের তলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর নাম ছিল নিমাই; জ্যোতিষী তাঁকে নাম দিয়েছেন বিশ্বম্ভর; আর সন্ন্যাস নেওয়ার পর তাঁর নাম হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু নিয়ে এই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা প্রথম করেছিলেন—সেই পরিক্রমা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য নামে শ্রীগ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন :

যখন বাড়ী ছেড়ে দিয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু (একটি সুন্দর দেখতে যুবক যার অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের আদর্শ সত্যই আশ্চর্য ছিল) চক্ষের জলে "হা গৌরাঙ্গ! হা নিত্যানন্দ! কবে তোমরা আমার কৃপা করে দর্শন দিবে? হা হা নবদ্বীপ! কবে আমি এই ধামের শিরোমণি দেখতে পাব?" বলতে বলতে নবদ্বীপ ধাম দূর থেকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি দণ্ডবৎ করে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। মন স্থির করে তিনি নবদ্বীপ ধাম প্রবেশ করে প্রথম বারকোণা ঘাটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি লোককে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

“প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু কোথায়?” সেই লোকটি জীব গোস্বামীর পাগলের মত অবস্থা দেখে এঁকে শীঘ্র করে নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে নিয়ে আনলেন। ভক্তগণকে প্রথম দেখে শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁদের শ্রীচরণে প্রণাম করে মাটিতে পড়লেন আর উঠে বললেন, “এই অধম জীব আজকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পেয়েছে! সব শাস্ত্রে বলা হয় যখন তোমরা আমাকে দয়া করবে, তখন আমি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম পাব!” জীব গোস্বামী প্রভুকে দেখে কয়েকজন ভক্তগণ তাঁর শ্রীচরণ-ধূলিখানা মাথায় নিলেন। তখন ভক্তগণ তাঁকে শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে আনলেন—নিত্যানন্দ প্রভুর অপূর্ব্বরূপ দেখেই শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু মাটিতে অচেতন হয়ে পড়লেন। নিত্যানন্দ প্রভু তো অন্তর্যামী—তিনি সব জানেন, তাই শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে দেখে চিনে তিনি আনন্দে তাঁকে উঠাইয়া হাতে তুলে নাচতে শুরু করলেন! সমস্ত ভক্তগণ তখন আনন্দিত হয়ে কীর্ত্তন করতে লাগলেন।

কিছু ক্ষণ পরে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু নিজের পরিচয় বলে দিলেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে বহু কৃপা প্রদান করলেন। সেই দিন তিনি শ্রীবাসাঙ্গনে থাকলেন এবং সন্ধ্যার সময়, যখন নিত্যানন্দ প্রভু একাই বসে ছিলেন, তখন শ্রীজীব গোস্বামী আবার তাঁর কাছে প্রণাম করে এলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে নিজের নিকটে বসালেন আর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু হাত জোর করে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, আপনি কৃপা করে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করবেন?” নিত্যানন্দ প্রভু উত্তরে বললেন, “শুন জীব। আমি তোমাকে গুপ্ত কথা বলব, তুমি এই কথা শুনে সব সময় মনে রাখ আর কাউকে বলবে না—যা আমি তোমাকে বলব, সে পরে প্রকাশ হয়ে যাবে।”

এই কথাটা বলে নিত্যানন্দ প্রভু তারপর শ্রীনবদ্বীপধাম-তত্ত্বের সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন : “জীব, এই নবদ্বীপধাম সর্ব্ব ধামের সার—শ্রীবিরজা পার করে ব্রহ্মলোক বর্তমান আছে, তার পর বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ, শ্রীগোলোক এবং গোলোকের মধ্যে গোকুল বৃন্দাবন—কৃষ্ণলোক হয়। সেই লোকে দুই প্রকার ভাব প্রকাশিত হয়—মাধুর্য্য

ও ঔদার্য্য। মাধুর্য্যের মধ্যে ঔদার্য্য ভাব সম্পূর্ণ রূপে উপস্থিত এবং ঔদার্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য ভাব সম্পূর্ণ রূপে উপস্থিত হয়েও বৃন্দাবনধামে মাধুর্য্য এবং শ্রীনবদ্বীপধামে ঔদার্য্য প্রাধান্যপূর্ণ হয়। এর ছাড়া বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

"হে জীব! এই ষোল-ক্রোশ নবদ্বীপ ধাম বৃন্দাবনধাম থেকে অভিন্ন। এই ষোল-ক্রোশের মধ্যে যে নয় দ্বীপগুলো আছে, সে একটি অষ্টদল জলের মধ্যে ভাসমান পদ্ম গঠন করে আর যে এই অষ্টদল বা অষ্টদ্বীপগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বীপ হচ্ছে, তার মধ্যবিন্দু হচ্ছে মায়াপুর। মায়াপুরের ভিতরে অবস্থিত যোগপীঠ হচ্ছে নিত্য ধাম—তার মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্য-লীলা প্রকাশ করছেন। এই যোগপীঠের পরিধি হচ্ছে ছয় মাইল আর ব্যাসটা হচ্ছে দুই মাইল।

"এই পৃথিবীতে যোগপীঠের মাহাত্ম্য সব চেয়ে বৃহত্তর—আর কোন স্থান বা তীর্থের এই যোগপীঠের তুলনা করা যায় না। প্রভুর ইচ্ছা মত অচিরকালে গঙ্গার জল এই ধামকে লুকিয়ে রাখবে—প্রায় সমস্ত ধাম তখন গুপ্ত হয়ে যাবে কিন্তু কিছু দিন পরে যখন প্রভুর ইচ্ছা হবে, তখন এই ধামশিরোমণি আবার প্রকাশিত হয়ে যাবে। যেই স্থান নিত্য ধাম, সেই স্থান কখনও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না—গুপ্ত হলেও নিত্যধাম আবার উদয় হয়। আমার প্রভু নিত্যকাল এই মায়াপুরে গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে আছেন। লোক বলে যে, বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর নবদ্বীপ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মায়াপুর-গ্রামটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন জায়গায় কখনও চলে যান না।"

অনেকে ভাবে যে, মহাপ্রভু নবদ্বীপ ছেড়ে দিয়ে পুরিতে এবং অন্য জায়গায় গিয়েছিলেন, অনেকে বলেও যে, কৃষ্ণ সব ছেড়ে দিয়ে মথুরায় চলে গিয়েছিলেন—কৃষ্ণ মথুরায় চলে যেতে পারেন কিন্তু বৃন্দাবন-কৃষ্ণ কখনও বৃন্দাবন ছেড়ে দেন না। ব্রজকৃষ্ণ সব সময় ব্রজেই থাকেন।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে বললেন, “জড়চক্ষু দিয়ে লোক ধামের প্রাকৃত রূপ দেখতে পায় কিন্তু মায়া সব সময় ধামের অপ্রাকৃত-স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রাখেন। জড় দেশ, কাল, জঞ্জাল—প্রকৃত নবদ্বীপে কোন মায়ার বৈভব নেই। মায়াবদ্ধ জীব কর্ম্মবন্ধন বলে নবদ্বীপ ধাম প্রাপঞ্চিক ভাবে প্রবেশ করে কিন্তু যখন জীবের মধ্যে সাধুসঙ্গের প্রভাবে প্রেম উদয় হয়, তখন সেই জীব অপ্রাকৃত চিন্ময় ধাম—অপ্রাকৃত দেশ, কাল, ধাম, দ্রব্য—অনায়াসে স্বচক্ষে দেখতে পারবে।”

এই অতুলনীয়া শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীমায়াপুর ধাম আমাদের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দিয়েছেন। ১৮৮৮ সালের আগে সবাই ভাবতেন যে, মহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিল। সেটা ঠিকই হচ্ছে যে, মাঝে মাঝে গঙ্গার স্রোত জমি কেড়ে নিতে পারে কিন্তু গঙ্গার স্রোত জমিটাকে ফিরে দিতেও পারে। তাই প্রথম গঙ্গা সত্যই মহাপ্রভুর জন্মস্থান কেড়ে নিয়েছিল কিন্তু পরে জমিটাকে ফিরে দিল। যেমন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার করলেই আমেরিকা আগেই ছিল (কেউ সেখানে গিয়ে তাকে শুধু আবিষ্কার করল—সৃষ্টি বা স্থাপন করল না), তেমন মহাপ্রভুর জন্মস্থানও বর্তমান ছিল কিন্তু আচ্ছাদিত ভাবে। তাই যে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-ধাম এখন পুনরায় প্রকাশিত হয়, সেটা আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞ।

যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোদ্রুমদ্বীপে স্বানন্দ-সুখদা-কুঞ্জে (তাঁর গৃহ ও ভজন কুটিরে) থাকতেন, তখন তিনি এক দিন ছাদের উপরে হরিনাম করছিলেন (তাঁর অভ্যাস ছিল এইরকম : যখন প্রায় সন্ধ্যাবেলা হত তখন তিনি শুতে যেতেন আর মধ্যরাত উঠে তিনি গ্রন্থ লিখতেন ও হরিনাম করতেন।) ছাদে দাঁড়িয়ে তিনি কিছু দূরে একটা অদ্ভুত আলো দেখতে পেলেন। পরের দিন তিনি ওখানে গিয়ে দেখলেন যে, এটা খালি মাঠের মত জায়গা ছিল আর চারদিকে ওখানে অনেক তুলসী গাছ ছিল। তিনি একজন লোককে স্থানটার নাম জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু কেউ নামটা বলতে পারলেন না—এই জায়গা

গঙ্গার জল থেকে হঠাৎ করে উদিত হয়ে পড়ল। কে জমিটার মালিক, সেটাও কেউ জানতেন না। লোকটি শুধু বললেন যে, তারা মাঠটা চাষ করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কিছু হয় না—শুধু তুলসী গাছ উৎপন্ন হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চিন্তা করলেন, “তুলসী গাছ এখানে কেন?” তিনি নবদ্বীপে ফিরে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের কাছে এলেন। ওই সময় শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বয়স ১৩৭ বছর ছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?” বয়স্ক হয়ে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ হাঁটতে পারতেন না, তাই তাঁর সেবক তাঁকে ঝুড়িতে বসিয়ে দিলেন আর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁকে মাথায় বয়ে নিয়ে গেলেন। যখন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ওই স্থানে পৌঁছে ছিলেন, তখন তিনি ঝুড়ি থেকে লাফ দিয়ে নাচতে শুরু করলেন! তিনি চিৎকার করতে থাকলেন, “হ্যাঁ! পেয়েছি! এইটা প্রভুর জন্মস্থান! এইটা যোগপীঠ!”

পরে অনেক প্রতিবাদও এসেছিল। সমস্ত বাবাজী সম্প্রদায় একসঙ্গে আদালতে মামলা করলেন—তারা বললেন যে, এই যোগপীঠ মহাপ্রভুর আসল জন্মস্থান নয়। কিন্তু সেই মামলায় আদালতের বিচারে তারা পরাজয় হয়েছিল এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমাণ করলেন যে, এই স্থানটা প্রকৃত যোগপীঠ হচ্ছে। এইভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রকাশ করলেন।

(২) শ্রীগৌরাবির্ভাব

১৯৫৫ সালে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ আমাদের শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের শ্রীগৌড়ীয়-দর্শনে (১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যায়) একটি সুন্দর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ‘শ্রীগৌরাবির্ভাব’ নামে লেখে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধ নিম্নে প্রদর্শন করি :

পুন্যভূমি ভারতবর্ষ—শ্রীভগবান ও ভক্তগণের পদাঙ্কপূতস্থান—পৃথিবীর ধর্ম্মক্ষেত্র। সেই ভারতবর্ষের মধ্যে সপ্ত মোক্ষদায়িকাপুরী

বর্ত্তমান। তার মধ্যে মথুরা-মণ্ডলাভিন্ন শ্রীধামনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমায়াপুর। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাই লিখিয়াছেন—

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যাঁহা অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোসাঁই॥"

সত্যই শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান আর কোথাও নাই। যেহেতু অমন্দোদয়া-দয়ানিধি শ্রীগৌরহরি এই স্থানে জগতের অন্ধকার বিনাশপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া দেবদুর্লভ ভগবৎপ্রেম—যোগ্যাযোগ্য পাত্রাপাত্র বিচার-রহিত হইয়া আ-পামরে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছেন। সুতরাং নবদ্বীপের মহিমা জগতে বস্তুতঃই অতুলনীয়া।

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপ নগর বিদ্যাশিক্ষার প্রদান পীঠস্থান বলিয়া পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। মিথিলা হইতে আনীত তর্কশাস্ত্র, নবদ্বীপ মনীষার দ্বারা পুষ্ট হইয়া যশঃ সৌরভ বিস্তার করে। উত্তর ভারতান্তর্গত বারাণসী প্রভৃতি স্থান হইতে সন্ন্যাসী ও কৃতবিদ্য অধ্যাপকমণ্ডলীও ন্যায়-বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিবার জন্য আগমন করিতেন। দক্ষিণ ভারতান্তর্গত কাঞ্চী প্রভৃতি স্থান হইতেও বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপ নগরে পাঠার্থিরূপে আসিতেন।

"নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক—নাহিক নিশ্চয়॥"

সুতরাং বিভিন্ন দেশবাসী বিদ্যার্থিসমাজ নবদ্বীপে আগমনফলে নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রের চর্চ্চা এবং অসংখ্য অধ্যাপকগণের অবস্থিতি থাকায় নবদ্বীপ বিদ্যার্থিগণের সংখ্যাও অগণনীয় ছিল। বলিতে কি—“বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।”

সকলেই নিজেকে মহা-অধ্যাপক বলিয়া মনে করিত। এমন কি নবদ্বীপে অধ্যয়ন অধ্যাপনা না করিলে বিদ্বৎসমাজে তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠিত হইত না।

ঐশ্বর্য্যের দিক্ দিয়াও শ্রীনবদ্বীপ অতুল বৈভবের অধিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহে ঐশ্বর্য্যশালী লোকসমূহের নিবাসভূমি ছিল শ্রীনবদ্বীপ। একে গঙ্গাতীর তাহাতে মহান্ বিদ্যাপীঠ—সর্ব্বোপরি মহাতীর্থ শ্রীমায়াপুর,—তাই দেশ বিদেশ হইতে বহু ধনী ব্যক্তিগণ আসিয়া বসবাস করিতেন। শ্রীল বৃন্দবানদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥"
"রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বৈসে"—
"অবতরিবেন প্রভু—জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পন্ন করি থুইলেন তথা॥"

বস্তুতঃ পক্ষে যেখানে অসংখ্য লোকের বসতি, যেখানে বিভিন্ন দেশের ধনী সম্প্রদায়ের সমাবেশ, যেস্থান মহাতীর্থ ও মহাবিদ্যাপীঠ বলিয়া বিখ্যাত, সে স্থানের বৈভবের কথা না বলিলেও চলে।

কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে দুঃখের সীমা নাই। এমন যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধাম—সেখানে শুধু সকলেরই—"ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে"—এই অবস্থ দেখিয়া তাঁহারা কি সুখ-লাভ করিতে পারেন ! সকলেই ধন-মদে, রূপ-মদে, জন-মদে, বিদ্যা-মদে উন্মত্ত ও জড়-পাণ্ডিত্য-গর্ব্বিত। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার তাণ্ডবভূমি দেখিয়া ভক্তগণ তাই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। প্রাপঞ্চিক সুখে উন্মত্ত জনগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বিচারমূলে গ্রাম্য-ব্যবহার-রসে বৃথা কালাতিপাত,—ইহা ভক্তগণের অসহ্য। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ রামভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন-নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায়॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তাঁ-সবার মুখেও না শুনি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ—নাম উচ্চারয়॥

গীতাভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাঁহার জিহ্বায়॥
এইমত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার॥"
"কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহ 'কৃষ্ণ' বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাঁদিতে॥
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥"

তাদৃশ কৃষ্ণবিমুখ সমাজের মধ্যেও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বলোকধন্য সর্ব্বজনবন্দ্য ও সকল বৈষ্ণবের মুখপাত্র হইয়া বিরাজিত ছিলেন। বহির্ম্মুখ জগতের হিতাকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণপূজা প্রচারলীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। হরিবিমুখ জীবের দুরবস্থা তাঁহার হৃদয়কে বিশেষভাবে পীড়া দিতে লাগিল। ভক্তগণ সকলে প্রতিদিনই অদ্বৈতসভায় নিজ নিজ দুঃখ প্রকাশ করিয়া অজস্র রোদন করিতেন। করুণাবারিধি আচার্য্যও জীবদুঃখে অধীর হইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যা—

"আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাহিব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া॥"

অদ্বৈতের মহিমা ভক্তগণের অবিদিত ছিল না। তাই সকলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া আচার্য্যের আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। এদিকে অদ্বৈতাচার্য্যও নিরবধি গঙ্গাজল তুলসীদলে একচিত্তে গোলোকবিহারীকে মুহুর্ম্মুহুঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভগবানের আসন টলিল । ভক্তগণ ভগবদাহ্বান কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সমস্ত সুখসাচ্ছন্দ্য ও সাংসারিক ভোগ-ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন এবং তাই ভক্তগণের দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত ভগবানও প্রপঞ্চে অবতরণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এক কথা বোধ হয় না বলিলেও চলে যে—ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন, তখন স্বীয় পার্ষদ ও ধাম সহ-ই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাই ভগবানের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তাঁহার সকল সাচ্ছন্দ-বিধাতা শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপও সর্ব্বসুমঙ্গল বিস্তার করিতে করিতে রাঢ়দেশে অবতীর্ণ হইলেন।

* * * * * * * * *

শ্রীনবদ্বীপ ধামের মধ্যবিন্দু শ্রীমায়াপুর, তাই তাহার নাম অন্তর্দ্বীপ। সেই অন্তর্দ্বীপে পরম পণ্ডিত উদারস্বভাব বিশুদ্ধসত্ত্বের আশ্রয় শ্রীজগন্নাথমিশ্রের বসতি। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর। কি কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব নন্দ।
বসুদেব প্রায় তিঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর॥ সর্ব্বতত্ত্বময় জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র॥
উদার চরিত তেঁহ ব্রহ্মণ্যের সীমা। তাঁর পত্নী শচী-নাম মহাপতিব্রতা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥ মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥”

পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ দম্পতি অষ্টকন্যার তিরোধানের পর অলৌকিক সৌন্দর্য্যভূষিত শ্রীবিশ্বরূপ নামে একটি পুত্র লাভ করিয়া পরমানন্দে ভগবদারাধনা করিতে থাকেন। দিনে দিনে বিশ্বরূপও মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আঁধার জগৎ মঙ্গলালোকের বল লাভ করিতে লাগিল। ১৪০৬ শকে একটি বিশিষ্ট দিনে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র দেখিলেন—একটি পরমস্নিগ্ধ দিব্যজ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তাঁহার হৃদয় হইতে শ্রীশচীদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মিশ্র আনন্দে শিহরিত হইলেন এবং সেইদিন হইতে শচীদেবীও অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইতে থাকিলেন। মিশ্র সেকথা পরমানন্দে শচীদেবীকে জানাইলে তিনিও মিশ্রদেবের অধিকতর বিস্ময় জন্মাইয়া বলিলেন—’আমিও দেখি—আকাশে যেন দিব্য দিব্য মূর্ত্তি সব আমাকে লক্ষ্য করিয়া স্তব স্তুতি করিতেছে। চারিদিকেও আনন্দময়—জ্যোতির্ম্ময় লোক সমূহের গমনাগমন ইত্যাদি”—মিশ্র শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—

"হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়।"

আরও অধিকতর প্রযত্নে ব্রাহ্মণদম্পতি বিষ্ণুপূজা করিতে লাগিলেন।

* * *   * * *   * * *

১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথি সন্ধ্যাকাল—শ্রীগৌরহরির জন্মদিন। একে বসন্ত ঋতুর মনোরম সন্ধ্যা, তাহাতে পূর্ণিমা, তাহাতে আবার আজ চন্দ্রগ্রহণ। গঙ্গাতীরে, নগরীর পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র লোকে

লোকারণ্য—ঠেলাঠেলি—হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। দেখে মনে হয়, বুঝি চতুর্দ্দশ ভুবনের আর কোথাও কোন প্রাণী নাই। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। হরিধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে মুখরিত—প্রফুল্লিত। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সুমঙ্গলরাশী যেন এককালে উদিত হইয়া নবদ্বীপের শোভায় শোভান্বিতা হইতেছে। অভূতপূর্ব্ব হরিধ্বনি শ্রবণে ভক্তগণও অনেকেই গঙ্গাতীরে সমবেত হইয়াছেন। চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ করিয়া হরিনামের বন্যায় সমস্ত অমঙ্গলরাশি ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা নাই। গঙ্গাতীরের সকল লোকই ভাবিতেছে এত লোক কোথা হইতে আসিল ! আরও তো গ্রহণ হইয়াছে, কিন্তু এত লোক—এত হরিধ্বনি—এমন মত্ততা তো আর কখনো দেখা যায় নাই, শুনিও নাই !! সকলেই বড় সুখবোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কারণ যেন অস্পষ্টই রহিয়া গেল। তা হোক্—তবুও সকলেরই বড় ভাল লাগিতেছে। এমন কি যবনগণও হাস্য করিতে করিতে হিন্দুগণের সঙ্গে 'হরি হরি' বলিয়া রহস্য করিতেছেন।

"প্রসন্ন হইল দশদিক্ প্রসন্ন নদী-জল।"

পরম শুভদা সন্ধ্যারাণীও—

"সিংহ রাশী, সিংহ লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ॥"

সমূহে সুসজ্জিতা হইয়া প্রভুর আগমনী গীতি গান করিতে লাগিলেন,—

"হেনই সময় সর্ব্ব জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥"

শ্রীলরূপগোস্বামীপাদ গাহিয়াছেন—

"হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন॥"

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রেরর ভবনে—শচীর অঙ্গনে আনন্দের আর সীমা নাই। সমগ্র জগৎকে হরিনামের বন্যায় ভাসাইয়া অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের আজ উদয় হইয়াছে, তাই গগণের চন্দ্রদেবও লজ্জায় বদন আচ্ছাদন

করিয়াছেন। কেন করিবেন না ! যাঁর পদনখচন্দ্রের সুস্নিগ্ধকরুণালোক কোটীচন্দ্রের সুশীতলতাকেও ধীক্কার করে সেই গৌরচন্দ্রেরই যে উদয় হইয়াছে !! চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। কোটী শঙ্খনিনাদে দুন্দুভি বাজাইয়া দেবগণ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। ধরণীদেবী জয় জয় ধ্বনিতে আব্রহ্মস্তম্ভ মুখরিত করিয়া শ্রীগৌরহরির আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন। ভক্তগণ মনের অভিলাষ পূর্ণ হইল বলিয়া যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন। শঙ্খ-ঘন্টা-মৃদঙ্গ-করতালের মধুরধ্বনিকে আরও সুমধুর করিয়া যেন নেপথ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি ॥"

সেই গৌরহরির সকলই নিত্য। তাঁর নাম নিত্য, রূপ নিত্য, গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য সমস্তই নিত্য। তাঁর আবির্ভাব নিত্য, তাঁর তিরোভাবও নিত্য। ভাগ্যবানের বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়েই সেই নিত্যলীলা ভগবান নিত্যকাল বিলাস করেন। এ সমস্ত ক্ষুদ্র মানবমেধা ধারণা করিতে পারে না। তাই তাঁহাদের নিকট ভগবান্— 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্তের পরতত্ত্ব হইয়াও আচার্য্যরূপে আবির্ভূত। সাধু-গুরু কৃপাতেই নিত্যশুদ্ধ পূর্ণমুক্ত পরমতত্ত্বের সীমা শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা জ্ঞাত হইতে পারা যায়, এবং তখনই সেই মহৎকৃপালব্ধ ভাগ্যবান, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতকৃষ্ণস্বরূপ-গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব, হৃদয়ে অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন এবং তাঁহাদের নিকটেই—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥

এই উক্তি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ ॥"

(৩) শ্রীমায়াপুর-ধাম—অপূর্ব্ব-লীলা-ভূমি

এই মায়াপুর ধামে, এই শ্রীযোগপীঠে অনেক লীলাগুলো হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়লে আপনারা সব শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাগুলো সেখানে পাবেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

যখন নিমাই তিন বছর বয়স ছিলেন, তখন জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে একটু বেলার দিকে একজন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। ওঁর নাম উল্লেখ নেই কিন্তু কেউ বলে সেটা বোধ হয় মাধবেন্দ্র পুরীও হতে পারে।

শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের কাছে এসে ব্রাহ্মণটি বললেন, "প্রণাম, কিছু ভিক্ষা হবে?" জগন্নাথ মিশ্র হাত জোর করে বললেন, "আপনি অসময় এসেছেন, বাড়িতে এখন রান্নাবান্না হয় নি। কিন্তু আমার বাড়িতে না খেয়ে যাওয়া যায়? আমি এভাবে খালি মুখে আপনাকে ছাড়তে পারি না। আপনি কিছু রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ লাগিয়ে দেবেন?"

ব্রাহ্মণটি রাজি হলেন, " ঠিক আছে, তাই হবে।"

তখন রান্না করবার পর ভোগ লাগিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণটি যে মন্ত্রগুলো ভোগ লাগানোর সময় পড়তে হবে, সেই সব মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন কিন্তু হঠাৎ করে উনি দেখলেন : নিমাই এসে ভোগটা মুখে খেয়ে নিচ্ছেন !

অবাক হয়ে ব্রাহ্মণটি বললেন, "উঃ ! কোত্থেকে আসেছিস, দুষ্ট ছেলে?! তুই কী করছিস?! তুই ঠাকুরের ভোগ নষ্ট করেছিস !"

কিছু না বলে নিমাই এক্ষণই সেখান থেকে দৌড়িয়ে পালিয়ে গেলেন। গোলমালটা শুনে জগন্নাথ মিশ্র এসে ব্রাহ্মণটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হল? কি হল?"

ব্রাহ্মণটি বুঝিয়ে দিলেন, "আমি ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছি কিন্তু আপনার ছোটো ছেলে এসে একটু করে খেয়ে নিয়ে চলে গেল !"

জগন্নাথ মিশ্র অবাক হয়ে বললেন, "আমরা তো প্রত্যেক দিন ভোগ লাগাই—ও এরকম তো করে নি ! ...আপনি মনে কিছু করবেন

না। আমাদের অপরাধ হয়ে গেল। আপনি অতিথি, নারায়ণ আজকে এসেছেন—না খেয়ে চলে যাবেন না। আপনি আবার রান্না করুন না ? আমরা নিমাইকে পাহারা দেব।”

ব্রাহ্মণটি আবার রান্না করতে গেলেন। যখন দ্বিতীয়বার রান্নাবান্না শেষ করে উনি ঠাকুরের ভোগ দিতে গেলেন তখন জগন্নাথ মিশ্র দরজার সামনে বসে থাকলেন। ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে ব্রাহ্মণটি ভগবানকে নিবেদন করলেন, “প্রভু, তোমাকে অবেলায় খেতে দিচ্ছি—তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর।” এদিকে নিমাই আবার এসে ভোগটা মুখে দিলেন ! ব্রাহ্মণটি চিৎকার করলেন, “এটা কী ?! আবার এসেছিস ?!”

শুনে জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হল ? কি হল ?”

ব্রাহ্মণটি বললেন, “আপনার ছেলে আবার চলে এসেছে !”

“কি !?” রাগ করে জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। নিমাই এত দুষ্ট ! আবার দৌড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে উনি পাশের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলেন। জগন্নাথ মিশ্র লাঠি নিয়ে এসে বললেন, “দরজা খুলে দাও ! খুলে দাও !” বাবার রূষ্ট স্বরটা শুনে নিমাই ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, “বাবা আমকে মেরে ফেলবে !”

দেখুন—যার ভয়ে ত্রিভুবন কাঁপে সে আজকে তাঁর পিতৃ-মাতৃ ভয়ে কাঁপছে ! এটা হচ্ছে বাৎসল্য রস।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ (গীতা, ৪/১১)

“যে আমাকে ভজে যৈছে, আমি তাকে ভজি তৈছে—যে আমাকে আরাধনা করে, আমার তাকে সেই প্রকারে পুরাই মনের বাসনা।”

সেইভাবে, দ্বিতীয়বার ভোগ নষ্ট(?) হয়ে গেল। শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র কান্নাকাটি করতে লাগলেন, “হায় হায়, অতিথি বাড়িতে ডাকলাম আর আমাদের ছেলেটি দুষ্টামি করছি ! এখন কি হবে ?”

এদিকে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের বড় ছেলে বিশ্বরূপ এসে হাজির হল। উনি এসে বলছেন, “কী হয়েছে বাড়িতে ? এ সব কান্নাকাটি কেন ? কী হয়েছে ?”

বাবা-মা ওঁকে বললেন, "এই বিপ্রবর আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আমাদের এত বড় অপরাধ হয়েছে !" তখন ব্রাহ্মণটি বুঝিয়ে দিলেন, "আমি দু-দুবার রান্না করেছি কিন্তু তোমার ছোটো ভাই এত দুষ্ট—বারবার ও এসে ঠাকুরের ভোগ খেয়ে চলে যাচ্ছে।"

বিশ্বরূপ তখন বললেন, " ওঃ, আচ্ছা। প্রভু, মনে কিছু করবেন না। আমি ওর দাদা হই, ও আমাকে খুব ভয় পায় তাই আমি দরজা পাহারা দেব—দেখবেন, আমার ভয়ে ও আসবে না।"

তখন ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার রান্না করতে গেলেন। নিমাই শচীমাতার ঘরে শুতে গেলেন এবং সবাই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এবার সব ঠিক হবে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং রাত হয়ে এল—সব রান্নাবান্না শেষ করে ব্রাহ্মণটি আবার ঠাকুরকে ভোগ লাগিয়ে নিবেদন করলে চক্ষু বন্ধ করে মন্ত্রগুলো পড়তে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ ধরে মন্ত্র পড়তে পড়তে উনি প্রার্থনা করলেন, "হে প্রভু ! তোমার চরণে আমি অপরাধ করেছি। আজ দুপুরের ভোগটা রাত্রে দিচ্ছি... তোমাকে সারা দিন উপবাসেই রেখেছি... আমার অপরাধ ক্ষমা কর !" যখন সমস্ত মন্ত্র হয়ে গেল, তখন উনি আবার চক্ষুটা খুলে দিলেন এবং দেখছেন যে, থালার সব শেষ—নিমাই আবার সব খেয়ে নিয়েছেন ! ব্রাহ্মণটি ওকে তর্জন করে বললেন, "এই দুষ্ট ছেলে ! আবার এসেছিস !"

নিমাই তখন অবশেষে বললেন, "দেখ, তুমি আমাকে বারবার ডাকছ—দুপুরে ডেকেছ, বিকালে ডেকেছ, এখনও ডাকছ। আমি এই গভীর রাত্রে মায়ের কোলে ঘুমুচ্ছিলাম ! সারা দিন কিছু খাই নি। তুমি আমাকে বারবার ডেকে দিয়ে খেতে দিচ্ছ না আর—আমাকে খাওয়ানোর পরবর্তে তুমি আমাকে তাড়া দিচ্ছ ! আমি এত ক্ষিদায় ক্লান্ত হয়ে মায়ের কোলে শুয়ে পড়েছি। এখনও তুমি আমাকে আবার ডাকছ আর যখন আমি আসি, তুমি বলছ, 'কোত্থেকে আসছ ?! চলে যাও !' আমাকে দুষ্ট বল কিন্তু আমার কি ক্ষিদা পায় নি ? আমি খাব না ? তুমি আমাকে ডাকছ আবার তাড়া দিচ্ছ কেন ?!" ব্রাহ্মণটি অবাক হয়ে বললেন, "কী বলছিস তুই ? আমি তোমাকে ডাকব কেন ?"

“ওঃ, আমাকে ডাক নি ? তবে কাকে তুমি ডাকছ ?”

“নিশ্চয় ভগবানকে ডাকছি—ভগবান্ নারায়ণ বা বিষ্ণুকে ডাকছি !”

“ওঃ, ভগবানকে ডাকছ ? আমাকে ডাক নি ?”

তখন সঙ্গে সঙ্গে নিমাই ব্রাহ্মণটিকে ওঁর চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী রূপ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “আমি তো সেই ! সত্যযুগে আমি তোমাকে দর্শন দিয়েছিলাম, ত্রেতাযুগে আমি তোমাকে দর্শন দিয়েছিলাম, দ্বপারযুগেও আমি তোমাকে দর্শন দিয়েছিলাম। তুমি মহাভাগ্যবান—কলিযুগেও আমি তোমাকে দর্শন দিচ্ছি কিন্তু তুমি কাউকে বলবে না !”

ভগবানের কথা শুনে ব্রাহ্মণটি কৃষ্ণপ্রেম পেয়ে আর নবদ্বীপ ছেড়ে দিতে পারলেন না—উনি এই নবদ্বীপধামে যোগপীঠের পাশে গুপ্তভাবে থাকতেন এবং প্রতি দিন ভিক্ষা করতে গিয়ে নিমাইকে দেখে আসতেন।

* * * * * * * * *

এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিভিন্ন প্রকারের লোককে উদ্ধার করেছিলেন। একবার তিনি চোরকেও ছলনা করে উদ্ধার করেছিলেন। এই লীলা তিনি শিশুকালে প্রকাশ করলেন।

যখন নিমাই এসেছিলেন, তখন অনেক লোক জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে এসে অনেক দান-টান করেছিলেন। তাই শচীমাতা নিমাইকে হাতে বাজু, গলায় সোনার লকেট, পায়ে নূপুর ইত্যাদি পরিয়ে দিতেন।

এক দিন দুটো চোরের সেই অলঙ্কারগুলো দেখে লোভ হয়ে গিয়েছিল। যখন নিমাই খেলতে বেরিয়েছিলেন, তখন দুজন চোর এরকম চুরি করে বুদ্ধি করলেন—একটি চোর বলল, “আমি নেব পায়ের তা !” অন্য চোর বলল, “আমি নেব হাতের তা !” তখন নিমাইয়ের কাছে গিয়ে ওকে একটু মিষ্টি দিয়ে বলল, “আয়, আয়, সোনা, বাড়ি চলে যাই।” মিষ্টি দেখে নিমাই হাসতে লাগলেন আর চোরের মধ্যে একজন ওঁকে ধরে কাঁধে নিলেন। কাঁধে নিয়ে নিমাইকে মিষ্টি কথা বলতে বলতে যাচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে, “আরে কোন জায়গায় ওকে নিয়ে যাব ?

কোন বাঁশ বাগানে লুকিয়ে নিয়ে যাব আর সেখানে ওর জিনিসগুলো খুলে আবার ওকে ছেড়ে দেব।” এসব বুদ্ধি করতে করতে হঠাৎ ও দেখছে যে, রাস্তাটা খুঁজে পাচ্ছে না—নিজের বাড়িও খুঁজে পাচ্ছে না, বাঁশ-বাগানও খুঁজে পাচ্ছে না ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরতে ঘুরতে চোররা শেষ পর্যন্ত অবাক ও অবসন্ন হয়ে আবার হঠাৎ করে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি গিয়ে নিমাইকে নিয়ে এসেছিল।

এদিকে বাড়িতে খোঁজ পড়ে গেল—উদ্বিগ্ন হয়ে সবাই বললেন, “হায় হায় নিমাইকে কে নিয়ে গেল ? নিমাইকে কে নিয়ে গেল ?” এই ভিড়ের মধ্যে এসে নিমাইকে ছেড়ে দিয়ে চোররা পালিয়ে গেল। নিমাই এক্ষুণি শচীমাতাকে ডাকলেন—ছেলেকে দেখে শচীমাতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দিয়ে বললেন, “আমার ছেলেকে কে দিয়ে গেল ? কে দিয়ে গেল ? আমি তাকে পুরস্কার দিয়ে দেব !” চোরগুলো কি আর থাকে, বলুন ?

চোররা পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ওদেরকে ভগবান্ কৃপা করলেন—চোররা ভগবানকে(!) কাঁধে নিয়েছে। যে ভগবানকে স্পর্শ করে, ভগবানের নাম করে, ভগবানের কীর্ত্তন করে, ভগবানের সেবা করে—তাদের কখনই এই জগতে থাকতে হয় না, তাদের বারবার জন্মমৃত্যুজড়াব্যাধি ভোগ করতে এবং বারবার এই জগতে আসতে হয় না—তারা ভগবৎধামে চলে যায়।

*** *** ***

মাঝে মাঝে নিমাই ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে হেলাফেলা করতেন। তাঁর কৌতুকগুলো সহ্য করতে না পেরে সবাই জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার কাছে গিয়ে নিমাইয়ের অপব্যবহারের প্রতি নালিশ দিতেন।

কেউ বললেন, “জলের মধ্যে ও লোকের গায়ে পা দিয়ে জল তোলপাড় করে ! ও লোকের গায়ে জল থুতু দেয় ! আমরা ওকে ধরতে যাচ্ছি কিন্তু কেউ ওকে ধরতে পারে না !”

কেউ বললেন, “আমি গঙ্গাতীরে বসে ধ্যান করছি আর নিমাই আমাকে জল ফেলে দেয় !”

কেউ বললেন, “ও আমাদের পোষাক চুরি করে বা মেয়ের পোষাকের সাথে অদলবদল করে ! ওর লজ্জা নেই !” আর কেউ বললেন, “আমি নৈবেদ্য বস্তু ঠাকুরের আসনের সামনে রেখে দিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে গেলাম আর নিমাই এসে ঠাকুরের আসনের মধ্যেই রাজার মত বসে সব ভোগ খেয়ে নিল ! আমি ওকে ধমক দিলাম আর ও বলছে, ‘ব্যাপার কী? কলিযুগে আমি তো নারায়ণ ! তাই তুমি ভাগ্যবান্—যার জন্য তুমি এ সব ভোগ লাগিয়ে দিলে, সে সব ভোগটা নিয়েছে !’”

কেউ বললেন, “আমি গায়ত্রী করতে করতে গঙ্গার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম, নিমাই এসে আমাকে পা টান দিয়ে ডুব দিল !”

কেউ বললেন, “ও আমার ভগবদ্গীতা সব সময় চুরি করে !”

কেউ বললেন, “ও আমার ধুতি চুরি করে !”

কেউ বললেন, “ও আমার ছোট শিশুর কানে জল ফেলে দেয় !”

আর সব চেয়ে বড় নালিশ ছিল মেয়েদের কাছে :

মাঝে মাঝে বাচ্চা বয়সে মেয়েরা—নয়-দশ, বারো-চৌদ্দ বছরের মেয়েরা—আতপ-চাল, কলা প্রভৃতি নিয়ে গঙ্গায় পূজা করতে যেতেন। সবাই মেয়েরা দৃঢ় প্রয়াসে সব নিয়মকানুন ঠিক মত মেনে পূজা করতে যাচ্ছিল কিন্তু নিমাই সেখানে এসে কখনো মেয়েদের মুখে জল ছিটিয়ে দিতেন, কখনো মেয়েদেরকে রাস্তা বন্ধ করে বললেন, “কোথায় যাচ্ছ? আমারই পূজা কর !” (এর অর্থটা কী? ভগবানের পূজা করলে সব পূজা হয়ে যায়।)

মেয়েরা বয়সে বড় হয়ে বললেন, “আরে নিমাই ! কি ব্যাপার? আমরা গ্রাম-সম্পর্কে তো তোর দিদি হই। আর তুই দিদির সঙ্গে এরকম দুষ্টামি করছিস কেন?”

তখন গঙ্গা পূজার ঘট পট ফেলে দিয়ে নিমাই বললেন, “গঙ্গা পূজা করলে কী লাভ হয়? আমার পূজা কর ! আমার এখন খিদে পেয়েছে—আমাকে প্রসাদ দাও !” সবাই বিরক্ত হয়ে কিছু না দিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। তখন নিমাই ওদের পিছনে বললেন, “যদি আমাকে কিছু না দাও, সাত সতীনের ঘর করবি আর বুড়ো পতি

পাবি !” তখন মেয়েরা ভয় পেয়ে বললেন, “হে বাবা ! কী অভিশাপ দিল ! তাড়াতাড়ি দিয়ে দিই !”

এসব লোকের কথা শুনে শচীমাতা সবাইকে মিষ্টি কথা দিয়ে সান্ত্বনা প্রদান করতেন আর একবার জগন্নাথ মিশ্র রেগে গিয়ে গঙ্গায় চলে গেলেন নিমাইকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। যে নিমাইয়ের ক্রুদ্ধ বাবা গঙ্গায় যাচ্ছেন দেখে, কেউ নিমাইকে এ জানিয়ে দিলেন আর নিমাই বন্ধুগণকে বললেন, “যদি বাবা আমার কথা জিজ্ঞাসা করবেন, বল যে, আমি এখনও গঙ্গাস্নানে আসি নি !”—আর অন্য পথ দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়ির পথে উনি গায়ে ধূলি মাখিয়ে মুখে কালি ছিটিয়ে দিলেন এবং বাড়িতে এই অস্নান অবস্থায় ফিরে হাজির হলেন।

এদিকে জগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাতীরে এসে বালকগণের মুখে শুনলেন যে, নিমাই এখনও আসেন নি, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যে সেই দিন নালিশ করতে গিয়েছিলেন, বললেন যে, নিমাই বাপের ভয়ে পালিয়ে গেলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ক্রোধ দেখে ওরা বললেন, “এই জগতে তোমার ভাগ্যের তুলনা নেই ! এর মত পুত্র পেয়ে তুমি মহাভাগ্যবান ! কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করেও, তবুও আমরা ওকে সব সময় হৃদয়ে রাখব !” ব্রাহ্মণগণের কথা শুনে জগন্নাথ মিশ্র ক্রোধ ছেড়ে দিয়ে বললেন, “ও আপনাদেরও পুত্র, তাই আপনারা ওর অপরাধ ক্ষমা করুন।” এই ভাবে মিষ্টি কথা বলতে বলতে জগন্নাথ মিশ্র তারপর বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়ি ফিরে এসে জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে দেখে কোলে নিয়েও ওকে আলিঙ্গন করে সব বাহ্য ঘটনা ভুলে গিয়েছেন।

পরে, যখন নিমাই আবার গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন, তখন শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র বললেন, “এই বিশ্বম্ভর বুঝি মানুষ নয় ! ওর লীলা দেখে আমাদের মনে হয় যেমন স্বয়ং কৃষ্ণ আমাদের বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করলেন !”

সেরকম নিমাই ওঁর ভক্তগণের সঙ্গে অনেক লীলা করেছিলেন। এই শ্রীগৃহে উনি বিবহের লীলাও করেছিলেন—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ওঁর সহধর্মিণী হয়েছিল। অনেক ঘটনা এখানে

হয়েছিল। অবশেষে, যখন নিমাই বিশ্বম্ভর ২৪ বছর বয়স ছিলেন, তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে ঠিক করলেন। এই গৃহে যখন শেষ রাত্রে সবাই ভক্তগণ মিলাইল, তখন তিনি সবাইকে চরম উপদেশ দিয়েছিলেন :

যদি আমা'-প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিকে না গাইবে আর ॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥

সেই জন্য, এখানে এসে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবেঃ

গোরার আমি, গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥

আপনারা তিলক, গলায় মালা পরে লোককে দেখিয়ে দেন যে, আপনি ভজন করছেন কিন্তু গোপনে নিজেকে ভক্তির প্রতিকূল কার্য্যে নিযুক্ত করে থাকেন—এটা হবে না। আমাদের ঠিক মত ভজন করতে হবে—যে পারমার্থিক নিয়মকানুন আছে, সেগুলো আমাদের মানতে হবে ; যে সেবা গুরুদেব আমাদের দিয়েছেন, সে সেবায় আমাদের সব সময় নিজেকে নিযুক্ত করে থাকতে হবে।

আমরা মহাপ্রভু থেকে কোন গ্রন্থ পাই নি কিন্তু যে শিক্ষাষ্টক ও যে উপদেশ মহাপ্রভু বলে দিয়েছিলেন, সেখানে আমরা আমাদের জীবনে চরম উপদেশ পাই :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥

ভাবের ঘরে চুরি করবেন না। শুধু মুখে বলে, "ক্ষ্যাপা ছেড়ে দিলে সোনার গৌড়, আর তো পাব না—তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না"—হবে না ! হৃদয় দিয়ে গৌরকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসা হৃদয় থেকে আসে। লোক দেখানোর জন্য ভালোবাসা ভালোবাসা নয়। আসল ভালোবাসা হৃদয় থেকে আসতে হয়।

তাই আপনাদের কাছে আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনারা 'গৃহে থাকুন বনে থাকুন' সব সময় মহাপ্রভুর জন্মস্থান, মহাপ্রভুর ভক্তগণ, মহাপ্রভুর দিব্যবাণী ও অপূর্ব্ব লীলাগুলো মনে রাখবেন।

শ্রীনিমাই বিশ্বম্ভর কি জয়। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীশচীমাতা কি জয়
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুরধাম কি জয়। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কি জয়

কবে হবে বল, সে দিন আমার।
(আমার) অপরাধ ঘুচি' শুদ্ধ নামে রুচি
কৃপা-বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার ॥

তৃণাধিক হীন কবে নিজে মানি,
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি'।
সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হয়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার ॥

ধন জন আর কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ-সুখকরী।
জন্মে জন্মে দাও ওহে গৌরহরি,
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ॥

(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ
পুলকিত দেহ গদগদ বচন।
বৈবর্ণ্য-বেপথু হবে সংঘটন
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার ॥

কবে নবদ্বীপে সুরধুনী-তটে
'গৌর-নিত্যানন্দ' বলি' নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাইয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি' দয়া
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ- চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ॥

কিনিব লুটিব হরি-নাম-রস,
নাম-রসে মাতি' হইব বিবশ।
রসের রসিক-চরণ-পরশ
করিয়া মজিব রসে অনিবার ॥

কবে জীবে দয়া হইবে উদয়,
নিজ সুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয়।
ভকতিবিনোদ করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার ॥

শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীযোগপীঠ থেকে প্রায় ৩০০ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে হচ্ছে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ বা অঙ্গন। শাস্ত্রে বলা হয় যে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চারটা জায়গায় সব সময় থাকেন : শ্রীশচীমাতার রন্ধনশালায়, নিত্যানন্দ-নর্তনে, শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গনে এবং শ্রীরাঘবের ভবনে।

এই শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গনে চারজন ভ্রাতা বসবাস করতেন—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। তাঁদের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতের মহাপ্রভুর প্রতি বিশেষ ভক্তি, টান ও আদর ছিল। যে দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপধামে আবির্ভূত হলেন, সেই দিন থেকে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রভুর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ ও গভীরভাবে সম্বন্ধ প্রকাশিত হল।

চাপাল গোপালের কপাল

এই শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর ধামে মহাপ্রভু এক বার সারা বছর ধরে প্রতি দিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন করতেন। এই অন্তরঙ্গ গূঢ় কীর্ত্তনে সবাই প্রবেশ করতে পারলেন না—মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে শ্রীবাস পণ্ডিত রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করতেন, তারপর কীর্ত্তন শুরু করলেন।

বাহিরের দুষ্ট ছেলেরা মদ খেয়ে উৎপাত দুষ্টামি করতেন—যখন শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে বসে কীর্ত্তন করতেন, তখন বদমায়েশ লোকগুলো মদ-মাংস খেয়ে মাংসের হাড়গোড়গুলো ও মদের বোতলগুলো দরজার সামনে রেখে দিয়ে যেত। ওরা ভাবত : সবাই লোকগুলো দেখবে যে, লোকটা সারা দিন কীর্ত্তন করে, হরিকথা বলে আর রাতের বেলায় মদ খায়—ওঁকে বদনাম দেওয়া হবে। শ্রীবাস পণ্ডিত কিছু বলতেন না—সব চুপ করে সহ্য করে প্রতিহিংসা করতেন না।

তবু এক রাতে একজন ব্রাহ্মণ চাপাল গোপাল নামে শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে এসেছিলেন এবং এরকম বদমাশি করেছিলেন—উনি দরজার সামনে দুর্গাপূজার জিনিসগুলো (সিন্দূর, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, তণ্ডুল, ইত্যাদি) এবং মদের বোতল রেখে দিলেন। সকাল বেলায় উঠে শ্রীবাস পণ্ডিত দরজা খুলে জিনিসগুলোটা দেখতে পেয়ে সবাই বয়স্ক লোককে ডেকে বললেন, "দেখুন ! দেখুন ! আমার কী ভীমরতি হয়েছে ! আমার কী দুর্দ্দৈব হয়েছে ! আজকে আমি কীর্ত্তনও করি আবার মদও খাই !" বয়স্ক লোক সবাই বললেন, "হায় হায়, আপনি এত ভদ্র বৈষ্ণব। এই দুর্বুদ্ধি কার হল—কে এ করল ? এত বড় অপরাধ করলে এর দশা এখন কী হবে ?"

তিন দিন পর এই চাপাল গোপালের কুষ্ঠ ব্যাধি হয়েছিল। উনি মায়াপুর ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাতীরে একাই বসবাস করতে লাগলেন।

এক দিন মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন আর চাপাল গোপাল পথে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "বাবা, তুমি সবাইকে

উদ্ধার কর, তুমি সবাইকে কৃপা কর, তুমি সবাইয়ের আত্মীয়—আমাকে কি উদ্ধার করবে না ?”

ওর কথা শুনে মহাপ্রভু ভীষন রেগে গিয়ে বললেন, “তুমি শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীচরণে অপরাধ করেছ ! আমি তোমাকে এই মতো জন্মজন্মান্তরে কীড়ায় খাওয়াইমু ! তুমি কোটী জন্ম রৌরবে বসে থাক !” সেটা বলে মহাপ্রভু চলে গেলেন—উনি এই পাপী ও পাষণ্ডীকে কৃপা করলেন না।

কয়েক বছর পর যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে এক দিন কুলিয়ায় ফিরে এলেন, তখন এই চাপাল গোপাল মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তখন ওকে বললেন, “আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না। শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীচরণে যদি তুমি ক্ষমা চাও, তাহলে তোমার অপরাধ খণ্ডন হবে, এই সব ব্যাধিও ভালো হবে।”

হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥

ভগবানের চরণে অপরাধ করলে রেহাই পাওয়া যায় কিন্তু বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করলে কখনও রেহাই পাওয়া যায় না। এই জন্য, সব সময় ভাবতে হবে গুরু-বৈষ্ণবের চরণে যেন আমাদের অপরাধ না করি। গুরু-বৈষ্ণবের চরণে প্রণাম করতে হবে, তাঁদের দোষ দেখলে হবে না।

* * *   * * *   * * *

মুকুন্দ দত্তের ঐকান্তিক বিশ্বাস

এক দিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করতে করতে কৃষ্ণপ্রেমে বশীভূত হয়ে সমস্ত ভক্তগণকে হঠাৎ করে বললেন, “আমার চক্ষের দিকে তাকিয়ে বলে দাও যে যার বাসনা আছে—আজ আমি তোমাদের সব ইচ্ছা পূর্ণ করব !” ভক্তগণ সবাই আনন্দিত হয়ে বিভিন্ন অভীষ্ট বর পেলেন। মহাপ্রভু এক এক ভক্তের নাম বললেন এবং আশীর্বাদ দিলেন, “তোর কৃপা হবে,” “তোর কৃপা হবে,” ইত্যাদি। কিন্তু একজন ভক্তের নাম মহাপ্রভু বলেছিলেন না। এই ভক্ত ছিলেন শ্রীমুকুন্দ দত্ত। তিনি

ভালো কীর্ত্তন করতেন, তবুও তাঁর নাম মহাপ্রভু বলেছিলেন না। ওই সময় মুকুন্দ দত্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে একটি পর্দার পিছনে বসে অপেক্ষা করলেন, "কখন প্রভু আমার নাম বলবেন?"—তিনি লজ্জা পেয়ে নিজে মহাপ্রভুর সম্মুখে যেতে পারলেন না। শেষে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, তুমি আজকে সবাইকে কৃপা করেছ, কিন্তু মুকুন্দের নাম কেন বল নি? ও এখানে বসে আছে কিন্তু তুমি ওকে না ডাকলে ও নিজে আসবে না।" মহাপ্রভু উত্তরে বললেন, "আমি ওর নাম বলব না কারণ ও খড়জাঠিয়া !"

খড়জাঠিয়া মানে কী? মুকুন্দ দত্ত কোন সময় দন্তে তৃণ ধারণ করে স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করেন এবং কোন সময় মহাপ্রভুকে আক্রমণ করেন—ওঁর বিচারে ওঁর এক হস্ত মহাপ্রভুর পাদদেশে, অপর হস্ত মহাপ্রভুর গলদেশে অবস্থিত। যখন অসুবিধা পান, উনি মহাপ্রভুর অনুগত্যে থাকেন, আবার মাঝে মাঝে মহাপ্রভুকে নিন্দাও করেন। বিচার বিনা মুকুন্দ সব সম্প্রদায়ে যেতেন, আর যে যথায় যেতেন, তথায় লোকের সঙ্গে মিশিয়ে অকথা কুকথা বলতে লাগলেন। তাই মহাপ্রভু বললেন, "যখন ও অন্য সম্প্রদায়ে যায়, ও তখন আমার গায়ে জাঠি (লাঠি) দিয়ে মারছে। যে বলে যে, ভক্তির চাইতে আর কিছু বড় আছে, সে আমাকে লাঠি দিয়ে মেরে থাকে। ওকে কোন বর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না ! কারণ ও ভক্তির প্রতি অপরাধ করেছে, ও আমাকে দেখতে পারে না।"

পর্দার পিছনে বসে এই কথা শুনে মুকুন্দ ভাবলেন, "হায় কপাল, আমি এত দুর্ভাগা। আমি আজই আত্মহত্যা করব—প্রভুর দর্শন পেতে না পেরে, এই জীবন বৃথা। আমি সব সময় মহাপ্রভুর জন্য গাই, উনি আমার প্রাণনাথ। ওঁর বিনা আমি কি করে চলব? উনি যদি আমাকে পছন্দ করেন না, উনি যদি আমাকে কৃপা প্রদান না করবেন, আমি কিসের জন্য বাঁচব?" তখন, শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডেকে মুকুন্দ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "হে ঠাকুর, কৃপা করে প্রভুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন কবে আমি ওঁকে দেখব?"

মুকুন্দের অবস্থা দেখে সমস্ত ভক্তগণ অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন, তাই শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, তাই ওর কি কখনও কৃপা হবে না ?”

“হবে। কোটী জন্ম পরে হবে—ওকে এই জগতে কোটী বার আসতে হবে, তারপর ওর কৃপা হবে।”

শ্রীবাস পণ্ডিত ভাবলেন, “হায় পোড়া কপাল ! ও এত ভালো সুন্দর কীর্ত্তন করে, ওর কীর্ত্তন শুনে মহাপ্রভু আনন্দ পায়—ওরই যদি কোটী জন্ম লাগে, আমাদের দশাটা কী হবে ?” কিন্তু মহাপ্রভুর কঠোর কথাগুলো শুনে মুকুন্দ একবার দিগম্বর হয়ে নাচতে আরম্ভ করলেন ! উনি বলতে থাকলেন, “আমি প্রভুকে পাব ! আমি প্রভুকে পাব ! কোটী জন্ম পরেও, তবু পাব, এক দিন তো পাব !” সবাই ভক্তগণ অবাক হয়ে গেলেন, “প্রভু বলছেন যে, ও কোটী জন্ম পরে কৃপা লাভ করবে আর ও নাচে আনন্দ করছে ! কিরকম সাধু ও ?”

ওঁর ব্যবহার দেখে, মহাপ্রভু খুশি হয়ে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন, “ঠিক আছে, ওকে ডেকে নিয়ে এস !”

শ্রীবাস পণ্ডিত মুকুন্দকে ডাকতে গেলেন, কিন্তু মুকুন্দ বললেন, “না, না। প্রভু বললেন যে, আমি কোটী জন্ম পরে ওঁর দর্শন পাব—যদি আমি ওঁর কাছে এখন যাব, আমি ওঁর দর্শন পেতে পারব না—আমি শুধু মায়া দেখব।”

যখন শ্রীবাস পণ্ডিত মুকুন্দের কথা মহাপ্রভুকে বললেন, মহাপ্রভু আরও খুশি হলেন। উনি বললেন, “চমৎকার ! ওর এত দৃঢ় বিশ্বাস ! ওকে বল যে, ওর কোটী জন্ম হয়েছে—ওর আর অপেক্ষা করতে হবে না। ওকে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে এস !”

তখন মুকুন্দ এসে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়লেন। মহাপ্রভু ওকে বললেন, “উঠো, আমার মুকুন্দ, উঠো ! তোমার কোন অপরাধ নেই ! তুমি আমার কথা শুনে এত বিশ্বাস করেছ, আমি তোমার হৃদয়ে চিরকাল বেঁধে থাকব ! তুমি আমার প্রিয় গায়ক, তুমি আমার সঙ্গে সব সময় থাকো। আমি তোমার সঙ্গে শুধু পরিহাস করছি।”

এই কথা শুনে অত্যন্ত দৈন্য ভাবে নিজেকে ধিক্কার করে মুকুন্দ কাঁদতে শুরু করলেন।

এই রকম বিশ্বাস আমাদেরও থাকতে হবে। যে মহাপ্রভু বলেন, যে কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেন, আমাদের তার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। আসলে আমরা মহাপ্রভুকে জানি না, কৃষ্ণকে জানি, কিন্তু আমরা আমাদের গুরুদেবকে জানি, তাই গুরুদেবের সেবা করলে (নিজের স্বার্থের জন্য নয়, কেবল গুরুদেবের স্বার্থের জন্য), গুরুদেবের শরণাপন্ন হলে, তাহলে আমরা কৃপা লাভ করতে পারি। আপনাদের নিজের চিন্তা করতে হবে না—কৃষ্ণের চিন্তা করলে, কৃষ্ণ আপনাদেরকে দেখবেন। এই বিশ্বাস থাকতে হবে।

* * *   * * *   * * *

ভাগ্যবতী দুঃখী

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এসেছিলেন। সব সময় সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু ভক্তভাবে নৃত্য কীর্ত্তন করতেন, কিন্তু সেই দিন তাঁর ভাব অন্যরকম ছিল—সেই দিনে তিনি নিজের ভগবৎস্বরূপ গোপন না করে বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট থাকলেন এবং ভক্তগণকে বিশেষ কৃপা প্রদান করবার জন্য ঘোষণা করলেন, “আজ আমার অভিষেক হবে।” শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে একজন দাসী ছিলেন, ওঁর নাম ছিল দুঃখী—শ্রীবাস পণ্ডিত ওঁকে তাড়াতাড়ি গঙ্গায় গিয়ে জল আনতে বলে দিয়েছিলেন। ওই সময় কোন টিউবওয়েল ছিল না, সুতরাং লোক সব সময় পুকুর বা গঙ্গা থেকে জল আনতেন। তাই, ওই আদেশ পেয়ে দুঃখী গঙ্গাজল আনতে শুরু করলেন। যতক্ষণ মহাপ্রভু আনন্দে নেচে কীর্ত্তন করলেন, ততক্ষণ দুঃখীর আর কোন কাজ ছিল না—উনি শুধু মহাপ্রভুর অভিষেকের জন্য কাঁদতে কাঁদতে গঙ্গা থেকে ঘট ভরে জল বহন করলেন। জল নিয়ে এসে সজল নয়নে মহাপ্রভুর নৃত্য দেখলে উনি ক্ষণকাল আবার গঙ্গায় জল আনতে গেলেন। ওঁর ক্লান্ত নাই, অবসাদ নাই, হৃদয় সব সময় শুধু আনন্দে ভরপুর—পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহন করে এনে দুঃখী জলের ঘট সারি

দিয়ে রাখলেন আর মনে মনে ভাবলেন, “আমি প্রত্যেক দিন জল এনি কিন্তু আজকে স্বয়ং প্রভুকে স্নান করবার জন্য জল আনতে হবে। কী আমি ভাগ্যবতী !” দুঃখীর একান্তচিত্ত আর্ত্তি এবং অক্লান্ত সেবা লক্ষ্য করে মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

একদিন তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, “শ্রীবাস, প্রত্যেক দিন কে গঙ্গাজল বহন করে আনে ?”

শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন, “সব জল দুঃখী নামে একজন দাসী আনে।”

“ওকে ডেকে নিয়ে এস।”

শ্রীবাস পণ্ডিত দুঃখীকে ডাকলেন আর যখন উনি এসেছিলেন—উনি আবার কাঁদতে শুরু করলেন—তখন মহাপ্রভু ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কাঁদছ কেন ? তোমার কিসের দুঃখ ?”

শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন, “সে আনন্দে কাঁদছে ! তোমাকে দেখে ওর সব সময় আনন্দে চোখের জল আসে !”

তখন মহাপ্রভু বললেন, “আচ্ছা, তোমার নাম কী ?”

“দুঃখী।”

“কে বলল তোমার নাম দুঃখী ? আজ থেকে তোমার নাম সুখী !”

এইভাবে ওঁর মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে গেল। উনি মহাপ্রভুর কৃপা সেবা দ্বারা পেয়েছিলেন—ওঁর কোন বিদ্যা নাই, কোন ধন-দৌলত নাই, উনি লেখাপড়া করেন নি, উনি কিছু জানেন না কিন্তু সরল সেবা দ্বারা উনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছিলেন।

অন্য সময় একজন দরজী যে শ্রীবাস পণ্ডিতের পোষাক সেলাই করতেন, যবন হয়েও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছিলেন। এক দিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে এসে সবাইকে ডাকতে লাগলেন, “আয়, সবাই আয়—যে যে আছো, সবাই আয় !” তখন ওই দরজী শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে ছিলেন আর মহাপ্রভুকে দেখে তার এত বড় আনন্দ হল যে তিনি কাঁদতে কাঁদতে ভাবতে লাগলেন, “হায় হায়

আমি এই যবনকুলে কেন জন্মেছি?! কেন আমি হিন্দুকুলে জন্মাই নি? যদি আমি হিন্দুকুলে জন্মাতাম, তখন আমি মহাপ্রভুর সেবা করতে পারতাম!" মহাপ্রভুকে শুধু মাত্র একবার দেখলেই তিনি মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছিলেন।

সেইরকম সরল মন ও দৃঢ় বিশ্বাসের ফল হয়।

*** *** ***

'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'র কথা

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে আর একজন আশ্চর্যভাবে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছিলেন—ওঁর নাম নারায়ণী, উনি ছিলেন একটি ছোট মেয়ে, শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাইঝি। উনি ছোটবেলা থেকে মহাপ্রভুর পরম আশীর্বাদ পেয়েছিলেন।

এক দিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন। হঠাৎ মহাপ্রভুর সামনে এগিয়ে গিয়ে নারায়ণী হাত পাতলেন। উনি তখন ৩-৪ বছর বয়স ছিলেন। মহাপ্রভু ওঁকে কিছু প্রসাদ দিয়ে বললেন, "এখন কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণ নাম কর!" মহাপ্রভুর আজ্ঞার প্রভাবে নারায়ণী তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদতে শুরু করলেন।

আর এক সময় শ্রীবাস পণ্ডিত ও ভক্তগণের রাত্রি কীর্ত্তন শুনে আশেপাশের লোকগুলো হিংসা করে ও বিরক্ত হয়ে নালিশ করতে লাগলেন—ওরা বললেন, "এটার জ্বালায় রাত্রে ঘুমোতে পারি না! ওরা সারা দিন সারা রাত কীর্ত্তন করছে! এই কীর্ত্তনটা বন্ধ করতে হবে, নাহলে নিমাইকে মারতে হবে আর শ্রীবাসের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে!" এসব কথা শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত কীর্ত্তন বন্ধ করে দিলেন। ওই দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আরে শ্রীবাস, কী হয়েছে? তোমাদের কীর্ত্তনটা বন্ধ হল কেন?"

শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন, "তুমি আগে বস। চিন্তা কর না, বস।"

"বসব কেন? কীর্ত্তন কেন বন্ধ হল? বলে দাও।"

"মাথা গরম করবে না, বস। পাড়ার ছেলেগুলো বলছে যে, আমার ঘরবাড়ি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে, আমার এটায় আপত্তি নেই,

কিন্তু ওরা বলছে যে, ওরা তোমার গায়ে হাত দেবে—তোমার গায়ে হাত দিলে কী করে হবে ?”

মহাপ্রভু বললেন, “তাই না কি ?” তখন উনি নিজের সিদ্ধি দেখিয়ে দিলেন—উনি নারায়ণীর মাথায় একটু হাত দিয়ে আশীর্বাদ দিলেন, “তোমার কৃষ্ণভক্তি হোক !” আর নারায়ণী তখন একবারে ‘হা কৃষ্ণ ! হা গৌর !” বলে মেঝেতে গড়াগড়ি যেতে লাগলেন । তখন মহাপ্রভু সব ভক্তগণকে বললেন, “তোমাদের কি এখন ত বিশ্বাস হয় ? তোমার ঘরবাড়ি কি কেউ ভেঙ্গে দিতে পারবে ?”

সবাই সেটা স্বীকার করলেন এবং আর কীর্ত্তন বন্ধ করলেন না ।

এই সব হিসাবে নারায়ণী ‘গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী’র নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন আর কিছু বছর পরে শ্রীবাস পণ্ডিতের সহধর্মিণী মালিনী দেবীর বাবার বাড়ী মামগাছিতে ঘটকালি দ্বারা নারায়ণীকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল । তারপর ওঁর গর্ভে পরমবৈষ্ণব শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । সেই রকম ছিল ওঁর ভাগ্য ।

* * *   * * *   * * *

শ্রীমালিনী দেবীর চরিত্র

মালিনী দেবীর কথা বলতে গিয়ে আমাদের ওঁর সম্বন্ধে আরো কিছু কথা মনে পড়ল ।

একবার বিশ্বরূপ প্রভু (নিমাইয়ের দাদা) শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে এসে হাজির হলেন । ওঁর বয়স তখন ১৩-১৪ বছর ছিল । এসে উনি শ্রীবাস পণ্ডিতের সাহায্য চাইছিলেন, “প্রভু, আমার একটি বই দরকার, আমি আশা করলাম, আপনার কাছে ওই বইটা পাব ।” (ওই সময় যবনরা হিন্দু গ্রন্থ পুড়িয়ে দিতেন কাজে সব গ্রন্থ সহজে পাওয়া যেত না ।) শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন, “যে বই তোমার দরকার, সেই বইটা আমি ত্রীপুরায় (হিন্দু অঁঞ্চলে) পাঠিয়ে দিয়েছি ।” তখন মালিনী দেবী ঘরে এলেন আর বিশ্বরূপকে দেখে ওঁকে অনেক আদর করতে লাগলেন । শ্রীবাস পণ্ডিত দুঃখ করে মালিনী দেবীকে বললেন, “বিশ্বরূপ এসেছে কিছু সাহায্য চাইতে কিন্তু আমি ওকে সাহায্য

করতে পারি নি।” তখন চট করে মালিনী দেবী বললেন, “তুমি কি করে ওকে সাহায্য করবে? তুমি সব সময় কীর্ত্তনে ব্যস্ত থাক! তুমি শুধু অদ্বৈতাচার্য্যের পাঠে যাও, অপরকে সাহায্য করা দূরের কথা তুমি নিজের সংসারকেও দেখতে পার না! কি করে তুমি অপরকে সাহায্য করতে পারবে? তুমি সংসারী লোক নও।” বিশ্বরূপের সামনে উনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে এই ভাবে বকাবকি করল। এই গরম কথা শুনে বিশ্বরূপ লজ্জা পেয়েছিলেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত বিশ্বরূপকে বললেন, “দেখেছিস, বিশ্বরূপ? আমি কী একে বলেছি আর এ আমাকে কী বলছে? এখন তুমি দেখছ কিরকম সংসার তো। এই সাংসারিক জীবন শুধু বড় সমস্যা! তুমি কখনও বিয়ে কর না!” আসলে ওই সময় বিশ্বরূপের বিয়ের সম্মন্ধ এসেছিল—বাবা-মা এখনই একটি মেয়েকে ওঁর জন্য দেখেছিলেন কিন্তু বিশ্বরূপ সব সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা মনে করতেন আর অবশেষে কিছু দিন পরে উনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। এই রকম ভাব ওঁর কাছে এসেছিল।

মালিনী দেবীর সব ভক্তের প্রতি মায়ের মত ভাব ছিল—বিশেষভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি। এক দিন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। ওই সময় মালিনী দেবী পূজা-অর্চ্চনে ব্যস্ত ছিলন। হঠাৎ একটি কাক জানালা দ্বারা এসে ঠাকুরের পিতলের বাটি নিয়ে উড়ে চলে গেল! মালিনী দেবী ভয়ে কাঁদতে শুরু করলেন, “শ্রীবাস পণ্ডিত জানতে পেলে আমাকে বকাবকি করবে!” তখন নিত্যানন্দ প্রভু এসে ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী হল, মা?” মালিনী দেবী বুঝিয়ে দিলেন কী হয়েছিল আর নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, “কোন চিন্তা কর না, আমি বাটিটা ফেরাব!” তখন নিত্যানন্দ প্রভু হাস্যমুখে চিৎকার করলেন, “শুন রে কাক! বাটিটা ফিরিয়ে দাও!” তখন মালিনী দেবী দেখলেন—কাকটি আসলে ফিরে এসে বাটিটা ঘরে রেখে দিয়ে আবার উড়ে চলে গেল। উনি ভাবলেন, “নিতাই সাধারণ মানুষ নয়!” তখন উনি নিত্যানন্দ প্রভুর স্তব করতে

লাগলেন—ওঁর কথা শুনে নিত্যানন্দ প্রভু হাসিমুখে বললেন, “আমার খিদে পেয়েছে।” তখন মালিনী দেবী বাৎসল্য রসে বিভোরিত হয়ে ওঁকে খাওয়াতে লাগলেন—নিত্যানন্দ প্রভু নিজ হাতে প্রসাদ নিতেন না, মালিনী দেবী ওঁকে মায়ের মত সব সময় খাওয়াতেন।

নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী দেবীকে সব সময় পিতা-মাতা-বুদ্ধিতে দেখতেন এবং মালিনী দেবীও সব সময় ওঁকে নিজের সন্তানের মত দেখতেন। মাঝে মাঝে নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখা মাত্র মালিনী দেবীর স্তনের দুধ পড়তে লাগল—ওঁর দুধ ছিল না কিন্তু বাৎসল্য রসের প্রভাবে স্তনের দুধ পড়তে লাগল এবং নিত্যানন্দ প্রভু শিশুর মত এই দুধ পান করতেন।

উপরন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলা হয় যে, মালিনী দেবী সব সময় নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলা দেখতে পেতেন কিন্তু মহাপ্রভু ওঁকে আদেশ দিলেন, “কাউকে বল না !”

এক দিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, “শ্রীবাস, তুমি এই অবধূতকে কেন সব সময় বাড়িতে রাখ? কোন ওর জাতি, কোন ওর কুল—আমরা কিছু ওর সম্পর্কে জানি না। যদি তুমি নিজের জাতিকুল রক্ষা করতে চাও, তুমি ওর সম্বন্ধ ঘুচাও ! তুমি ওকে তাড়িয়ে দাও !” নিমাইয়ের কথা শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত হাস্যমুখে বললেন, “আমাকে পরীক্ষা করবার তোমার কোন দরকার নেই। নিত্যানন্দ তোমার দেহ আর যে তোমাকে ভজে সে আমার প্রাণ। যদি নিত্যানন্দ মদিরা-যবনী ধরে আমার জাতি-প্রাণ-ধন নষ্ট করেও, আমার মন পরিবর্তন হবে না—আমি সত্য সত্য এই কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি।” শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা শুনে মহাপ্রভু উঠে হুংকার করে ওঁকে আলিঙ্গন করলেন ! তখন মহাপ্রভু বললেন, “নিত্যানন্দে সমর্পিলুঁ আমি তোমা’ স্থানে, সর্ব্বমতে সংবরণ করিবা আপনে।” সেই ভাবে শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী দেবী নিত্যানন্দ প্রভুকে সব সময় প্রিয়তম সন্তানের মত দেখাশোনা ও আদর করতেন।

* * *　　* * *　　* * *

শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্রের শিক্ষা

শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী দেবীর একমাত্র পুত্র ছিল। এক দিন ছেলেটি কোন ব্যাধিতে পরলোক গমন করলেন। বাড়িতে নারীগণ ক্রন্দন করতে লাগলেন কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত সবাইকে ক্রন্দন থামাতে বললেন যেন মহাপ্রভুর নৃত্য ও কীর্ত্তনে কোন ভাবে বিঘ্ন হবে না। কিছু ক্ষণ পরে মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন, "শ্রীবাস, তোমার বাড়িতে কিছু হয়েছে না কি? বল না। কীর্ত্তন আজকে ভালো লাগছে না। আনন্দ পাচ্ছি না।" শ্রীবাস পণ্ডিতের কোন উপায় নেই—উনি বললেন, "হ্যা, প্রভু, তোমার কীর্ত্তন আমি নষ্ট করতে চাইলাম না। আমার একমাত্র পুত্র ঘরে মরে পড়ে আছে।" শ্রীবাস পণ্ডিতের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে মহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্টি হয়ে গিয়েছিলেন—"ঘরে মরা ছেলে পড়ে আছে তবু ও আমাকে বলছে না।" তখন মহাপ্রভু বললেন, "তুমি আমাকে আগে বলো নি কেন? কোথায় ছেলেটি? ভিতরে চল !" ঘরের ভিতরে এসে মহাপ্রভু মরা ছেলের সঙ্গে কথা বললেন,

"কী বাচ্চা? তুমি শ্রীবাস ও আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন? আমরা তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?"

তখন মরা ছেলে হঠাৎ করে বলতে লাগলেন, "প্রভু, যত দিন আমি এখানে ছিলাম, তত দিন পর্যন্ত আমার তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কিন্তু এখন তুমি আমাকে ডেকেছ তাই আমি তোমার ধামে চলে যাচ্ছি। আমার অনেক বার জন্ম এবং অনেক বার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু এবার মৃত্যু কালে তোমার শ্রীবদন দর্শন করে আমি সুখে চলে যাচ্ছি।"

* * *   * * *   * * *

শ্রীবাস পণ্ডিতের সেবার আদর্শ

যারা প্রতি দিন সেবায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন তারা খুব ভাগ্যবান্—সবাইয়ের ভাগ্য এভাবে হয় না। সবাই সেবা করতে পারে না—সবাইয়ের কানে হরিকথা যাবে না। যদি কেউ ভগবানের কাছে এসে বলেন, "আমি তোমার সেবা করব।"—সেই বুদ্ধিতে

যদি আপনারা আসেন, তখন ভগবান্ আপনাদের নিকটে প্রকাশিত হবেন। শ্রীবাস পণ্ডিত কিরকম গৃহস্থ ছিলেন?

মহাপ্রভু বলেছেন, “শ্রীবাস, আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি কিন্তু তোমার বাড়িতে যেভাবে কীর্ত্তন হয়েছে প্রত্যেক দিন, সেই ভাবে কীর্ত্তন থাকতে হবে। সন্ধ্যার সময় তোমরা সবাই মিলে পাড়ার গ্রামের লোকজন মিলে তোমার বাড়িতে খোল করতাল নিয়ে কীর্ত্তন হবে।”

যেখানে ভক্তগণ প্রত্যেক দিন ভগবানের চিন্তা করেন, সেখানে ভগবান সব সময় থাকেনঃ

যে দিন গৃহে ভজন দেখি।
গৃহেতে গোলোক ভায় ॥

গোলোক কোথায়? যে গৃহে প্রত্যেক দিন ভগবানের কথা এবং ভগবানের সেবা হয়। সেবা বা ভক্তি অনুশীলনের মধ্যে ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামসঙ্কীর্ত্তন। সেইজন্য, প্রভুর আদেশ অনুসারে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে প্রত্যেক দিন কীর্ত্তন হত। আর শ্রীবাস পণ্ডিতের একটা খুব ভাল অভ্যাস ছিল—তিনি ভাবলেন, “ভক্তরা সন্ধ্যার সময় আসবেন আর ওঁরা কি খালি মুখে চলে যাবেন? না, একটু প্রসাদ দিতে পারলে ভালো হয়।” শ্রীবাস পণ্ডিতের চাকরি নাই, ব্যবসা নাই, মাইনেও নাই—কোথা থেকে পয়সা পাবেন? তাই উনি মাধুকরী করতেন। ভিক্ষা করে যা হত সেই দিয়ে প্রত্যেক দিন ঠাকুরকে ভোগ লাগিয়ে সবাইকে প্রসাদ দিয়ে দিতেন।

কিন্তু কিছু দুষ্ট লোক থাকে—জগতে সব লোক কি ভালো হয়? একশো লোকের মধ্যে খারাপ লোক সব সময় বেশী। তাই যখন শ্রীবাস পণ্ডিত ভিক্ষা করতেন, তখন কিছু দুষ্ট লোক ওঁকে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা দিত। উনি কীর্ত্তন করতেন বলে লোকে বলত, “এই গরিব লোক খিদে পেয়ে ঘুমতে না পেরে সারা রাত কীর্ত্তন করে!” আবার মাতাল লোকেরা মদ খেয়ে এসে মদের বোতলগুলো দরজার সামনে রেখে দিয়ে চলে যেত। আর পরের দিন বোতলগুলো লোককে দেখিয়ে দিয়ে ওরা বলত, “সারা দিন কীর্ত্তন করে আর বেশী রাত্রে হলে মদ খায়!”

তাই শ্রীবাস পণ্ডিত ভিক্ষা করতেন বলে লোকেরা নিন্দা করত, "এই কাকা ভিক্ষা করে পয়সা জমিয়ে নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে আরাম ভাবে সংসার করছে।"

এই সব কথা শুনে মহাপ্রভু ভাবলেন, "এই লোকগুলো অপরাধ করছে বলে ওদের নরকে বাস হবে। এদেরকে কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।" তখন শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে এসে মহাপ্রভু বললেন, "শ্রীবাস! আমার কথা শুন।"

"বল, প্রভু। কী আদেশ তোমার ?"

"আদেশটা হচ্ছে এইটা—কাল থেকে তুমি আর ভিক্ষায় যাবে না।"

"সে কী ? সন্ধ্যার সময় তুমি আমাকে কীর্ত্তন করতে বলেছ, আর আমি ভক্তদের খালি মুখে ফিরিয়ে দেব ? ওদেরকে প্রসাদ দেব না ? চাকরি না পেয়ে আমার সেই জন্যে ভিক্ষা করতেই হবে।"

"জানি না ও সব ! ভিক্ষা করলে চলবে না। আমার কথা হচ্ছে কাল থেকে তুমি ভিক্ষায় যাবে বা !"

তখন শ্রীবাস পণ্ডিত হা হা করে বললেন, "ঠিক আছে ! এক তালি, দু তালি, তিন তালি !"

"এক তালি, দু তালি, দিন তালি—এটা কী ভাষা তুমি বলছ ?!"

"বলছি এক দিন দেখব, দুই দিন দেখব—এক দিন উপবাসে থাকব, দুই দিন উপবাসে থাকব—তিন দিনে ক্ষিদা আর সহ্য করতে না পেরে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব !"

"হ্যাঁ, তাই হবে। তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে, অসুবিধা নেই।"—মহাপ্রভু ওঁকে পরীক্ষা দিলেন।

এই কথা বলে মহাপ্রভু চলে গেলেন আর পরের দিন সকাল থেকে এত চাল ডাল সবজি কে কোথা থেকে দিয়ে যাচ্ছে শ্রীবাস পণ্ডিত বুঝতে পারলেন না—ওঁর সব ঘর ভর্তি হয়ে গেল। শ্রীবাস পণ্ডিতের কখনও কিছু অভাব ছিল না।

এইরকম বিশ্বাস থাকতে হবে—এইরকম গৃহস্থ হতে হবে ! "ভগবান্, আমি তোমার উপরে ভরসা রাখি। যে ভাবে রাখবে, সেই

ভাবে রাখ। হে প্রভু, আমি তোমার সেবা করব—তুমি আমার সেবা নেবে না নেবে, কী দেবে না দেবে, সেটা তোমার ব্যাপার। সেটা আমাকে ভালো লাগবে, খারাপ লাগবে—তুমি যদি আমাকে খারাপ ভেবে শাস্তি দাও, সেইভাবে রাখবে ; আর যদি আমাকে ভালো ভেবে শাস্তি দাও, তুমি আমাকে সেইভাবে রাখবে। আমার সুখ-দুঃখের কোন রকম ব্যাপার নেই।”

সেইজন্য, এই শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গনে বহু ভাগ্যের ফলে এসে আমাদের এই পরম উচ্চ স্থানের ধূলিখানা মাথায় নিয়ে এসব কথা সব সময় হৃদয়ে রাখতে হবে আর প্রার্থনা করতে হবে যে আমরা যে কোন জন্মে যে কোন ভাবে ভক্তগণের সংসারের সদস্য হয়ে তাঁদের সেবার অংশ গ্রহণ করতে পারব।

জয় শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গন কি জয়।
শ্রীবাস পণ্ডিত মালিনী দেবী কি জয়।
জয় শ্রীশ্রী গৌরনিতাই কি জয়।

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর ॥

সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে ॥

মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা ॥

জন্মাওবি মোয়ে ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোরে ॥

কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ॥

ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁ’ক সঙ্গ অনুরক্ত ॥

জনক-জননী-দয়িত-তনয়।
প্রভু, গুরু, পতি তুহুঁ—সর্ব্বময় ॥

ভকতিবিনোদ কহে শুন কান !
রাধানাথ ! তুহুঁ হামার পরাণ ॥

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভবন

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমাদের শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গন থেকে আমরা এখন এই পাশাপাশি ছোট মন্দিরে এসেছি । এই মন্দিরটা হচ্ছে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর শ্রীগৃহ । ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই মন্দির ১৯১৯ সালে স্থাপন করেছিলেন এবং শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর সম্বন্ধে আমরা একটি অত্যন্ত মূল্যবান্ প্রবন্ধ পাই শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় । "বৈষ্ণবের গুণ-গান করিলে জীবের ত্রাণ শুনিয়াছি সাধুগুরুমুখে"— আমাদের এবং সারা জগতের মঙ্গলের জন্য, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দিব্য গুণ-মহিমা স্মরণ করবার জন্য আমরা ওই প্রবন্ধ এখানে নিম্নে উপস্থাপন করি ।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য

(৫ম খণ্ড ২ত সংখ্যা সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ভগবানের আদ্য পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর অংশ, প্রধানান্তর্য্যামী পুরুষ ; সুতরাং ভগবান্ হইতে অভিন্ন বিষ্ণুবস্তু। সত্ত্বতনু বিষ্ণু সকলের আদি ও স্বয়ং অনাদি। তাঁহার আদি বা জনক কেহ নাই, তথাপি তিনি বাৎসল্যরসপুষ্টির নিমিত্ত এবং বাৎসল্যরসের ভক্তগণের স্নেহরস বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত মূলে সকলের পিতা হইয়া নিজভক্তের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী নবগ্রামবাসী কুবের মিশ্রের গৃহে তদীয় পত্নী নাভাদেবীর গর্ভসিন্ধু হইতে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অতি শুভলগ্নে জগজ্জীবের চক্ষু গোচর হন।

কথিত আছে, বৈষ্ণব প্রবর মহাদেবের মিত্র গুহ্যকেশ্বর কুবের কোন সময় শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেব তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। কুবের মহাদেবের নিকট, "আপনি আমার পুর্ত হউন্"—এই বর প্রার্থনা করেন। সেই গুহ্যকেশ্বর কুবেরই কুবের মিশ্র সদাশিবাবতার অদ্বৈত প্রভুর জনকাভিমানী। ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়াই তিনি অদ্বৈত এবং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া তিনি আচার্য্য। আচার্য্য প্রভু গৃহস্থ-ভক্তলীলার অভিনয় করিয়াছেন। চতুর্থাশ্রমীর লীলা প্রদর্শনকারী পরমহংস-কুলরাজ মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে গুরুরূপে অঙ্গীকার করিয়া মহাভাগবত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-গুরু অঙ্গীকারের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ভক্তিকল্পবিটপীর একটী প্রধান স্কন্ধ। তাঁহার আরও দুইটী নাম আছে,—'মঙ্গল' ও 'কমলাক্ষ'। পিতামাতার গঙ্গাপ্রাপ্তির পর তিনি শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া কৃষ্ণারাধনায় নিমগ্ন হন, পরে নবদ্বীপে তাঁহার প্রকট-সময় জ্ঞাত হইয়া, তৎপূর্ব্বেই শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করেন। শান্তিপুরবাসীরা পরমানন্দে তাঁহার আবশ্যক গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে বিশিষ্ট লোকেরা বিপ্রবর

নৃসিংহ ভাদুড়ীর শ্রী ও সীতানাম্নী দুইটী সর্ব্বগুণযুতা সুতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে তথায় পরমযত্নে রক্ষা করেন। যোগমায়া এবং তদীয় প্রকাশ মূর্ত্তি, সীতা ও শ্রীরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হন।

এই সময় তথায় প্রায় সর্ব্বস্থলে কৃষ্ণভক্তের অভাব এবং বহির্ম্মুখ জনের প্রভাব তথা বহির্ম্মুখী বিদ্যার বৃথাড়ম্বর প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তৎকালে নদীয়ার শ্রীবাসপণ্ডিতাদি মাত্র দুই একজন একান্ত ভগবৎপরায়ণ ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের সুষ্ঠু আলোচনায় কালপাত করিতেন। আচার্য্য প্রভু সন্ধান জানিয়া অমনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীবাসের আবাসের সন্নিকটে একটী বাসস্থান করিলেন এবং শ্রীবাসভবনে গোপনে কৃষ্ণরসাস্বাদনে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন অতুল অমূল্যনিধি এভাবে গোপন রাখিয়া আর তৃপ্তি হইল না। ভগবদ্বিমুখ জীবে দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের এবং প্রভুর শুভাগমনেরও যুক্তকাল উপস্থিত। এইবার শ্রীঅদ্বৈত অবিলম্বে তাঁহার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অহরহঃ তাঁহার শ্রীচরণ-উদ্দেশে গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়া ব্রহ্মাণ্ডভেদী গভীর হুঙ্কারে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে পরম শুভক্ষণে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে শ্রীশচীমাতার কোলে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। এই সময় শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে ; আমাদের নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসও তথায় উপস্থিত। প্রভুর প্রকট-রজনীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ণালোকে উভয়ে অনুগত ভক্তগণসহ মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পরম উৎসাহে সকল বিঘ্ন-বিপত্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আচার্য্যপ্রবর পরমার্থ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। জনসমাজে সুদীর্ঘকাল পোষিত দুর্ব্বুদ্ধি ও দ্বন্দ্ব-মোহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আচারে ও প্রচারে সর্ব্বত্র সত্যের মহিমা ঘোষণা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যবনকুলে আবির্ভূত শ্রীঠাকুর হরিদাসকে কোটী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে পরমাদরে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়া তিনি (আচার্য্যপ্রভু) ভক্তি প্রচারক আচার্য্যের নিরপেক্ষতা ও সদাচার প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অল্পদিনের জন্য গৌরসুন্দরের গৃহত্যাগোন্মুখ অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপকেও সহকারিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থের সজ্জনানুমোদিতা বিশুদ্ধা ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়া, বহু পাষণ্ড, পতিত ও অজ্ঞজনসমূহকে পরমভাগবত করিলেন। অগ্রজের গৃহত্যাগের পর শ্রীগৌরসুন্দরও স্বীয় শৈশব ও কৈশোর-লীলা প্রকট করিয়া, অলৌকিক গুণগরিমায় সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণে শচীমাতার বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অপরাধ হইয়াছে বলিয়া প্রেমাবিষ্ট অদ্বৈতের অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া মাতার বৈষ্ণব অপরাধ স্খালনরূপ এক লীলা প্রদর্শন করিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। সাগরসঙ্গমে সহস্রদিগ্ দেশাগত নদ-নদীসমূহের সম্মিলনের ন্যায়, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস আদি অঙ্গোপাঙ্গগণ আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপাদপীঠে একত্র হইলেন। সঙ্কল্পের সংসিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া আচার্য্যের আনন্দ আর ধরে না। তিনিও শুভযোগে শ্রীপদে মিলিত হইলেন। তাঁহার আবাসে গদাধরসহ শ্রীগৌরহরি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ধরা দিলেন, পূজা গ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর দর্শন দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিলেন। আচার্য্যঠাকুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে ভক্ত ও সাধারণ লোক সমাজে জানাইবার জন্য নানারূপ ছল করিতেন। তিনি (আচার্য্যপ্রভু) একদিন নবদ্বীপ হইতে পলাইয়া শান্তিপুরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন ; তখন গৌরহরি শ্রীবাসভবনে স্বীয় ঈশ্বর-ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসভ্রাতা রামাইকে, শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈতকে অবিলম্বে আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রামাই সঙ্গে তিনি সস্ত্রীক আসিলেন, কিন্তু 'আসে নাই'—এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়া, তথায় নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকাইলেন ; আর মনে মনে স্থির করিলেন,—প্রভু যদি আজ আমাকে লইয়া গিয়া আমার মাথায় শ্রীপদ দান করেন, তবেই জানিব তিনি আমার প্রাণনাথ ; তিনি সত্যই আসিয়াছেন। অচিরেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহাকে লইয়া গিয়া মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম দান করিলেন। এইস্থলে

তিনি বর লইলেন যে, যেন তিনি বিদ্যা-ধন-কুল ও তপস্যাদির অহঙ্কারে যাহারা মত্ত, তাহাদিগকে ত্রিতাপেই দহ্যমান রাখেন এবং অহঙ্কারশূন্য স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ ও অধম চণ্ডালাদি কিম্বা যাঁহারা যথার্থ উত্তম হইয়াও সেইরূপ অভিমানশূন্য ও দীনহীন, তাঁহাদিগকেই স্বভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করেন ; অতি অধম ব্যক্তিও যেন তাঁহার বিশুদ্ধ নামপ্রেমে মগ্ন হইয়া নৃত্য করে। প্রভু ইহা সর্ব্বসমক্ষে অঙ্গীকার করিলেন। শত শত কণ্ঠের একতান জয়ধ্বনিতে ভূতল ও গগণ পূর্ণ হইল। শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে, শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁহাদের অভিন্নবিগ্রহ এই আচার্য্যপ্রবরের কত রঙ্গ—কত লীলা হইলা। নিতা'য়ের সঙ্গে বাগ্ যুদ্ধ, গৌরের সঙ্গে পরস্পরের পূজা ও পদরজঃ গ্রহণ লইয়া দ্বন্দ্ব ; কি প্রেমতরঙ্গ তাহাতে উত্থিত হইল। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা জগতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্ভেদজ্ঞান চেষ্টার অকর্ম্মণ্যত্ব কৌশলক্রমে জগতে প্রচার করাইবার জন্য একদিন, যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, নিজ অন্তরের ভাব লুকাইয়া ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করিলে, মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুর প্রতি ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ভীষণ প্রহার করিতে লাগিলেন। আহা, তাহাতেও কি আনন্দ প্রবাহ বহিল ! কিন্তু এ-আনন্দ এইরূপে আর অধিক দিন রহিল না। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, নদীয়ার ভক্তগণকে কাঁদাইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতের গৃহেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ এবং শ্রী-সীতা ও শচীমাতার শুশ্রূষায় তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়া শ্রীধাম নীলাচলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আচার্য্য প্রভুও তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন ; কিন্তু, তিনি সে উদ্যমে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া সময়োচিত কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া, গৌড়দেশেই থাকিয়া বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার দ্বারা লোকমঙ্গলসাধন করিতে নিযুক্ত রাখিলেন। সীতানাথ তাঁহারই আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তবে রথযাত্রার সময় প্রতিসৎসর গৌরভক্তগণ সকলেই শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্বধন শ্রীশচীনন্দনের সেবানন্দে চারিমাস যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিলেন। তখন তাহাই সকলের পরম সান্ত্বনা ও আশাস্থল হইল।

অনন্তর, প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় কয়েক মাস তাঁহাদের একমাত্র মিলনে বিবিধ প্রেমানন্দ হইতে লাগিল। একদা শ্রীনীলাচলে আচার্য্য আপন বাসায় প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—প্রভু যদি আজ একাকী আসেন, তবে বড় ভাল হয় ; নিরুদ্বেগে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করি। বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন ; মধ্যাহ্নে তিনি একাকীই আসিয়া উদিত হইলেন ; অমনি বিষম ঝড় বৃষ্টি ও শিলাপাত আরম্ভ হইল, আর কেহ তথায় আসিতে পারিলেন না। আচার্য্য তখন পরম আনন্দে মেঘবাহন ইন্দ্রের স্তব করিয়া পত্নীর সাহায্যে প্রাণ-প্রভুর মনোমত সেবা করিলেন। প্রভু শ্রীমুখে শ্রীঅদ্বৈতের কত মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তিনিও উত্তরে বলিলেন,—"আমার সকল শক্তি তোমার প্রতি ভক্তি হইতেই। তুমি আমাকে বর দাও,—'মোরে না ছাড়িবা কোনো কালে'।" এই শ্রীক্ষেত্রে একবার শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতেরে?" শ্রীবাস বলিলেন—"শুক-প্রহ্লাদের মত।" অমনি প্রভু পুত্রের শাসনে পিতার মত শ্রীবাসকে ক্রোধভরে এক চড় দিয়ে বলিলেন—"কী, কি বলিলি শ্রীবাসিয়া,—কালিকার বালক শুক-প্রহ্লাদ, তা'দের সঙ্গে তুলনা অদ্বৈতের? আমার 'নাঢ়া'কে তুই এত বড় বাক্য বলিলি? আজ আমাকে তুই বড় দুঃখ দিলি।" এই বলিয়াই তিনি নিকটস্থ পিল্‌সুজিট লইয়াই আবার তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। আমাদের আচার্য্য গোসাঞি, নিকটেই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রভুর হস্ত ধরিয়া নিবারণ করিলেন ; বালক শ্রীবাসকে ক্ষমা করিতে বলিলেন। প্রভু তখন স্থির হইয়া বসিয়া দৃঢ়স্বরে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"শুকাদি সকলে তাঁহার বালক। তাঁহার পাছে সকলের জন্ম। তাঁহার জন্যই আমার এই অবতার। তাঁহার মহিমা জানে কে?" শ্রীবাস প্রভুর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; আর বলিলেন—"প্রভু, তুমি না জানাইলে, তোমার অদ্বৈতের তত্ত্ব জানিবে কে? আজ আমি শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইলাম।" একবার রথযাত্রা পরিসমাপ্তির

পর শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্পতুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজাপাত্রের শেষ পুষ্পতুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে "যোঽসি সোঽসি" মন্ত্রে পূজা করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ছয়টি পুত্র। তাঁহাদের নাম,—শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ। তন্মধ্যে প্রথম তিন জনই বাল্যাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও সতত তাঁহার সেবায় রত ছিলেন। অপর তিন জন অন্যমতাবলম্বী হইয়া পিতার এবং গৌরজন-সমূহের বিরাগভাজন হন। পরমভাগবত, আশৈশব গৌরপদানুরত শ্রীঅচ্যুত বৃহদ্ব্রতীর লীলা অভিনয় করেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সকাতর আহ্বানেই শ্রীগৌরসুন্দর আসিয়াছিলেন ; এখন কার্য্য শেষ হইলে আবার তাঁহারই ইঙ্গিতে তিনি স্বধামে গমন করিলেন। প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গ সকলও অগ্র-পশ্চাৎ অদৃশ্য হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত আর থাকিবেন কেন? যথাসময় তিনিও অন্তর্হিত হইলেন।

ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল গদাধর মোরকুল
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি তহে মোর স্নানকেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ॥ ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মনোনিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতরা তাহে মোর মনোঘেরা
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর গৃহের সন্নিকটে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহ।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শিশু কাল থেকেই মহাপ্রভুর সঙ্গেই থাকতেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মাধব মিশ্র আর মাতার নাম ছিল রত্নাবলীদেবী। তাঁরা মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর নিকটে বাস করতেন আর রত্নাবলীদেবী শচীদেবীকে বড় ভগিনীর মত দেখতেন।

শিশু-লীলার সময় শ্রীগৌরহরি গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে খেলা করতেন। যদিও গদাধর পণ্ডিতের বয়স মহাপ্রভুর কয়েক বছর ছোট, তাঁরা গ্রামের পাঠশালায় একসঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। মহাপ্রভু কোন সময় গদাধর ছাড়া থাকতে পারতেন না আর গদাধরও মহাপ্রভুর ছাড়া এক ক্ষণও থাকতে পারতেন না।

এক দিন শ্রীঈশ্বর পুরী মায়াপুরে গিয়ে গদাধরকে কৃষ্ণ-লীলামৃত নামে গ্রন্থ অধ্যয়ন করালেন আর গদাধর পণ্ডিত সেই গ্রন্থ তাঁর শ্রীমুখে শুনে বিমুগ্ধ হলেন। গদাধর পণ্ডিত শৈশবকাল থেকে ধীর, শান্ত, নির্জন এবং বৈরাগ্যবান ছিলেন। শৈশবে গৌরহরি খুব চঞ্চলভাব প্রকট করে মাঝে মাঝে তাঁকে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন আর গদাধর পণ্ডিত তা বিশেষ পছন্দ না করে কখনো তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইতেন (মাঝে মাঝে নিমাইকে রাস্তায় দেখে তিনি উল্টা দিকে ঘুরে তাঁকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন) কিন্তু গৌরসুন্দর তাঁকে ছাড়তেন না।

এক দিন গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর কাছে এসে বললেন, “প্রভু, আমাকে দীক্ষা দাও।” কিন্তু মহাপ্রভু বললেন, “তোমার গুরু আসছেন। ও তোমাকে ঠিক দীক্ষা দিয়ে দেবে।”

কিছু পরে চট্টগ্রাম থেকে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে এলেন। মহাপ্রভু তাঁকে সব সময় “বাবা” বলে ডাকতেন।

এক দিন মুকুন্দ দত্ত গদাধর পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বললেন, “প্রভু, তুমি কি বৈষ্ণব দেখতে চাও ?”

গদাধর পণ্ডিত বললেন, “হ্যাঁ, নিশ্চয় ! চল।”

যখন তাঁরা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাড়ি এসেছিলেন, তখন গদাধর পণ্ডিত যে বিশেষ শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছিলেন, সেটা হারিয়ে ফেললেন :

তিনি দেখলেন যে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন—তিনি পালঙ্কে আরাম করে শুয়ে দামী ধুতি ও ভাল জামা পড়তেন আর পান খেতেন। গদাধর পণ্ডিত তো সাধু দেখতে এসেছিলেন কিন্তু সাধু দেখতে লাগছে বিষয়ীর মত—তাঁর একটা অপরাধ হয়েছিল। গদাধর পণ্ডিত ভাবলেন, “এ লোকটা কে ? বৈষ্ণব হয়ে বিষয়ীর মত ব্যাবহার কেন ?” মুকুন্দ দত্ত তাঁর মন বুঝতে পেয়ে একটা কৃষ্ণলীলার শ্লোক কীর্ত্তন করলেন :

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

"অহো কি আশ্চর্য্য ! বকাসুরভগিনী দুষ্টা পূতনা কৃষ্ণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য গতি লাভ করিয়াছিল ; অতএব, কৃষ্ণ বিনা এমন আর কে দয়ালু আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হইব ?" (ভাঃ ৩/২/২৩)

মুকুন্দের অতিসুমধুর কণ্ঠে কৃষ্ণলীলাগীত শুনে পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি অমনি “কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !” বলে কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। গদাধর পণ্ডিতের এবার মনে হল, “না বুঝে হেন মহাভাগবত পুরুষকে বিষয়ী-জ্ঞান করেছি ! আমার অপরাধ হয়েছে ! তাঁর কাছে মন্ত্র গ্রহণ না করলে আমি নিস্তার পাব না—আমার অপরাধ দূর হবে না।”

মহাপ্রভু তাঁকে “বাবা” বলে ডাকতেন কেন ? কারণটাই আছে। এই শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দ্বাপরযুগে ছিলেন রাজা বৃষভানু, শ্রীমতী রাধারাণীর বাবার অবতার। আর গদাধর পণ্ডিত কে হচ্ছে ? গদাধর পণ্ডিত হচ্ছে রাধারাণীর অবতার। সেইজন্য যখন গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে কী হয়েছিল বললেন, তখন মহাপ্রভু মঞ্জুর করলেন, “তোমার অপরাধ খণ্ডন করবার জন্য ওঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হবে ! ওই তোমার গুরু হবে !”

তখন এক দিন মুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকটে গদাধর পণ্ডিতের সবিশেষ পরিচয় বলে দিলেন আর সেটা শুনে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হাসলেনঃ

শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
“আমারে ত’ মহারত্ন মিলাইলা বিধি ॥
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥” (চৈঃ ভাঃ ২/৭/১১৭-১১৮)

“এঁকে শিষ্য করে আমি কৃতার্থ হলাম ! তাই আমি এঁকে কৃপা করলাম না, উনি আমাকে কৃপা করলেন যে আমি এঁর মত শিষ্য পেলাম !” গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সামনে গিয়ে প্রণাম

করলেন আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁকে মন্ত্র দিলেন। যখন গদাধর পণ্ডিত বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তিনি এবার নতুন জীবন প্রকট করলেন—অহর্নিশি কৃষ্ণপ্রেমে ভাসতে লাগলেন।

গদাধর পণ্ডিত ও মহাপ্রভু নদীয়া লীলার এক সঙ্গে থাকতেন, আর যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলা অভিনয় করলেন, গদাধর পণ্ডিত তখন মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিলাচলে বাস করতে লাগলেন—তিনি ওখানে মহাপ্রভুর ছায়ার মত থাকতেন।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়ে যখন কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও কান্তি চুরি করেছিলেন, তখন শ্রীমতী রাধারাণী শূন্য হয়ে গেলেন—তাঁর সব কিছু তুলে নেওয়া হল, শুধু দেহমাত্র ছায়ার মত রইল। সেইরকম ছিল গদাধর পণ্ডিতের অবস্থা—তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর অভিন্ন রূপ। ছায়ার মত থাকে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ছাড়তে পারছেন না—যেখানে মহাপ্রভু যান, সেখানে তিনি তাঁকে দূর থেকে অনুসরণ করেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ছাড়া তিনি কিছু জানেন না, তবু তিনি মহাপ্রভুর সামনে যান না—সব সময় পিছনে থাকতেন। আমরা দেখতে পাই যে, মহাপ্রভু পূর্ণিমায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং গদাধর পণ্ডিত অমাবস্যায়। অমাবস্যা মানে চাঁদ বিনা—মহাপ্রভু চাঁদ নিয়েছেন আর গদাধর পণ্ডিত অমাবস্যা তিথি নিয়েছেন। গদাধর পণ্ডিত মালিক কিন্তু তিনি সব কিছু তাঁর নিজের প্রভুকে দিয়েছিলেন। সেই রকম তাঁর চরিত্র—তিনি উচ্চতম বিসর্জনের আদর্শ প্রকাশ করেন।

গৌর লীলায়, মহাপ্রভু চরিত্রে ছিলেন আগ্রাসন, অবিনয় ও অপূর্ব্ব প্রতিভাধর এবং গদাধর পণ্ডিতের চরিত্র একদম উলটাভাবে ছিল। অথচ গদাধর পণ্ডিত নিমাই পণ্ডিতের প্রতি স্বাভাবিক টান ও সমর্পণ ছিল এবং নিমাই পণ্ডিতও গদাধর পণ্ডিতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন কিন্তু কিছু লাজুক হয়ে গদাধর পণ্ডিত নিমাই পণ্ডিতের সোজা সম্মুখে দেখতে পারতেন না। উপরন্তু নিমাই পণ্ডিতকে দেখতে পেয়ে তিনি উদাসীন হয়ে যেতে চেষ্টা করতেন কিন্তু নিমাই তাঁকে ছেড়ে দিতেন

না—তিনি সব সময় গদাধর পণ্ডিতকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন, ওর সঙ্গে বিভিন্ন লীলা প্রকাশ করতেন।

যখন নিমাই পণ্ডিত ভক্তভাবাবেশে গয়া থেকে নবদ্বীপে ফিরে এলেন, তখন তিনি গদাধর পণ্ডিতকে দেখে বললেন, "তোমার জীবন সম্পূর্ণ ! শিশুকাল থেকে তোমার নারায়ণ ও কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় ভক্তি থাকে কিন্তু আমার সব জীবন নষ্ট হয়ে গেল—জাগতিক কথা আলাপ করতে করতে আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি, আমি ভক্তি অনুশীলন করলাম না ! কিন্তু তুমি গদাধর শুরু থেকে কৃষ্ণের শুদ্ধভক্ত। আমি তোমার কৃপা চাই যেন আমি ভক্তি সহকারে জীবন যাপন করতে পারব।"

আমাদের পরমগুরুমহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ ১৯৫৬ সালে গদাধর পণ্ডিতের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। আমরা এই প্রবন্ধটা এখানে জগতে মঙ্গল প্রদান করবার জন্য উপস্থাপন করছি।

পণ্ডিত শ্রীগদাধর গোস্বামী

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীগদাধর গোস্বামী সর্ব্বোত্তম। মধুর কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধিকার স্থান যেরূপ অবিসংবাদিতরূপে তুলনামূলে সর্ব্বোত্তম, সেইরূপ উদার-কৃষ্ণ গৌর-লীলায় উদারমধুররসসেবায় তুলনামূলে শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর চরিত্রে ঔদার্য্যময় মধুররসবিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বাধিক আকর্ষণের বিষয়। মহাজনগণ পণ্ডিত গদাধরে শ্রীরাধাতত্ত্ব সন্দর্শন করেন।

গ্রীষ্মকালে জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যায় পণ্ডিত গদাধরের আবির্ভাব এবং একমাস পরে আষাঢ়ী অমাবস্যায় তিরোভাব-তিথি। পণ্ডিত গোস্বামীর চরিত্র নিজ প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে একটী নীরব পূর্ণ-আত্মোৎসর্গময় উপঢৌকন বিশেষ। লক্ষ্মীদেবীর স্কন্ধ ভিক্ষার ঝুলি দর্শনে যাঁহারা বিরোধালঙ্কারের চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গমে যে অপূর্ব্ব সুখাস্বাদনে সমর্থ, তাঁহারাই শ্রীমৎ পণ্ডিত গোস্বামীর অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের অসাধারণ মহিমা অনুভবের অধিকারী। তিনি শিশুকাল হইতেই

অতি সরল, নিরীহ, অনাড়ম্বর ও সৌজন্যপূর্ণ, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ এবং বন্ধুজনে প্রীতিবান্। তিনি সুশীল হইয়াও সশঙ্ক, নিবেদিতাত্ম হইয়াও অপরাধীবৎ, পূর্ণপ্রজ্ঞ হইয়াও অনভিজ্ঞবৎ, অধিনায়ক হইয়াও অনুগত ভৃত্যবৎ। নিজ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গে তাঁর নিষ্ঠা—গৌরসুন্দরের সাধারণ অনুচরগণের কটাক্ষেও তাঁহাকে সঙ্কুচিত ও সশঙ্ক করায়। তাঁর শ্রীগুরুগৌরে উন্মাদনাময় তন্ময়তা তাঁর অর্চ্চনমন্ত্রের বিস্মরণ ঘটায়। শ্রীগৌরাঙ্গে স্বল্পশ্রদ্ধও তাঁর হৃদয় এতদূর আকর্ষণ করে যে তাঁর প্রতিস্নেহপ্রকাশে তিরস্কার পুরস্কার ভূষণ করিয়া লন। শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর চরিত্র এককথায়—নিজ সর্ব্বসম্পদ দান করিয়া স্বেচ্ছায় ভিক্ষুকবেশ পরিগ্রহের অবহেলিত মূর্ত্তবিগ্রহ।

শ্রীগদাধরের সম্পদ—তাহা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য বা শিবি দধিচীর দেহ-বিসর্জ্জনবৎ বাহ্য-সম্পদ নহে। তাহা ধাত্রীপান্নার প্রণাধিক পুত্র বা পদ্মিনী প্রভৃতির সতীদেহোৎসর্গ মাত্র নহে। এমন কি তাহা সক্রেটিশের আত্মানুভূতি বিতরণের নিমিও বা যীশুখৃষ্টের জগদুদ্ধারের জন্য দেহোৎসর্গ মাত্রও নহে। উচ্চস্তরে অবস্থিত আত্মবিৎগণের দেহত্যাগ অতি সামান্য কথা। আভ্যন্তরীণ দেহগত বা স্বরূপগত সম্পদ পরিত্যাগ অধিকতর দুঃসাধ্য। যদি মুক্তাত্মার ভক্তিসম্পদের তথা তদূর্দ্ধে প্রেমাস্পদের স্বরূপ আমরা হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হই, তবেই শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর অসমোর্দ্ধ হৃদয়সম্পদ দানের হৃদয়বত্ত্বা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিব এবং উহা বোধগম্য হওয়া একমাত্র তাঁহার বা তাঁহার নিজজনের অনুকম্পার দ্বারাই সম্ভব। এইসব দুরূহ বিষয় সহসা সাধারণের উপলব্ধির বিষয় হওয়া সম্ভব নয়, তথাপি আবশ্যকবোধে দিগ্দর্শন করা হইতেছে।

পুনশ্চ দেয় পদার্থের তারতম্য বিচারে যেরূপ মর্য্যাদা নির্ণয় কর্ত্তব্য, তদ্রূপ আবার দানের পাত্রের যোগ্যতার তারতম্যে দানের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় অবশ্য বোদ্ধব্য। যত উচ্চাধিকারী ব্যক্তি দানের গ্রাহক হইবেন, দাতার দানের মহিমা ও ফল তত উচ্চ হইবে। সে বিচারে শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর আত্মদানের বস্তুগত ও পাত্রগত শ্রেষ্ঠতার কোন তুলনা নাই। যেহেতু শ্রীরাধাপ্রেম-সম্পদ সর্ব্বোত্তম বস্তু এবং

দ্বিজসুত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানপাত্র। এই কথা আলোচনা করিতে আমাদের শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যের উপাখ্যান স্মরণ হইতেছে। পর পর উচ্চতর আত্মজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া চরম কথার অবতারণার পরেও জিজ্ঞাসুর আরও অধিকতর উচ্চ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কৌতূহল চরিতার্থতার সীমা গুরুতর ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

আমরা শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলেও মহাজনগণ তাঁহাদের দিব্যজ্ঞানলব্ধ গদাধরের পরিচয় আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অক্ষম হইয়া অশ্রদ্ধাধানের অপরাধে আত্মনিমজ্জন ঘটাই। আবার কেহ কেহ শ্রীরাধাস্বরূপসম্পদ নিত্যানন্দ-বলদেবের স্কন্ধে কেহ বা দাস গদাধরের স্কন্ধে চাপাইয়া নিজেদের মনোধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া সম্বন্ধতত্ত্বে অপরাধী হই এবং নিজেদের স্বরূপসিদ্ধির দ্বার অর্গলবদ্ধ করি। কেহ বা গদাধরের গৌরকৃষ্ণোপাসনা পদ্ধতি বুঝিতে অক্ষম হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াপতি গৌরনারায়ণে ভোগবুদ্ধিবশে সম্ভোগ আহ্বানে নারায়ণকে নাগর সাজাইয়া বসি। শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবযুক্ত হইলেই শ্রীগৌর, এবং গৌর রাধামুক্ত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র মধুরাদি সর্ব্বরসের উপাস্য। শ্রীরামাদি ভগবত্তত্ত্ব সেই প্রকার নহেন। দ্বিজসুত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বা ন্যাশীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কখনও নাগরভাব অবলম্বনে পরস্ত্রী সম্ভাষণাদি করেন নাই বা করেন না। সে আদর্শে পারকীয় সম্ভোগদর্শন রসাভাস—অপরাধ—মহাজনবিরোধী—পাষণ্ড মতবাদমাত্র। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক মহাজন গ্রন্থে এইপ্রকার গৌর-নাগর-বাদের কোন ঘটনা বা সিদ্ধান্তের উল্লেখ আদৌ নাই বা থাকিতে পারে না। নিজ পতি দেবোপাসনায় রত থাকাকালে পতিব্রতা পত্নী যেমন উপাসনারত পতির উপাসনা চেষ্টার আনুকূল্য করিয়া পতিসেবা করেন, পরন্তু সেকালে দাম্পত্যচিত রসালাপ দ্বারা পতির দেবোপাসনার ব্যাঘাত করেন না, তদ্রূপ শ্রীরাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণসাধনাপর চিন্তাসক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের অর্থাৎ তদুচিত্ত স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণারাধনা লীলায়

শ্রীরাধিকাস্বরূপ শ্রীগদাধর আরাধনাপর প্রভুর আরাধনা বিষয়ে আনুকূল্যময় জীবন প্রকাশ করেন ; অর্থাৎ এইরূপই গদাধরে নিত্য প্রকাশিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য ব্রজবিলাসময়, আর শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ নিত্য নবদ্বীপস্থিত ঔদার্য্যময় ; ব্রজমাধুর্য্যে যাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণ—নবদ্বীপ ঔদার্য্যে তাহাই শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গ। অন্য প্রকার ভাবনায় উভয়ের একত্ব বিঘাতক। সাধকগণের সাধারণ মতবাদ পরিত্যাগ ও মহাজন পথই আশ্রয়নীয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-দেবতা হইয়াও সম্ভোগ-প্রধানহেতু সকল অধিকারে প্রেমদেবরূপে প্রতিভাত হন না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ বিপ্রলম্ভ বা ঔদার্য্য রসাশ্রয়ে শ্রদ্ধাবান্ বদ্ধজীবসাধারণের নিকটও প্রেম-দেবতা। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই প্রেমদেবতাকে আপামরে দান করিতে ব্যাকুল ভাবে জীবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণরত শ্রীগুরুদেবতা-স্বরূপ। আর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পৃথিবীতে আবাহনকারী ও আনয়নকারী বর্ত্মপ্রদর্শক পরম মঙ্গলময় দেবতা। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি সেই প্রেমদেব শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন লীলার পীঠদেবতারূপে শ্রীগৌরলীলায় সহায় সম্পদ। শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-জীবাদি প্রেম প্রস্রবণের অমৃতময়ী ধারাসমূহ সর্ব্ববিশ্ব সঞ্জীবিত করিতেছে। (এ পামর দুরাশাবশে একবিন্দু অমৃতের লুব্ধ ভিক্ষুক ; শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাই একমাত্র ভরসা)।

প্রেমদেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বের জয়গান করিতেই এই বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। প্রেমধনের সর্ব্বোত্তম আস্পদ নিজ প্রিয়তমার ভাব অঙ্গীকারেই উহা সম্ভব বুঝিয়া তাহা শ্রীরাধার নিকট হইতে আহরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ একান্তভাবে শ্রীরাধার আরাধনা করিবেন—করিলেনও তাই। কিন্তু ভক্তজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলাতেও তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অর্থাৎ গোপী-প্রীতি তথা শ্রীরাধা বশ্যতা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। গৌরের গদাধর প্রীতি অনন্যসাধারণ। কিন্তু এই প্রীতির রূপ পালটাইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ রাধার ভাব-সাজ পরিলেন—শ্রীরাধা রিক্তভাবে দাঁড়াইলেন, ইহাই শ্রীগদাধরমূর্ত্তি।

গৌরের রাধাভাবে কৃষ্ণারাধনার অন্তরালে শ্রীগদাধরের প্রিয়তমে সর্ব্বস্ব অর্পণের পর নগ্ন মহিমাময়মূর্ত্তি নিরীক্ষণে লুব্ধ নয়ন, অন্তরঙ্গ জনের সুতীক্ষ্ণ প্রেমলুব্ধ পিপাসু-দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইল। উপাস্য উপাসক সাজিলেন। উপাসক উপাসনার উপায়নের উৎস পর্যন্ত উপাসকরূপ উপাস্যের সমীপে অর্পণ করিয়া সর্ব্বাত্মার্পণের ধন্য মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন। তাহাতে উপাস্যের উপাসকের প্রতি যে আকর্ষণ বা প্রীতি, সেই অমূল্যধন লাভের আশায় গৌরজন গদাধরের আনুগত্যে শ্রীগৌরাঙ্গভজনরূপ অপূর্ব্বভজন পন্থা ও ভজন ফলের আবিষ্কার করিলেন। শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভরস অধিকতর উন্নতভাবে গদাধর জনের আস্বাদনের বিষয় হইল।

গদাই-গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাপতি জয় শ্রীবাসাদিভক্তগণ॥

কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে
'হা রাধে হা কৃষ্ণ' ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ-সুখ ছাড়ি'
নানা-লতাতরুতলে॥
শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী জল।
পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল॥

ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি,
ধরি' অবধূত-বেশ॥
গৌড়-ব্রজ-জনে ভেদ না হেরিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ

ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের সমাধিমন্দির

শ্রীচৈতন্যমঠ

(১) আকরমঠরাজ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা এখন শ্রীচৈতন্যমঠ এসেছি। এখানে আমাদের পরমগুরুদেবের গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ থাকতেন এবং প্রচার করতেন।

যখন মহাপ্রভু তাঁর লীলা শেষ করে দিয়েছিলেন, তখন শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই জগতে থাকলেন, তারপর শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, আচার্য্য শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল জীব গোস্বামী—তাঁরা সবাই মহাপ্রভুর প্রচার ও গোত্র শুদ্ধভাবে বিস্তৃত করতেন। তাঁদের চলে যাওয়ার পর এই জগতে মহাপ্রভুর ধর্ম্মটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল এবং অনেক অপসম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল—আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী... ফলে এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে লোকে নিন্দা করত, ঘৃণা করত।

অনেক বছর পর, ১৮৩৮ সালে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উলা বা বীরনগর গ্রামে (নদিয়া জেলায়) আবির্ভূত হলেন। ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে দেখলেন যে, মহাপ্রভু যা জগতে প্রচার করতেন : যা জগতে প্রচার হচ্ছ সেটা সব ভুল-সিদ্ধান্ত—মহাপ্রভুর শিক্ষার পরিবর্তে জগতে বহু অপসম্প্রদায় ভুল-ধারণা বিস্তার করছে। জগতের দুর্দশা দেখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিমলা দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন, “হে দেবী ! তুমি একজনকে পাঠাও, যে সেই জগতে মহাপ্রভুর সঠিক কথা প্রচার করতে পারবে।” তারপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরীধামে জন্ম গ্রহণ করলেন। পরে তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে থাকতেন শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে (শ্রীনবদ্বীপধামে)। তাঁরা সেখান থেকে যোগপীঠ এবং পরে এই চৈতন্য মঠ স্থাপন করলেন। এই মঠের দ্বারা শ্রীলপ্রভুপাদ সারা

পৃথিবীতে মহাপ্রভুর কথা (শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী) প্রচার করেছিলেন। সেই জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে আমরা অত্যন্ত ঋণী।

শ্রীল প্রভুপাদ মাত্র ৬৪ বছর এই জগতে প্রকট লীলা করেছিলেন, কিন্তু এই ৬৪ বছর জীবিত থেকে তিনি বিদেশে ও বেশিরভাগ ভারতবর্ষের মধ্যে ৬৪টি মঠ স্থাপন করেছিলেন। এই চৈতন্য মঠ হচ্ছে সমস্ত গৌড়ৌয়মঠের মূল মঠ বা আকর-মঠ-রাজ।

এই চৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করার আগে শ্রীল প্রভুপাদ মায়াপুরে বসে ১০০ কোটি হরিনাম যজ্ঞ করেছিলেন—তার ৪ বছর ৪ মাস সময় লেগেছিল। সারা দিন তিনি শুধু নাম করে যেতেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "১০০ কোটি হরিনাম করলে আমি মহাপ্রভুর কথা প্রচার করতে শুরু করব।" যখন হরিনাম যজ্ঞ শেষ হল, তখন তাঁর সামনে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা গিরিধারী (শ্রীমতী রাধারাণী) এসে বললেন, "হে নয়না মঞ্জরী তুমি জগতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর (রাধা-কৃষ্ণের মিলিত রূপের) কথা প্রচার কর ! আমার কথা প্রচার কর !" শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বললেন, "আমি একা, আমি কি করে প্রচার করব ?" তবু রাধারাণী বললেন, "তুমি কোন চিন্তা কর না, আমি আমার নিজ জনকে যারা আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে লীলা করেছে, আমি তাঁদেরকে একে একে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

এরপর সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিক্‌পাল আচার্য্যগণ শ্রীলপ্রভুপাদকে সাহায্য করবার জন্য এসেছিলেন—আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ (ISKCON-এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য), শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ (কুঞ্জ বাবু, এই চৈতন্য মঠের পরবর্তী আচার্য্য), শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মাহরাজ (গৌরনিত্যানন্দ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা), শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মাহারাজ (বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী, দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য), শ্রীল ভক্তিকমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ (কৃষ্ণচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠাতা), শ্রীল ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল

ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজে (পরমহংস গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা), শ্রীল ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ইত্যাদি। সেইভাবে শ্রীলপ্রভুপাদ শুদ্ধসিদ্ধান্ত প্রচার করতে লাগলেন।

তাঁর কৃপায় আমরা আজকে এখানে আছি এবং প্রচার করতে সুযোগ পেয়েছি। একজন উন্নত বৈষ্ণব-কবী তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :

শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
দীনহীন পতিতের বন্ধু।
কলিতমঃ বিনাশিতে আনিলেন অবনীতে
তোমা' অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দু॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে—অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দুকে—এই জগতকে এনেছেন। সেই প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন এবং এই জগতে হরিনাম বিস্তার করেছিলেন। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা এখনও সারা পৃথিবীতে ভগবানের কথা প্রচার করে আমাদের মত অধম পতিত জীবকে উদ্ধার করে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করছেন।

স্থানে স্থানে কত মঠ স্থাপিয়াছ নিষ্কপট
প্রেমসেবা শিখাইতে জীবে।
মঠের বৈষ্ণবগণ করে সদা বিতরণ
হরিগুণ-কথামৃত ভবে॥
করিতেছ উপকার যাতে পর উপকার
লভে জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়
উঠরে উঠরে ভাই আর ত সময় নাই
'কৃষ্ণ ভজ' বলে উচ্চৈঃস্বরে

সবাইকে ভগবানের সেবায় লাগিয়ে দিয়ে তিনি মহাপ্রভুর শিক্ষাও এই জগতে বিতরণ করেছিলেন :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

কলকাতায়, নবদ্বীপটাউনে (কুলিয়াতে) এখনও এমন বাবাজী গোসাঞিঃ আছে, আর প্রভুপাদের সময় ওরা তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতেন—ওরা তাঁকে আক্রমণ করতেন, উত্ত্যক্ত করতেন, ইত্যাদি কিন্তু প্রভুপাদ কিছু বলেন নি :

কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা অত্যাচার কৈল যা'রা
তা সবার দোষ ক্ষমা করি।
জগতে কৈলে ঘোষণা 'তরোরিব সহিষ্ণুনা'
হন 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥'

তাই, এই মূলমঠে এসে আমরা প্রার্থনা করি যে, এই জন্মে বহু ভাগ্যের ফলে এই বিপুল গৌড়ীয় মিশনের যেকোনভাবে সদস্য হয়ে যেন আমরা ভক্তগণের একটু ক্ষুদ্রও সেবা করতে পারব আর যেন শ্রীল প্রভুপাদ—যেখানে তিনি থাকেন না কেন—আমাদের অসংখ্য অপরাধগুলো ক্ষমা করে আমাদেরকে কৃপা করে তাঁর শুদ্ধসিদ্ধান্ত প্রচার করতে সুযোগ এবং অধিকার প্রদান করবেন। সেটা তাঁর শ্রীচরণে আমাদের ভরসা ও প্রার্থনা।

(২) শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলা ও সমাধি-মন্দির

আমাদের পরমগুরুদেব—শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠের প্রতিষ্ঠাতা—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ রচিত :

স্বজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং
যুগধর্ম্মধুরন্ধর-পাত্রবরম্।
বরদাভয়দায়ক-পূজ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১॥

ভজনোর্জ্জিতসজ্জনসঙ্ঘপতিং
পতিতাধিককারুণিকৈকগতিম্।
গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥২॥

অতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতনুং
তনুনিন্দিতহেমমৃণালমদম্।
মদনার্ব্বুদবন্দিতচন্দ্রপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৩॥

নিজসেবকতারকরঞ্জিবিধুং
বিধুতাহিত-হুঙ্কৃতসিংহবরম্।
বরণাগতবালিশ-শন্দপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৪॥

বিপুলীকৃতবৈভবগৌরভুবং
ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত-গৌরদয়ম্।

দয়নীয়গণার্পিত-গৌরপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৫॥

চিরগৌরজনাশ্রয়বিশ্বগুরুং
গুরুগৌরকিশোরকদাস্যপরম্ ।
পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৬॥

রঘুরূপসনাতনকীর্ত্তিধরং
ধরণীতলকীর্ত্তিতজীবকবিম্ ।
কবিরাজ-নরোত্তমসখ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৭॥

কৃপয়া হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিধরং
ধরণীভরহারক-গৌরজনম্ ।
জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৮॥

শরণাগতকিঙ্করকল্পতরুং
তরুধিক্কৃতধীরবদান্যবরম্ ।
বরদেন্দ্রগণার্চ্চিতদিব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৯॥

পরহংসবরং পরমার্থপতিং
পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশযতিম্ ।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১০॥

বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরং
চরণাশ্রিত-রেণুধরস্তমহম্ ।
মহদদ্ভুতপাবনশক্তিপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১১॥

কোটি কোটি সুজনকর্ত্তৃক আরাধিত শ্রীপাদপদ্মযুগ, (কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ) যুগধর্ম্মসংস্থাপক, (বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার) পাত্ররাজ, (নিখিল জীবের) ভয়হরণকারিগণের মনোঽভীষ্টপ্রদাতা সর্ব্বপূজ্য শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১॥

ভজনসমৃদ্ধ সুজনগণের অধিপতি, পতিতজনের প্রতি অধিক করুণাময় ও তাঁহাদের একমাত্র গতি এবং বঞ্চকগণের বঞ্চনাকারী গতিবিশিষ্ট অচিন্ত্যচরণে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥২॥

অতি কোমল সুবর্ণবর্ণ দীর্ঘতনুকে আমি প্রণাম করি—যাঁহার তনু কর্ত্তৃক স্বর্ণময় মৃণালের মত্ততা নিন্দিত হইতেছে। কোটি কোটি মদন কর্ত্তৃক বন্দিত নখচন্দ্রসমূহ যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শোভা বিস্তার করিতেছে, আমার প্রভুর সেই পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৩॥

তারকরঞ্জন চন্দ্রের ন্যায় যিনি নিজ সেবকমণ্ডলে পরিবেষ্টিত

হইয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রফুল্লিত করিয়া থাকেন, ভক্তিদ্বেষিগণ যাঁহার হুঙ্কারে বিদ্রাবিত হয় এবং নিরীহ জনগণ যাঁহার পাদপদ্ম বরণ করিয়া পরম কল্যাণ লাভ করেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৪॥

যিনি শ্রীগৌরধামের বিপুল বৈভবশোভা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মহাবদান্যতার কথা যিনি নিখিল ভুবনে বিঘোষিত করিয়াছেন এবং নিজ কৃপাভাজন জনের হৃদয়ে যিনি শ্রীগৌরপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৫॥

যিনি গৌরাশ্রিত জনগণের নিত্য আশ্রয়স্থল ও জগদ্‌গুরু, যিনি নিজ গুরু শ্রীগৌরকিশোরের সেবাপরায়ণ এবং যিনি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধমাত্রে পরমাদরবিশিষ্ট, তাঁহাকে প্রণাম করি, আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৬॥

যিনি শ্রীরূপসনাতন ও রঘুনাথের কীর্ত্তকেতন উত্তোলন করিয়া বিরাজমান, এই ধরণীতলে যাঁহাকে পাণ্ডিত্যপ্রতিভাময় শ্রীজীবের অভিন্নতনু বলিয়া অনেকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং যিনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ঠাকুর নরোত্তমের সমপ্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৭॥

জীবের প্রতি কৃপা করিয়া যিনি মূর্ত্তিমান্ হরিকীর্ত্তন-স্বরূপে প্রকাশিত, ধরণীর অপরাধভার-বিদূরণকারী শ্রীগৌরপার্ষদ এবং জীবের প্রতি জনকাপেক্ষাও অধিক বাৎসল্যের সুকোমল আকরকে আমি প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৮॥

শরণাগত কিঙ্করগণের (অভীষ্টপ্রদানে) যিনি কল্পতরুসদৃশ, বৃক্ষকেও ধিক্কারকারী যাঁহার বদান্যতা ও সহিষ্ণুতা এবং বরদশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও যাঁহার দিব্য শ্রীপাদপদ্মের পূজা করিয়া থাকেন,

তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৯॥

পরমহংসকুলতিলক, পরমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তির যিনি অধিপতি, পতিতকুলের উদ্ধার নিমিত্ত যিনি যতিবেশ (ভিক্ষুবেশ) ধারণকারী এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডী যতিগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি, আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১০॥

যিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পরম প্রিয় অনুচর, যাঁহার শ্রীচরণরেণু আমি মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্যের অভিমান করিতেছি, সেই অদ্ভুত পাবনীশক্তিসম্পন্ন শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১১॥

শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আরতি রচনা করেছিলেন। আমরা যখন সন্ধ্যা সময় আরতি করি সেই কীর্ত্তনটা আমরা করি :

জয়রে জয়রে জয় গৌর-সরস্বতী।
ভকতিবিনোদান্বয় করুণামুরতি ॥
প্রকাশিলে গৌরসেবা ভূবনমঙ্গল।
ভকতিসিদ্ধান্ত শুদ্ধ প্রজ্ঞান উজ্জ্বল ॥

ভগবানের কথা, মহাপ্রভুর কথা প্রচার করবার জন্য, এই জগতকে ধন্য করবার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর করুণা করে বিমলা দেবীর আরাধনা করে যে পরম পুত্র তিনি পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি আমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে আমরা পরমগুরুদেবকে পেয়েছি আরও বড় বড় গুরুবর্গকে পেয়েছি, বড় বড় দিকপালগণকে পেয়েছি—তিনি না আসতেন আজকে আমরা এই গৌড়ীয় মঠের কোথায় থাকতাম, আমরা কিছুই জানতাম না ।

প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নির্ভীক প্রচারক ছিলেন—

তিনি মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ লিখেছেন :

নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্নবিচ্ছিন্নকর্ত্রী
বিবুধবহুল-মৃগ্যা-মুক্তি-মোহান্ত-দাত্রী।
শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী
বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী॥

লোকে বলে, "সাধুরা আবার যুদ্ধ করেন না কি?" কিন্তু সাধুরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করেন? মায়ার সঙ্গে। তাঁরা মায়াকে পরাজিত করে মায়ার প্রভুর, ভগবানের সেবায় সবাইকে লাগিয়ে দেন।

কৃপয়া হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিধরং
ধরণীভরহারক-গৌরজনম্।
জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥

শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বললেন যে, "প্রভুপাদ বজ্রের মত কঠিন এবং পদ্মের মত কমল ছিলেন। পিতা যেমন তার পুত্রের প্রতি স্নেহ করেন, আমাদের গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ পিতার চাইতে আমাদেরকে অধিক স্নেহ করতেন।" শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "আমি যে কথাগুলা বললাম, শুনলে তোমাদের এখন ভালো লাগবে না, কিন্তু যখন আমি থাকব না, তখন এই কথাগুলা তোমাদের মনে পড়বে।" তার কথাগুলো এই জগতে প্রচারিত হউক—যেটা তিনি আমাদের দিয়েছেন, সেটা এই জগতে অন্য কেউ দিতে পারেন না। এই জগতে প্রভুপাদ যে সব আমাদেরকে ব্যবস্থা করেছেন, সেগুলা আমাদেরকে সব সময় মনে রাখতে হবে । শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন :

- "এই জগতে আমরা কাঠ পাথর মিস্ত্রি হতে আসি নি। জগতের জীবকে উদ্ধার করতে আমরাদের আসা।"
- "জীবের সেবা করতে করতে আত্মকল্যাণ লাভ হয়।" জীবকে দয়া করতে হবে—কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবকে এই পথে নিয়ে আসতে হবে।

শুধু নিজে হরিনাম করলে হবে না, অপরকে হরিনাম করাতে হবে। আর ‘হরিবল, হরিবল’ করলে হবে না—হৃদয় থেকে বলতে হবে। নিত্যসেবা করতে হবে।

- “কোটি কোটি হসপিটাল তৈরি না করার চেয়ে, কোটি কোটি রোগীর সেবা না করার চেয়ে একজন কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে তুমি যদি এই পথে আনতে পার, তাহলে কোটি গুন উত্তম হবে !”
- “তোষামোদকারী কখনও গুরু হতে পারেন না।”
- “শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে’ নিরুৎসাহিত হবেন না ; নিজ ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণকীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তন করবেন। জগতে শ্রীরূপানুগচিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্বা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তাতে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে।”
- “মনের খেয়াল খুশিমত ভজনের অভিনয়কে ভজন বলে না। গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করে তাঁদের মন সন্তুষ্টি বিধান করার নামই হইল ভজন।”
- “হরিভজন-পরায়ণ ভক্ত গুরুর নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভক্ত নিত্যকাল গুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস—তাহা হরিভজন নহে—মায়ার ভজন। কোনও ব্যক্তি যদি গুরুর আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ত্যাগ, তপস্যাচরণ, নামসঙ্কীর্ত্তন, তপ, ধ্যান—প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুশীলনও করিতে প্রবৃত্ত হন, তবেও তিনি একটুকুও হরিভজন করিতেছেন না, পরন্তু নিজেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিতেছেন মাত্র।

‘নিজেন্দ্রিয় প্রীতি’ হরিভজনের কপটসজ্জায় প্রকাশিত হইয়া

উপভোগের ছলনায় অনেক সময় লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠাশা কনক, কামিনী সংগ্রহেচ্ছায় হরিভজনের কপট অভিনয় ‘হরিভজন’ নহে, কেবল কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র।

হরিভজনের মূলই গুরু ও বৈষ্ণবানুগত্য। গুরুর আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনের ছলনা “ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার” ন্যায় কুচেষ্টা। বদ্ধাবস্থায় ত’ গুরুর আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনে প্রবেশ লাভই করা যাইতে পারে না—সিদ্ধাবস্থাতে যে সিদ্ধদেহে হরিভজন-প্রণালী তাহাতেও নিত্য গুরুদেবের আনুগত্য বর্ত্তমান। শ্রীহরির নিত্য আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তদনুগজনের আনুগত্য না থাকিলে অহংগ্রহোপাসনারূপ অপরাধমাত্র সার হয়।”

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কাছে প্রার্থনা করি, “হে প্রভুপাদ, আপনি যেখানে যে অবস্থায় থাকেন না কেন, আপনি যে নিত্যলীলা করে আনন্দে অবস্থান করছেন—আপনার অভাগা সন্তানগণ এই জগতে পড়ে আছে, এই জগতে মায়ার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, এই মায়ার মধ্যে থেকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে—প্রভু, আপনার চরণে নিবেদন করি যে, আপনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন, আমাদেরকে কৃপা করবেন যেন আমরা আপনার চরণে আশ্রয় করে আর বিচ্যুত হব না। গুরুপরম্পরার মাধ্যমে যারা আপনার নিজজন এই জগতে ভগবানের কথা প্রচার করছেন, মহাপ্রভুর কথা প্রচার করছেন, তাঁদের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে আমরা বন্দনা করি, আমাদের বৃন্দাবনের রাধা-গোবিন্দের সেবায় যেন মতি হয়।”

আপনারা জানেন যে, শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ প্রথম ১৯২৬ সালে কলকাতায় শ্রীল প্রভুপাদের চরণে এসিছিলেন, তারপর মায়াপুরে মঠ যোগদান করে তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তাঁর অন্তিম কালে যখন শ্রীল প্রভুপাদ বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে অপ্রকট লীলা করেছেন, তার কিছু মুহূর্ত আগে শ্রীল প্রভুপাদ একটা কীর্ত্তন শুনতে চেয়েছিলেন। একজন কীর্ত্তন করতে শুরু করলেন কিন্তু হঠাৎ করে কীর্ত্তন থামিয়ে দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ খবু অসন্তুষ্ট

হয়ে বললেন, “আমি কীর্ত্তনটা শ্রীধর মহারাজের মুখে শুনব—আমি সুরটা শুনতে চাই নি ! আমি কীর্ত্তন শুনব। শ্রীধর মহারাজ কোথায়? তাঁকে ডেকে নিয়ে এস।” তখন শ্রীল শ্রীধর মহারাজ এই শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ কীর্ত্তন করেছিলেন। তারপর কীর্ত্তনটা শুনে প্রভুপাদ চলে গিয়েছিলেন। সবাই তখন বুঝতে পেরেছিলেন—এই ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ ইঙ্গিত দেখালেন যে, রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করবার জন্য শ্রীল শ্রীধর মহারাজ একমাত্র প্রচারক ছিলেন।

শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ একটা পাঠে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলা স্মরণ করে বললেন :

তাঁর অন্তিম কালে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কিছু ক্ষণ ধরে দেখালেন যে, তাঁর হার্ট ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল। কবিরাজি চিকিৎসা চেয়েছিলেন, কিছু এলোপ্যাথি চিকিৎসা দেওয়া হল, কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে টের পেলেন যে, তাঁর শরীর আরও দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল।

অক্টোবের ১৯৩৬ সালে কয়েক ভক্তকে নিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে যাত্রা করলে তাঁর ভজনকুটিরে (শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ, চটকপর্ব্বতে) থাকলেন। তাঁকে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্লোক “নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্” শুনতে ভালো লাগল। প্রতি দিন এই শ্লোকটা তাঁর সম্মুখে গাওয়া হল। যাযাবর মহারাজ ‘শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ’ কীর্ত্তনও গাইতেন।

ওই সময় শ্রীল প্রভুপাদ গোস্বামী মহারাজকে (তখন অপ্রাকৃত প্রভু) লন্ডনে পাঠিয়ে দিলেন। খুরদা স্টেশনে এসে শ্রীল প্রভুপাদ নিজের গলা থেকে মালা নিয়ে অপ্রাকৃত প্রভুর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, “যাও, যদি কেউ হরিনাম নিতে চাইবেন, আমি তোমাকে হরিনাম দিতে অনুমতি দিচ্ছি।”

এক মাস পরে শ্রীল প্রভুপাদ কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। আমি ও আর কয়েকজন ভক্তরা কটকে থাকলাম ভিক্ষা করবার

জন্য। যখন আমরা খবর পেলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদের শরীর দিনের পর দিন অধিকতর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, আমরাও কলকাতায় তখন ফিরে এলাম। ফিরে এসে দেখলাম যে, ওই বছর সেখানে তীব্র শীতকাল ছিল। চিকিৎসা চলছিল অথচ প্রভুপাদের শরীর উন্নত হল না। আমরা তাঁর রোগশয্যায় পরিচর্যা করতাম। আমিও রাতে ২ ঘণ্টা থেকে সকাল বেলা ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিচর্যা করতাম।

তাঁর চলে যাওয়ার আগে, শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে ডেকেছিলেন এবং 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ' কীর্ত্তন গাইতে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন (এই প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উচ্চতম সাধনা)। তখন ২৪ ঘণ্টা পরে—সেটা ১ জানুয়ারি ছিল— সকাল বেলায় তিনি এই জগৎ ছেড়ে দিলেন। তিনি শুয়ে ছিলেন, তারপর তাঁর শরীরে তিনবার হেঁচকা হল, তারপর সব স্থির হয়ে গেল...

আমরা তখন বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁর শ্রীদেহ নিয়ে এলাম, ওখানে কৃষ্ণনগর পৌঁছে যাওয়ার জন্য একটা বিশেষ ট্রেন ব্যবস্থা হল। কৃষ্ণনগর থেকে বাসের ছাদে স্বরূপগঞ্জ ঘাটে এলাম। সরস্বতী নদী পার করে আমরা আবার তাঁকে কাঁধে বহন করতে করতে শ্রীচৈতন্য মঠে পৌঁছে গেলাম। সেই ভাবে, চৈতন্য মঠ পৌঁছে যাওয়ার জন্য আমাদের সারা দিন লাগল। আমরা সকাল বেলায় যাত্রারম্ভ করলাম আর সন্ধ্যা ৭-৮টায় চৈতন্য মঠ পৌঁছে গেলাম। তারপর মাটি খনন করা শুরু হল। আমরা সেই সেবায় নিয়ে নিজেকে নিযুক্ত করলাম। পরের দিন সকাল বেলায় শ্রীল প্রভুপাদকে সেখানে বসানো হলেন। আমি এখনও তাঁর সম্ভ্রান্ত স্বরূপ মনে করি। তাঁর বর্ণ ছিল গোরা এবং যখন তিনি ২৪ ঘণ্টার পর আসনে বসেছিলেন, তখন তিনি সম্ভ্রান্ত আচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তির মত বসলেন—লম্বা, সূক্ষ্ম এবং খুব কমল... তারপর, তাঁর ঘিরে লবণ দেওয়া হল, তারপর মাটি। যখন মাটি তাঁর গলার পর্যন্ত হল, আমি চলে গেলাম— যে তাঁর মাথা আচ্ছাদন হয়ে যাবে, আমি

সেটা সহ্য করতে পারব না। আমি চলে গেলাম। কিছু ক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখলাম যে, সব শেষ হল এবং একটি তুলসী গাছ তার উপর রেখে দেওয়া হল।

তারপর কীর্ত্তন করতে করতে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি ঘিরে পরিক্রমা করলাম। একজন শ্রীমদ্ভাগবতম্ পড়লেন, এবং যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ একটি কবিতা রচনা করেছিলেন, সে কবিতাটা আমি একজনকে পড়তে বিশেষ অনুরোধ জানালাম। শ্রীল প্রভুপাদ সেই কবিতা অত্যন্ত মাধুর্য্য ও বিলাপ-ভাবে রচনা করেছিলেন।

চারিশত ঊনত্রিংশে, জ্যৈষ্ঠে দিন একত্রিংশে,
চৈতন্যাব্দে, মাস—ত্রিবিক্রম।
শ্রীব্রজপত্তনে থাকি’, ‘গৌরহরি’ বলি’ ডাকি,
দয়িতদাসিয়া নরাধম ॥১॥
নবদ্বীপ-মায়াপুরে, প্রভুগৃহ নাতিদূরে,
অনুভাষ্য কৈল সমাপন।
শ্রীগৌরকিশোর-দাস, সম্প্রতি কুলিয়া বাস,
যাঁর ভৃত্য—এই অভাজন ॥২॥
আজি এই সুখ-দিনে, ভকতিবিনোদ বিনে,
সুখবার্ত্তা জানাব কাহারে?
‘অনুভাষ্য’ শুনি’ যেই, পরম প্রফুল্ল হই’,
উরুকৃপা বিতরিল মোরে ॥৩॥
তাঁহার করুণা-কথা, মাধব-ভজন-প্রথা,
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁর সম অন্য কেহ, ধরিয়া এ নরদেহ,
নাহি দিল কৃষ্ণপ্রেমধনে ॥৪॥
সেই প্রভু-শক্তি পাই’, এবে ‘অনুভাষ্য’ গাই,
ইহাতে আমার কিছু নাই।
যাবৎ জীবন রবে, তাবৎ স্মরিব ভবে,
নিত্যকাল সেই পদ চাই ॥৫॥
গদাধর-মিত্রবর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
সদা কাল গৌর-কৃষ্ণ যজে।
জগতের দেখি’ ক্লেশ, ধরিয়া ভিক্ষুক-বেশ,
অহরহঃ কৃষ্ণনাম ভজে ॥৬॥
শ্রীগৌর-ইচ্ছায় তুই, মহিমা কি কব মুই,
অপ্রাকৃত-পারিষদ-কথা।
প্রকট হইয়া সেবে, কৃষ্ণ-গৌরাভিন্ন-দেবে,
অপ্রকাশ্য কথা যথা তথা ॥৭॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজজন, ভকতিবিনোদ-গণ,
অপ্রাকৃত-ভাবে যাঁর স্থিতি।
‘অনুভাষ্য’ সযতনে, পাঠ কর ভক্ত-সনে,
লাভ কর যুগল-পীরিতি ॥৮॥

সেই কবিতাটা পড়া হল। তারপর, হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে পড়া হল। তারপর একজন আমাকে অনুরোধ জানালেন যে, আমি ‘শ্রীরূপমঞ্জরীপদ’ কীর্ত্তন গাই যে

দুদিন আগে আমি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ অনুসারে গাইলাম, আমি সেটাই করলাম। তখন সব শেষ হয়ে গেল।

আমরা সবাই উপবাস করলাম—শ্রীল প্রভুপাদ দুই-এক ঘণ্টা সূর্যোদয়ের আগে অপ্রকট হলেন আর চৈতন্যমঠে তাঁকে নেওয়ার জন্য সারা শুক্রবার লাগল, সবাই উপবাস করলেন, এমন কি একবিন্দু জলও পেলাম না। পরের দিন শনিবার ছিল, তখন আমরা ৯-১০টার সময় কিছু প্রসাদ নিলাম। এরপর একটা সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আমাদের কলকাতায় যেতে হল। সারা শরীর এত ক্লান্ত হয়ে গেল যে আমরা আর চলতে পারছিলাম না তবু যেতেই হল। এরপর থেকে মায়াপুরে অনেক শিষ্যগণের ভিড় হয়ে উঠল। সবাই ব্যথায় ব্যথায় ও বিলাপ -ভাবে আসতেন— যেখানে সমাধি হল সেখানে সমস্ত ছোটো জায়গাটা লোকে পরিপূর্ণ হল। সবাই কাঁদতে কাঁদতে এলেন। সেই ভাবে ১৯৩৬ সাল চলে গেলেন আর ১৯৩৭ শুরু হল। এই ঘটনা তার মধ্যে সন্ধিতে হয়েছিল।

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে এই শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্ রচনা করেছিলেন :

নীতে যস্মিন্ নিশান্তে নয়নজলভরৈঃ স্নাতগাত্রার্ব্বুদানাং
উচ্চৈরুৎক্রোশতাং শ্রীবৃষকপিসুতয়াধীরয়া স্বীয়গোষ্ঠীম্।
পৃথ্বী গাঢ়ান্ধকারৈর্হৃতনয়নমণীবাবৃতা যেন হীনা
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥১॥

শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী নিশান্তকালে লক্ষ লক্ষ বিলাপকারী, নয়নধারা-সিঞ্চিত-গাত্র জনগণের মধ্য হইতে যাঁহাকে অধীরভাবে নিজ গোষ্ঠীমধ্যে আকর্ষণ করিলে যাঁহাকে হারাইয়া এই পৃথিবী হৃতনয়নমণিজনের ন্যায় (সরস্বতী ঠাকুরের গূঢ় নাম “নয়নমণি”) গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল,—হে (প্রভুদর্শনবিরহিত) আমার দীন নয়ন ! (পক্ষান্তরে হে দীনোদ্ধারণ ! অথবা সঙ্গে না লইবার জন্য করুণাতে কৃপণতো-প্রকাশকারী হে নয়ন নামক প্রভুজন) ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥১॥

যস্য শ্রীপাদপদ্মাৎ প্রবহতি জগতি প্রেমপীযূষধারা
যস্য শ্রীপাদপদ্মচ্যুতমধু সততং ভৃত্যভৃঙ্গান্ বিভর্ত্তি।
যস্য শ্রীপাদপদ্মং ব্রজরসিকজনো মোদতে সম্প্রশস্য
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥২॥

যাঁহার পাদপদ্ম হইতে জগতে প্রেমসুধানদী প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার পাদপদ্মচ্যুত মধু নিরন্তর পান করিতে করিতে অনুচর-মধুকরগণ নিজ নিজ জীবন ধারণ করিতেছে, ব্রজের বিশ্রম্ভ-রসাশ্রিত জন যাঁহার পাদপদ্মের প্রশংসা করিতে সুখবোধ করিয়া থাকেন—হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥২॥

বাৎসল্যং যচ্চ পিত্রো জগতি বহুমতং কৈতবং কেবলং তৎ
দাম্পত্যং দস্যুতৈব স্বজনগণ-কৃতা বন্ধুতা বঞ্চনেতি।
বৈকুণ্ঠস্নেহমূর্ত্তেঃ পদনখকিরণৈর্যস্য সন্দর্শিতোঽস্মি
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৩॥

মাতাপিতার বাৎসল্য বলিয়া জগতে যাহা বহুমানিত, (হরিভক্তির বাধারূপে) তাহা ছলনা মাত্র, সমাজপ্রচলিত তথাকথিত পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম (উভয়ের সম্ভাব্য নিরুপাধিক প্রেমসম্পদ্ অর্জ্জনের উদ্যমলুণ্ঠনকারী আসুরিক প্রচেষ্টারূপে) দস্যুতা ভিন্ন কিছুই নয় এবং বন্ধুতা বঞ্চনামাত্র—এই সমুদায় বিচার যে অপ্রাকৃত স্নেহময় বিগ্রহ মহাপুরুষের পদনখকিরণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছি—হে দীন নয়ন, ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৩॥

যা বাণী কণ্ঠলগ্না বিলসতি সততং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে
কর্ণক্রোড়াজ্জনানাং কিমু নয়নগতাং সৈব মূর্ত্তিং প্রকাশ্য।
নীলাদ্রীশস্য নেত্রার্পণভবনগতা নেত্রতারাভিধেয়া
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কণ্ঠস্বররূপে যে বাণী সর্ব্বদা জনগণের কর্ণক্রোড়ে বিলাস করিতেন, তিনিই কি কর্ণ হইতে নয়নগোচর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীনীলাচলচন্দ্রের (রথযাত্রাকালে) নয়নার্পণরূপ প্রসাদপ্রাপ্ত প্রাসাদে প্রকটিত হইয়া “নয়নমণি” নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেন? হে দীন

নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই ভৃত্যকে সেইখানে লইয়া চল ॥৪॥

গৌরেন্দোরস্তশৈলে কিমু কনকঘনো হেমহৃজ্জম্বুনদ্যা
আবির্ভূতঃ প্রবর্ষৈর্নিখিলজনপদং প্লাবয়ন্ দাবদগ্ধম্ ।
গৌরাবির্ভাবভূমৌ রজসি চ সহসা সংজুগোপ স্বয়ং স্বং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৫॥

শ্রীভাগবতোক্ত জম্বুনদের নির্ম্মল স্বর্ণময় জল আকর্ষণ করিয়া কি এই কাঞ্চনবর্ণ মেঘ শ্রীগৌরচন্দ্রের অস্তগমনশৈলে উদিত হইয়া (ত্রিতাপ)-দাবাগ্নিদগ্ধ সমুদয় দেশকে প্রচুর বর্ষণ দ্বারা প্লাবিত করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ভূমিরজে অকস্মাৎ আত্মগোপন করিলেন ! হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৫॥

গৌরো গৌরস্য শিষ্যো গুরুরপি জগতাং গায়তাং গৌরগাথা
গৌড়ে গৌড়ীয়-গোষ্ঠ্যাশ্রিতগণ-গরিমা দ্রাবিড়ে গৌরগর্ব্বী ।
গান্ধর্ব্বা গৌরবাঢ্যো গিরিধরপরমপ্রেয়সাং যো পরিষ্ঠো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৬॥

যিনি গৌরবর্ণ এবং শ্রীগৌরগাথাগানকারী নিখিল জগতের (স্বাভাবিক) গুরু হইয়াও যিনি শ্রীগৌরকিশোর নামক কোন মহাত্মার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি সমগ্র গৌড়মণ্ডলে শুদ্ধ গৌড়ীয় গোষ্ঠীর আশ্রয়দাতৃগণের গরিমাস্থল, যিনি দ্রাবিড় বৈষ্ণবগণের (লক্ষ্মীনারায়ণোপাসকগণের) নিকট শ্রীগৌরপ্রদত্ত (শ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজভজনের) কথা কীর্ত্তন করিতে গর্ব্ব অনুভব করেন, শ্রীগান্ধর্ব্বার গণেও যাঁহার গরিমাসম্পদ্ দৃষ্ট হয় এবং গিরিধারীর পরম প্রিয়মণ্ডলে যিনি শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৬॥

যো রাধাকৃষ্ণনামামৃতজলনিধিনাপ্লাবয়দ্বিশ্বমেত-
দাম্লেচ্ছাশেষলোকং দ্বিজনৃপবণিজং শূদ্রশূদ্রাপকৃষ্টম্ ।
মুক্তেঃ সিদ্ধেরগম্যঃ পতিতজনসখো গৌরকারুণ্যশক্তি-
র্যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৭॥

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণনামামৃত-সমুদ্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও

অপশূদ্র এমন কি ম্লেচ্ছ পর্যন্ত অশেষ লোকাত্মক সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াছেন, মুক্ত ও সিদ্ধগণের অগম্য হইয়াও যিনি পতিতজনবন্ধু এবং শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তি বলিয়া পরিচিত—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৭॥

অপ্যাশা বর্ত্ততে তৎ পুরটবরবপুর্লোকিতুং লোকশন্দং
দীর্ঘং নীলাব্জনেত্রং তিলকুসুমনসং নিন্দিতার্দ্ধেন্দুভালম্।
সৌম্যং শুভ্রাংশুদন্তং শতদলবদনং দীর্ঘবাহুং বরেণ্যং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৮॥

সেই লোকমঙ্গলকর পুরটসুন্দর মূর্ত্তি-দর্শনের কি আশা আছে? সেই সুদীর্ঘ, নীলকমলনয়ন ও তিলফুলজয়ী নাসিকা, সেই অর্দ্ধচন্দ্রধিক্কারী ললাট, সেই সৌম্যবদনকমল, সেই শুভ্রজ্যোতিঃ দন্তপংক্তি ও সেই আজানুলম্বিত বাহুসমন্বিত রমণীয় বিগ্রহের পুনর্দর্শনের কি আশা আছে? হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৮॥

গৌরাব্দে শূন্যবাণান্বিতনিগমমিতে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থ্যাং
পৌষে মাসে মঘায়ামমরগণগুরোর্বাসরে বৈ নিশান্তে।
দাসো যো রাধিকায়া অতিশয়দয়িতো নিত্যলীলাপ্রবিষ্টো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৯॥

চারি শত পঞ্চাশৎ সংখ্যক (৪৫০) গৌরাব্দে পৌষ মাসে, কৃষ্ণপক্ষে, চতুর্থী তিথিতে, মঘা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে নিশান্ত সময়ে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অতীব দয়িত অনুচর যিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৯॥

হাহাকারৈর্জ্জনানাং গুরুচরণজুষাং পূরিতাভূর্নভশ্চ
যাতোঽসৌ কুত্র বিশ্বং প্রভুপদবিরহাদ্ধন্ত শূন্যায়িতং মে।
পাদাব্জে নিত্যভৃত্যঃ ক্ষণমপি বিরহং নোৎসহে সোঢুমত্র
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥১০॥

জনসাধারণের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবারত শিষ্যগণের হাহাকারে

সমস্ত পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। ঐ মহাপুরুষ কোথায় গেলেন? হায়! সমস্ত বিশ্ব আজ প্রভুপাদ-বিরহে শূন্যবোধ হইতেছে। পাদপদ্মের নিত্য ভৃত্য ক্ষণমাত্র বিরহও সহ্য করিতে অসমর্থ। হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥১০॥

(৩) শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির

শ্রীচৈতন্য মঠে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে—শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির।

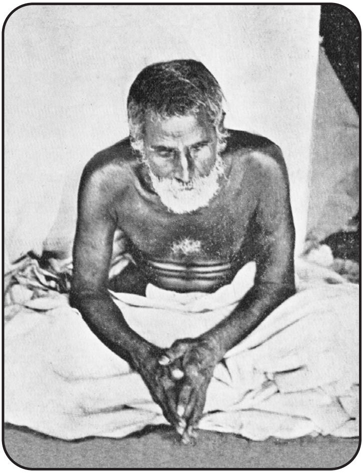

বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপে বৃন্দাবন থেকে এসেছিলেন। সবাই ভাবলেন যে, তিনি পাগলের মত দেখলেন—ভালো দেখতে পারলেন না, ভালো কাপড় পড়তেন না, তিনি কিছু মানতেন না। দুষ্ট ছেলেরা তাঁর গায়ে পাথর ছুড়ে দিতেন আর তিনি শুধু কিছু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আরে গোপাল! তুমি কী করছ? আমি তোমার বাবা-মার কাছে নালিশ করব!" লোক তাঁর গায়ে পাথর ছুড়ে দিতেন, থুতু ফেলতেন, অনেক কিছু করতেন— কেউ তাঁকে চিনতে পারতেন না।

এক দিন বাবাজী মহারাজ চাঁপাহাটি থেকে গোদ্রুমদ্বীপে (স্বানন্দ সুখদকুঞ্জে) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। তিনি প্রায় অন্ধ ছিলেন এবং হাঁটতে ঠিক মত পারতেন না, আর তার উপরে ওই রাত অমাবস্যা ছিল—ওই সময় কোন বিদ্যুৎ ছিল না, তাই বাহিরে কুচকুচে কালো অন্ধকার ছিল। যখন শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী

মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাড়িতে এসে হাজিল হলেন, তখন তাঁর বাহির থেকে ডাক শুনে আর বাবাজী মহারাজকে দেখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবাক হয়ে গেলেন, "আরে মহারাজ, আপনি? এই অন্ধকার রাতে আপনি কি করে এসেছেন?"

বাবাজী মহারাজ উত্তরে বললেন, "আমাকে একজন সাহায্য করল।"

"কে? কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, আপনি একা এখানে।"

"তাই না কি? কিন্তু কেউ এসে আমার হাত ধরে এখানে নিয়ে এলেন। ও এখনই কাছে ছিল।"

* * *   * * *   * * *

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের চরিত্র ছিল আশ্চর্যবৎ। ঘাটে একটা কাপড় লয়ে তিনি কাপড় দিয়ে গিঁট গিঁট বেঁধে করে এই ভাবে তুলসী-মালার পরিবর্তে নাম করতেন। তিনি অন্ন গ্রহণ করতেন কিন্তু কখনও রান্না করতেন না—জলের মধ্যে চাল তিন-চার দিন রেখে যখন ইহা কিছু নরম হত, তখন তিনি ওই অন্ন খেতেন। তা ছাড়া তিনি আর কিছু খেতেন না।

ছয়মাস ধরে তিনি ধর্ম্মশালায় সাধারাণ পুরীষত্যাগের স্থানে (পাবলিক ল্যাট্রিনে) বাস করতেন, আর যখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, "মহারাজ, আপনি কি করে এত দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারেন?" তিনি বলতেন, "যে দুর্গন্ধ এখানে আছে, আমি কিছু মনে করি না, কিন্তু যে বিষয়ী লোকের মন থেকে দুর্গন্ধ এসে যায়, সেটা কি করে আপনি সহ্য করতে পারেন—সেটা আমি বুঝতে পারি না।"

এক বার যখন বাবাজী মহারাজ গঙ্গাতীরে কুটিরে থাকলেন, তখন আর একজন এসে সেখানে একটু পাশে বসবাস করতে লাগলেন এবং বাবাজী মহারাজকে অনুকরণ করতে লাগলেন। বাবাজী মহারাজ সাধারণভাবে তাঁকে সম্মান দিতেন কিন্তু একদিন তিনি ওইলোকের সম্বন্ধে বললেন, "যদি একজন মহিলা প্রসব করবার জন্য এখানে এসে তীব্র ব্যথা দেখাতে লাগে, তাহলে কি শিশু প্রসব হবে? প্রথমে গর্ভে শিশু আসতে হয়, তারপর স্বাভাবিক ভাবে প্রসব-বেদনা এসে যাবে এবং তারপর

শিশু প্রসব হয়। গর্ভবতী না হয়ে প্রসব-বেদনা নকল করলে, শিশু কি করে বের হবে? সেটা মজার কথা। সেইভাবে বাবাজীর বেষে নিজেকে সাজিয়ে নকল করা সঠিক বাবাজী স্বরূপ প্রদান করবে না।”

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ বিবাহিত ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বললেন, “বেশ *** বাবু বিবাহ করেছেন, তা ভালই। এখন তিনি প্রত্যেক দিন নিজ হস্তে বিষ্ণুনৈবেদ্য রন্ধন করে ঠাকুরকে নিবেদন করার পর সেই প্রসাদ সহধর্ম্মিণীকে সেবন করায়ে ‘বৈষ্ণব’ বুদ্ধিতে সহধর্ম্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করবেন, তাঁর প্রতি ভোগবুদ্ধির পরিবর্তে নানাবিধ সেবা গুরুবুদ্ধি করবেন, তাহলেই তাঁর মঙ্গল হবে। সমস্ত জগৎ—পৃথিবীর সমস্ত ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু। তিনি কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগিয়ে দিন, স্ত্রীকে নিজ সেবিকা না করে কৃষ্ণের সেবিকা-বুদ্ধিতে সম্মান করুন।”

একবার শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ গঙ্গাতীরে এক তালপাতার ঘরে বসে হরিনাম করছিলেন। রাতের সময় কেউ পাশে যাচ্ছিল এবং শুনতে পেল যে, বাবাজী মহারাজ আর একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন—আর স্বরটা ছিল এক মহিলার গলার স্বর। লোক ভাবল যে, বোধ হয় একজন মহিলা বাবাজী মাহারাজের কাছে এসেছিল। তালপাতার ঘর পাহারা দিয়ে লোকটি পাশে থাকল মহিলাকে দেখবার জন্য—মহিলাটি যখন চলে যাবে, তখন ও তাকে দেখতে পাবে। এক দিন কেটে গেল, দু দিন কেটে গেল, কেউ বাবাজী মহারাজের ঘরটা থেকে বেরিয়ে গেলন না। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে লোকটি ভিতরে জোর করে এল কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না—শুধু বাবাজী মহারাজ বসে ছিলেন। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল, তখন আবার মহিলার গলার স্বর শুনতে পেল কিন্তু কী বা যা বলা হল, সেটা ও শুনতে পারল না। তাই আপনারা বুঝতে পারছেন যে, স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকা সেখানে এসেছিলেন—শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ তাঁর নিজজন, স্বপার্ষদ।

* * * * * * * * *

যখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্রহ্মচারী ছিলেন, তিনি এক দিন স্থির করলেন যে, তিনি দীক্ষা গ্রহণ করবেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে এসে তিনি তাঁর ইচ্ছা জানাচ্ছিলেন কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে (তাঁর নাম ছিল বিমলা প্রসাদ ওই সময়) দীক্ষা নেওয়ার জন্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের কাছে এসে তিনি বাবাজী মহারাজের কাছে দীক্ষা ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন কিন্তু বাবাজী মহারাজ তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন, "যা এখান থেকে ! চলে যাও !" প্রভুপাদ অবাক হয়ে ভাবলেন, "একটি ছেলে গুরুর কাছে এসে দীক্ষা ভিক্ষা করছে আর গুরুদেব বলছেন যা এখান থেকে ? সেটা কী ?"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে ফিরে এসে তিনি ওই দিনের ঘটনা বলে দিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন, "কালকে আবার তাঁর কাছে যাও।"

পরের দিন শ্রীল প্রভুপাদ আবার শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের কাছে এসে হাজির হলেন। এবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন, "তুমি আবার এসেছ ? তোমার বাবা মহাপুরুষ ও পরম বৈষ্ণব, ওঁর কাছে তুমি দীক্ষা নেবে না কেন ?"

"বাবা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"ঠিক আছে, কিন্তু আমার গোর হরিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। যদি তিনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।"

পরের দিন বা কয়েক দিন পর শ্রীল প্রভুপাদ আবার শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের কাছে এসেছিলেন । বাবাজী মহারাজ বললেন, "তুমি ? আমি ভুলে গিয়েছি, জিজ্ঞাসা করি নি।" আবার দীক্ষা হল না। এরপর শ্রীল প্রভুপাদ ভাবতে লাগলেন, "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ অনুসারে আমি এসেছি, উনি বললেন যে, তিনি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করবেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছেন। সেটার কারণ কী ?" তখন শ্রীল প্রভুপাদ বুঝতে পেরেছেন, "আমার কিছু প্রয়োজন আছে—আমি ভাবছি যে, আমার চরিত্র ভালো,

আমি শিক্ষিত, আমি বড় জ্ঞানী, আমার মনের জোর অনেক বেশী, কিন্তু এটা সব অহঙ্কার। বাবাজী মহারাজ আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, সেটা কোন গুণ বা অধিকার নয়। তাই আমাকে ভাবতে হবে যে, আমি অযোগ্য, আমি কাঙ্গাল, আমি তাঁর শ্রীচরণের কৃপার ভিক্ষুক। আমি এসেছি তাঁর করুণা ভিক্ষা করবার জন্য। অসহায় ও অতি দীন, বিনীত হয়ে তাঁর কৃপার বিনা আমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তাঁর কৃপা চাই ! আমার সব গর্ব ভেঙ্গে গিয়েছে—আমি এত অযোগ্য যে উনি মহাপ্রভুর কাছে আমার কথা বলেন নি। উনি আমাকে একদম উপেক্ষা করেছেন। এমন কি আমার কথা ওঁর স্মরণপথে প্রবেশ করে নি।” এই ভাবে লাজ্জুক হয়ে এবং নিজেকে ঘৃণা করে শ্রীল প্রভুপাদ আবার শ্রীল বাবাকী মহারাজের কাছে এসেছিলেন। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন, “হ্যাঁ, মহাপ্রভু তোমাকে স্বীকার করেছেন।” তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে এবার দীক্ষা মন্ত্রটা দিয়েছিলেন।

পরে, যে দিন শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ অপ্রকট লীলা অভিনয় করেছিলেন, সেই দিন বড় ঘটনা হয়েছিল। বাবাজী মহারাজের চলে যাওয়ার খবর পেয়ে সমস্ত নবদ্বীপের স্মর্ত বাবাজী ও গোসাঞ্রি তাঁর দেহ নিজের স্বার্থের জন্য কেড়ে নিতে চাইছিলেন। অনেক তর্কবিতর্ক শুরু হল। যখন শ্রীল প্রভুপাদ খবর পেয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যকে (কুঞ্জ বাবু) নিয়ে বাবাজী মহারাজের ভজনকুটিরে এসেছিলেন। এসে তিনি দেখলেন যে, অনেক লোকগুলা তাঁর দেহের জন্য তর্কাতর্কি করছিলেন। পুলিশও সেখানে এসেছিল। কেউ বিচার করতে পারলেন না, কে বাবাজী মহারাজের শ্রীদেহ নিয়ে তাঁকে সমাধি দেবে। সবাই দাবি করলেন যে, বাবাজী মহারাজ তার গুরু ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ সবাইকে বললেন, “সবাই বলেন যে, তারা বাবাজী মহারাজের শিষ্য কিন্তু তার মধ্যে কেউ শিষ্য নয়। যখন বাবাজী মহারাজ জীবিত ছিলেন, তখন কেউ মোটেই গ্রাহ্য করত না আর এখনই সবাই বলছেন উনি আমার গুরু। সবাই মিথ্যাবাদী ! ওরা নিজেকে সাধু সাজায় কিন্তু ওরা সাধু নয় । এখানে অনেক বাবাজী

উপস্থিত হয়, কিন্তু ওরা সবাই স্ত্রী-সঙ্গ করছে। আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে কেউ আমার সামনে মিথ্যা কথা বলতে পারবে না—যে ৬ মাস ধরে কোন স্ত্রী সঙ্গ করে নি, সে হাত তুলে দাও।”

ভয় বা লজ্জা পেয়ে কয়েক বাবাজী চলে গেল। শ্রীল প্রভুপাদ আবার বললেন, “যে ৩ মাস ধরে কোন স্ত্রী-সঙ্গ করে নি, সে হাত তুলে দাও।”

আবার কয়েক জন চলে গেল।

“এক মাস ধরে।”

আরো বেশী চলে গেল।

“গত তিন দিনের মধ্যে কে কোন স্ত্রী সঙ্গ করে নি?” (স্ত্রী-সঙ্গের অনেক প্রকার আছে—এমন কি স্ত্রী লোকের কথা মনে ভাবলেই স্ত্রী সঙ্গ হয়।)

এটা শুনে সবাই চলে গেল। একজন পুলিশ তখন শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি করে বুঝতেন যদি তারা সবাই বলত যে, তারা কোন স্ত্রী সঙ্গ করে নি?”

“আমি বললাম যে, আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আমার সামনে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে না।”

তারপর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীদেহ নিয়েছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁকে সমাধি প্রদান করলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৯১৪ সালে তাঁর নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন এবং এক বছর পরে (১৯১৫ সালে) শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজও চলে গেলেন। উভয় গুরুদেবকে হারিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে বললেন, “আমি অসহায়। প্রভুর বিহীন সমস্ত ভার এখন আমার উপরে পড়ে গেল।”

শ্রীল প্রভুপাদ বললেন যে, শ্রীমতী রাধারাণীর স্বপার্ষদ, তাঁর নিজজন হয়ে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ হচ্ছেন গুণ মঞ্জরী। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, “আমার গুরুদেব নিজের নাম লিখতে পারতেন না তবু আমরা কখনও ভাবি নি যে, তিনি

বোকা বা অশিক্ষিত মানুষ। সব বিদ্যা, সব শিক্ষা তাঁর শ্রদ্ধায় (বিশ্বাসে) ছিল। উপরন্তু, এই জগতে এমন বিদ্যা নেই, এই চৌদ্দভুবনে এমন বুদ্ধি-বিবেক নেই, এমন মানুষ বা দেবতা নেই, যে আমার গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের একমাত্রই ধূলীকণার চাইতে বেশি ওজন হতে পারে।”

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের গুণ-মহিমা-কীর্ত্তন করবার জন্য এই শ্রীশ্রীমদ্-গৌরকিশোরনমস্কারদশকম্ চরনা করেছিলেন :

গুরোর্গুরো মে পরমো গুরুস্ত্বং
বরেণ্য ! গৌরাঙ্গগণাগ্রগণ্যে।
প্রমীদ ভৃত্যে দয়িতাশ্রিতে তে
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

সরস্বতীনাম-জগৎপ্রসিদ্ধং
প্রভুং জগত্যাং পতিতৈকবন্ধুম্।
ত্বমেব দেব ! প্রকটীচকার
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

ক্বচিদ্ব্রজারণ্যবিবিক্তবাসী
হৃদি ব্রজদ্বন্দ্বরহো-বিলাসী।
বহির্বিরাগী ত্ববধূতবেষী
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

ক্বচিৎ পুনর্গৌরবনান্তচারী
সুরাপগাতীররজোবিহারী।
পবিত্রকৌপীনকরঙ্কধারী
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

সদা হরের্নাম মুদা রটন্তং
গৃহে গৃহে মাধুকরীমটন্তম্।
নমন্তি দেবা অপি যং মহান্তং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

ক্বচিদ্রুদন্তঞ্চ হসন্নটন্তং
নিজেষ্টদেবপ্রণয়াভিভূতম্।
নমন্তি গায়ন্তমলং জনা ত্বাং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

মহাযশোভক্তিবিনোদবন্ধো !
মহাপ্রভুপ্রেমসুধৈকসিন্ধো !
অহো জগন্নাথদয়াস্পদেন্দো !
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

সমাপ্য রাধাব্রতমুত্তমং ত্ব-
মবাপ্য দামোদরজাগরাহম্।
গতোঽসি রাধাদরসখ্যরিদ্ধিং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

বিহায় সঙ্গং কুলিয়ালয়ানাং
প্রগৃহ্য সেবাং দয়িতানুগস্ত্ব।
বিভাসি মায়াপুরমন্দিরস্থো
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

সদা নিমগ্নোঽপ্যপরাধপঙ্কে
হ্যহৈতুকীমেষ কৃপাঞ্চ যাচে।
দয়াং সমুদ্ধৃত্য বিধেহি দীনং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

হে গুরুর গুরু ! আমার পরমগুরু, তুমি শ্রীগৌরাঙ্গগণের অগ্রগণ্য সমাজে পরম বরেণ্য। তোমার দয়িতদাসের আশ্রিত এই ভৃত্যের প্রতি প্রসন্ন হও। হে গৌরকিশোর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১॥

হে দেব ! জগতে পতিত জনের একমাত্র বন্ধু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামক ভুবনবিখ্যাত প্রভুকে তুমিই প্রকাশ করিয়াছ। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥২॥

তুমি কখন ব্রজধামে একান্ত বাস করিয়া ব্রজকিশোরযুগলের পরম গোপনীয় বিলাসপরায়ণ ; কিন্তু বাহিরে বৈরাগ্যবিধি পালন কর, কভু বা অবধূত বেশ গ্রহণ কর। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৩॥

কখনও বা তুমি গৌর-বনান্তে বিচরণ কর—গঙ্গাতটে সৈকতভূমিতে পরিভ্রমণ কর ; পবিত্র কৌপীন ও করঙ্গধারী। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৪॥

সর্ব্বদা পরমসুখে শ্রীহরিনামগানকারী এবং গৃহে গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণকারী যে মহাপুরুষকে দেবতাগণও নমস্কার করিয়া থাকেন—হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৫॥

নিজের ইষ্টদেবতার প্রণয়াভিভূত হইয়া কখন নৃত্য, কখন রোদন, কখন হাস্য, আবার কখন উচ্চ গীতপরায়ণ তোমাকে জনগণ প্রভূত নমস্কার বিধান করিয়া থাকেন। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৬॥

হে মহাযশস্বী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বন্ধো, হে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র প্রেমামৃতসিন্ধো ! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের কৃপাভাজন চন্দ্র ! হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৭॥

পরমোত্তম ঊর্জ্জব্রত উজ্জাপন করিয়া শ্রীদামোদরের উত্থানদিন-অবলম্বনে তুমি শ্রীরাধিকার আদরের সখীত্বসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াছ। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৮॥

কুলিয়া নগরের অধিবাসিগণের সঙ্গ পরিহার করিয়া তোমার অনুগত শ্রীদয়িতদাসের সেবা অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীমন্দিরে তুমি বিরাজ করিতেছ। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৯॥

সর্ব্বদা অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়াও এই (অধমজন) তোমার অহৈতুকী কৃপা যাচ্ঞা করিতেছে। দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া দয়া বিধান কর। হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১০॥

যখন শ্রীল গৌরকিশর দাস বাবাজী মহারাজ তাঁর নিত্য লীলায় প্রবেশ করলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সজ্জন তোষণীতে (১৯শ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায়) দুট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধগুলো আমরা জগতে মঙ্গল প্রদান করবার জন্য এখানে উপস্থাপন করছি।

আমার প্রভুর কথা (১)

আমি একটী বদ্ধজীব সুতরাং নানা প্রকারে অভাবগ্রস্ত। আমার অভাব পূরণের জন্য আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত অনেক বিষয় হস্তগত করিবার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করিতাম, বিষয় পাইলেই আমার অভাব পূরণ হইবে। অনেক সময় অনেক দুল্লভ বিষয় লাভ করিলাম কিন্তু আমার অভাব দূর হইল না। জগতে অনেক মহৎচরিত্র ব্যক্তি পাইলাম কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না। এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরম কারুণিক গৌর সুন্দর তদীয় প্রিয়তমদ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজ মঙ্গল হারাইয়া ছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন সুকৃতি প্রভাবে আমার মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকটে আমার প্রভু অনেক

সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়া পরবশ হইয়া আমাকে আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস হইতে থাকে। আমি জানিতাম নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম। কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে আদর্শ বৈষ্ণব ইহজগতে থাকিতে পারেন।

আমার প্রভুর করুণায় ক্রমে ক্রমে আমিও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রের পক্ষপাতী হইলাম। আমার প্রভু ইহ জগতে শ্রীগৌর কিশোর দাস নামে পরিচিত ছিলেন। বিগত বর্ষের চাতুর্ম্মাস্যাবসানে উত্থান একাদশী দিবসে তিনি অপ্রাকৃত গৌরধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইহজগতে মানবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান সমূহ হইতে মানবকে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে আমার প্রভুর ধারাবাহিক জীবনী আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব না। তবে আমার সম্মুখে তাঁহার অনুষ্ঠানাবলী এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা আমি শুনিয়াছি সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ গৌরহরির পরম প্রিয়তম পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের কয়েকটী কথা আমি লিখিতেছি। এই মহামহোদয়ের যে সকল কথা আমার অজ্ঞাত তাহা অপরের জানা থাকিলে, আমাকে জানাইলে আমি কৃতার্থ হইব।

সাধুগণের বাক্য ও অনুষ্ঠান হইতে আমাদের ন্যায় অভাব বিশিষ্ট জীবগণ তদনুসরণে নানা প্রকারে সমৃদ্ধ হইতে পারে। সাধুর চরিত্র ও অনুষ্ঠানাবলী শুনিলেও অনেক অসাধু হৃদয় শুদ্ধ হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পরমহংস বাবাজীর কয়েকটী কথা লিখি।

আমি শুনিয়াছি তিনি ফরিদ পুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর নিকটস্থ কোন গণ্ডগ্রামে অবর বৈশ্যকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব কাল। পিতৃদত্ত নাম বংশীদাস। এই মহাত্মা দার পরিগ্রহ করিয়া ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহে বাস করেন। পত্নীবিয়োগের পর শস্যের দালালি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ

ভক্ত শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবত দাস বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থ জীবনে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বেশ গ্রহণের পরে প্রায় ৩০ বর্ষকাল শ্রীব্রজ মণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়া ছিলেন। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের এবং বিশেষতঃ গৌড় মণ্ডলের তীর্থ সমূহ ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপ দাস বাবাজী সহিত কালনায় শ্রীভগবান দাস বাবাজীর সহিত কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সঙ্গলাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ব্রজ মণ্ডলের সকল মহাত্মার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকিলেও কাহারও বিষয় চেষ্টা তিনি কোন দিন অনুমোদন করেন নাই। স্বয়ং একলা হইয়া সঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভজনে কালাতিপাত করেন।

যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুন পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থান কাল পর্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়া ছিলেন। ১৩১১ সাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অভাব আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ১৩১২ সালে হইতে তিনি যায়াবরের বিচরণ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়া ছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীধামের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকুরী সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রমদ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোন দিন তাহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে স্মরণ হয়। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর বিষয় বৈরাগ্য আশ্রয় স্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা সেই বৈরাগ্যাচরিত অনুষ্ঠানাবলী দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য কৃষ্ণেতর বিষয়ে ন্যূনাধিক বিতৃষ্ণ হইয়াছেন ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত

পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে। এজন্য সেই মহাপুরুষের কথা বলিয়া আমরা ধন্য হইতে ইচ্ছা করি এবং শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে চেষ্টান্বিত হই।

তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন বস্ত্র-গ্রন্থি মালা, উন্মুক্ত কৌপীন নগ্নভাব, কারণ রহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়ন গোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মুর্খ ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। কতশত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনা কারক। অসংখ্য লোক সাধুর বেশ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছলেন না। নির্ব্ব্যলীকতাই যে সত্য তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় অধিরূঢ় না থাকিলেও শাস্ত্রের মূললক্ষীভূত বিষয়ে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবাফলে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভূতিবর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে পরন্তু তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ অতুলনীয় যাহা বিভূতিলাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোন দিন সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্যিক অনুগ্রহ প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহই নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। আরও এক অলৌকিক কথা এই যে শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম বিরোধি ছলধর্ম্ম পরায়ণ অনেক গুলি

প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য ভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটীগণ গৃহীত হইলে তাহাদের অপ্রাকৃত ভাগবত ধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের লিখিত "অমায়ায় দয়া" পাইলে বাস্তবিক তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিচ্ছিন্ন হইল, কৃষ্ণপ্রেমলাভ হইত।

নিরপেক্ষ শব্দ বলিলে কি বুঝায় তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এবং আমার প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান আছে। জড়াভিনিবেশ বশতঃ সাপেক্ষভাব পোষণ করিলে গুণাতীত বৈষ্ণব মহাত্মাগণের কিছুই উপলব্ধি হয় না। নিরপেক্ষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে উপরিউক্ত সাধুদ্বয় একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন।

আমার প্রভুর কথা (২)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়াছি এস্থলে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যায়িকা পত্রস্থ করিতেছি।

১। একটী নবীন কোপীনধারী বাবাজী মহাশয়ের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া কুলিয়া নবদ্বীপে পাঁচ কাঠা জমি ভূম্যধিকারিণী রাণী X X র ইষ্টেটের কর্ম্মচারির নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তাহা শুনিয়া আমার প্রভু বলেন শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত সুতরাং এখানে প্রাকৃত ভূম্যধিকারীগণ কি প্রকারে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন যে তাহা হইতে নবীন কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা ভূমি দিতে সমর্থ হইলেন? এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্ন রাজি বিনিময়ে প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালু কণার মূল্যের তুল্য হয় না সুতরাং কোন জমিদার অত মূল্য কোথায় পাইবে যে নবদ্বীপে ভূমি বিলি করিবার অধিকার পাইবে।

নবীন কৌপীনধারীরই বা কত ভজন বল যাহাতে সে ভজন মুদ্রার বিনিময়ে এত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ ধামের ভূমিতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে ধামবাস হওয়া দূরে থাক অপ্রাকৃত তত্ত্বকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে তাত্ত্বিক লোকে তাহাকে সহজিয়া বলে।

২। এক সময় বঙ্গদেশের অতি প্রধান জনৈক ভূম্যধিকারী নিজ ভক্তিবলে আমার প্রভুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব জানিয়া নিজ ইন্দ্রোপম প্রাসাদে ভক্ত গোষ্ঠীতে আহ্বান করেন। বৈষ্ণব ভূপতির সদৈন্যকাতর প্রার্থনায় আর্দ্র চিত্ত হইয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার নিকট-বর্ত্তি গাঙ্গ-সৈকতে তৃণাবরণ সংস্থাপন পূর্ব্বক মাধুকরী দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ পূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণ ভজন করিবার নিমন্ত্রণ করেন। আরও বলেন তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য সমূহ গোমস্তাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব হইতে পারিবেন ; তখন তাঁহারই প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হইয়া আমার প্রভু আবদ্ধ থাকিবেন। যদ্যপি বৈষ্ণব নরপতির নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া বাবাজী মহাশয় অপ্রাকৃত গৌরধাম হইতে নরপতির আদর আপ্যায়নে তাঁহার প্রাসাদে গমন করেন তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যে রাজার স্বভাব লাভ করিয়া তাঁহাকেও বিপুল ভূমি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। বস্তুতঃ ফল হইবে যে কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণ ভজন, বিষয়ে পর্য্যবসিত হইয়া বৈষ্ণব রাজার হিংসারপাত্র রূপে পরিণত হইবেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব ভূমিপতি যদ্যপি তাঁহার কুটীরের পার্শ্বে অপর কুটীর স্থাপন করিয়া ভজন করেন এবং পরগৃহ হইতে মাধুকরি গ্রহণ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও কোন কালে তিনি তাহার বন্ধুর প্রণয়চ্যুত হইয়া হিংসায় প্রবৃত্ত হইবেন না। যদ্যপি বৈষ্ণব বন্ধু রাজা তাঁহার প্রতি কোন কৃপা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় জীবন অবলম্বন করিয়া হরি ভজন পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা করুন্।

৩। কুলিয়া নবদ্বীপ প্রবাসী কোনও বিচক্ষণ কৌপীনধারী জনৈক সম্মানিত পণ্ডিত বাবাজীর আভ্যন্তরীণ চরিত্রে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া একদিন আমার প্রভু কৌপীন বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট

ধৌত কালা পেড়ে সূক্ষ্ম ধুতী চাদর কোচাইয়া পরিধান করতঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ের এ অভাবনীয় বেশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার প্রভু তদুত্তরে বলেন যে আমরা চৈতন্যের বেশ গ্রহণ করিয়া কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক পরস্ত্রী গ্রহণেও পশ্চাৎপদ নহি। সুতরাং বিলাসপর বৃষলীপতির অনুরূপ বেশ গ্রহণ করিলে সত্যের আদর হইবে। বাবাজী মহাশয়ের এরূপ কৌশল পূর্ণ ব্যবহার ভ্রষ্টাচারী সম্প্রদায়ে বিশেষ ফল প্রসব করে।

৪। কোন সময় একজন ভাগবতে সুনিপুণ গোস্বামি সন্তানে অর্থ গৃধ্নুতা ও কৌশলে শিষ্য সংগ্রহের পিপাসা তাঁহার সমক্ষে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া তিনি তাহার ভক্তি প্রচার কার্য্যের সবিশেষ তথ্য জানিতে চান। অর্ব্বাচীন গায়কের মুখে গৃহস্থ গোস্বামী মহোদয়ের অনেক লোককে "গৌর গৌর" বলান ও অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহের চাতুরী শুনিয়া বলেন যে গোস্বামি সন্তান মহাশয় গোস্বামী শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই তিনি ইন্দ্রিয় শাস্ত্র ব্যাখ্য করিয়াছেন এবং "গৌর গৌর" বলান নাই "টাকা, টাকা, আমার টাকা" বলিয়া চিৎকার করাইয়াছেন মাত্র। উহা কখনই ভজন নহে পরন্তু উহা সত্য ধর্ম্মের আবরণ মাত্র তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট বই উপকার নাই।

৫। অনেকে ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মের ভাণ করিয়া করিয়া শাস্ত্রীয় সদাচার লোক চক্ষে দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয় চেষ্টায় ব্যস্ত হন। তাঁহাদের সেই বিষয় চেষ্টা গোস্বামীশাস্ত্রে বিষ্ঠার সহ তুলনা করা হইয়াছে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্মশালার সাধারণের পুরীষত্যাগের স্থানে আমার প্রভু প্রায় ছয়মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র পদানুসরণ করিয়া যাহারা বিষয় বিষ্ঠাকে আবাহন করেন, নিজ প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ হইয়া বৈষয়িক ম্যাথরের অভিনয় করেন। লোকসকল পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসজ্জায়

বিষয়ের আবাহন করিতেছেন এবং তাহা নিতান্ত ত্যাজ্য, ইহা তাঁহার আদর্শজীবনের সকলকে দেখাইয়াছেন।

৬। অনেক গৃহস্থ বৈষ্ণব, বাবাজী মহাশয়কে টাকা ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি বস্ত্র মধ্যে মধ্যে দিতেন। টাকা পাইয়া কাপড়ে দুই পাঁচটী গ্রন্থি দিয়া নানাস্থানে রাখিয়াও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্তরা দেখাইতেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে বাবাজী মহাশয়ের অর্থের প্রচুর লোভ আছে। মূল্যবান বস্ত্র পাইলে দাতাকে বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং তাদৃশ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা জানাইয়া দিতেন।

ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ কি জয়।
জয় শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ কি জয়।
আকারমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ কি জয়। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ কি জয়।
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা শ্রীধাম পরিক্রমা পালনকারী ভক্তবৃন্দ কি জয়।
জয় শ্রীল গুরু মহারাজ কি জয়।

শ্রীচৈতন্যমঠের অঙ্গনে

শ্রীশ্রীধর-অঙ্গন

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে আমরা শ্রীচৈতন্য মঠ থেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় এখন শ্রীধর অঙ্গনে এসেছি । এই গৃহ খুব ছোট্ট দেখতে হলেও এখানে প্রতি দিন খুব সুন্দর লীলা হত। এই গৃহে শ্রীধর প্রভু বাস করতেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে এখানে এসেছিলেন । যখন শ্রীধর প্রভু শুনেছিলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণের সঙ্গে এসেছিলেন, তখন তিনি শীঘ্র করে প্রভুর সামনে এসে প্রণাম করলেন এবং পূজা জ্ঞাপন করলেন।

শ্রীধর প্রভু বিনীতভাবে বললেন, “প্রভু, এই অধম দাসের প্রতি কৃপা কর—আমার বাড়িতে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম কর।”

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন, “শ্রীধর, তুমি এত ভাগ্যবান ! প্রভু তোমাকে বহু কৃপা করেছেন। আজ আমরা তোমার ঘরে বিশ্রাম করব !”

শুনে শ্রীধর খুব আনন্দিত হলেন। বহু যত্ন করে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও সমস্ত ভক্তগণের সেবা করলেন—এক জন ব্রাহ্মণকে রান্না সেবায় লাগিয়ে তিনি ওই দিন সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করলেন । তারপর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধর প্রভুর ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নিলেন আর শ্রীধর প্রভু তাঁর পা মালিশ করলেন । বিশ্রাম নিলে তাঁরা তখন শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় এগিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কেন বললেন যে, শ্রীধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর বহু কৃপা পাত্র ? শ্রীধর পণ্ডিতের সম্বন্ধে আপনাদের জানতে হবে এবং তাঁর ভাব-চিত্ত সব সময় মনে রাখতে হবে।

শ্রীধর পণ্ডিত বা ‘খোলাবেচা’ শ্রীধর একজন খুবই দরিদ্র ভক্ত ছিলেন । তিনি অন্তর্দ্বীপের উত্তর প্রান্তে ছোট ঘরে বাস করতেন এবং

বাজারে শাক, কলা, খোল, থোড়, মূলা ইত্যাদি বিক্রি করে জীবন যাপন করতেন আর যে পয়সা তিনি বিক্রি করে পেতেন, তার আর্দ্ধেক তিনি শ্রীগঙ্গাপূজার জন্য কিছু ফুল-মিষ্টি কিনতেন আর অর্দ্ধেকে সংসার চলতেন । মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ঘরে প্রতি দিন তাঁর খোলা-পাতে প্রসাদ পেতেন।

যখন শচীমাতা নিমাইকে মাঝে মাঝে বাজারে যেতে পাঠিয়ে দিতেন, কিছু কলা-মূলা-শাক কিনবার জন্য, তিনি সব সময় শ্রীধর প্রভুর দোকানে যেতেন আর তাঁর সঙ্গে প্রতি বার দামাদামি করতেন—শ্রীধর প্রভু তাঁকে এক দাম বলতেন আর নিমাই থোড় কলা বা মূলা হাতে ধরে তার অর্দ্ধেক দাম বলতেন। দাম কমিয়ে দিতে রাজি না হয়ে (বললেন, "আমাকে ক্ষমা কর, ঠাকুর—আমি তোমার কুক্কুর হয়েও আমি ছাড় দিতে পারি না"), শ্রীধর প্রভু নিমাইয়ের হাত থেকে জিনিসটা নিতে চেষ্টা করতেন কিন্তু মহাপ্রভু সেটা ফিরে দিতেন না, তাই দুজনের মধ্যে টানাটানি হত। মাঝে মাঝে নিমাই থোড় হাতে ধরে এত বেশি টান দিতেন যে, পিচ্ছিল থোড়টা হাতে রাখতে না পেরে শ্রীধর প্রভু পড়ে যেতেন। সেইরকম মহাপ্রভু প্রতি দিন তাঁর সঙ্গে মশকরা করতেন।

এক দিন মহাপ্রভু শ্রীধর প্রভুর বাড়িতে এসে বললেন, "শ্রীধর, তুমি ত বড় চতুর। তোমার নাম 'খোলাবেচা'র অর্থটা অনেক বড়।"

"প্রভু, মজা করা ছেড়ে দাও। বাজারে ত কি আমার দোকানের ছাড়া আর কোন দোকান নেই ?কেন তুমি আমার সঙ্গে এ ভাবে ব্যবহার করছ ?"

নিমাই বললেন, "অন্য দোকান ত আছে, কিন্তু তুমি আমার যোগানদার, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব কেন ?" (দেখুন, ভগবান্ সহজে কাউকে ধরেন না কিন্তু যদি তিনি কাউকে ধরেন তাহলে তিনি ওকে আর ছেড়ে দেবেন না !) "উপরন্তু, তুমি প্রতি দিন গঙ্গা পূজার জন্য অনেক কিছু কিনে দাও, আর আমার জন্য তুমি কিছু দেবে না কেন? যে গঙ্গা পূজা তুমি করছ, আমি সত্য কথা বলছি—আমি সেই গঙ্গার পিতা !"

শ্রীধর প্রভু খুব সত্যবাদী ও কঠিন বৈষ্ণব ছিলেন—আজেবাজে কথা শুনলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই মহাপ্রভুর কথা

শুনলে শ্রীধর কানে অঙ্গুল দিয়ে বললেন, "বিষ্ণু, বিষ্ণু !" শ্রীধর প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন যে, নিমাইয়ের সঙ্গে তর্ক করতে লাভ নেই, তাই অবশেষে তিনি মহাপ্রভুকে অনেক মূলা ইত্যাদি বিনা মূল্যে ছেড়ে দিতেন । নিমাই তবু বললেন, "তুমি এত বেশী শাক, কলা, মূলা দিচ্ছো, এটা কী সব পচা জিনিস ?"

শ্রীধর বললেন, "না, না, না । খারাপ জিনিস আমি দেব কেন ? যা লাগবে, সব আমার দোকান থেকে নিয়ে নাও ।"

মহাপ্রভু সব সময় শ্রীধরের ঘরে নানা-ছলে আসতেন । এক দিন যখন মহাপ্রভু শ্রীধর প্রভুর ঘরে এসেছিলেন, শ্রীধর প্রভু তাঁকে প্রণাম করলে আসন দিলেন । তাঁদের মধ্যে চমৎকার আলাপ হয়েছিল ।

মহাপ্রভু বললেন, "শুন, শ্রীধর, তুমি সব সময় 'হরি' 'হরি' বলে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করছ, তবু তোমার ভাল বস্ত্র, ভাল খাবার নেই, তুমি ত এত গরিব । তোমার পূজায় কী লাভ ?"

"প্রভু, গরিব হয়েও না খেয়ে থাকি না—ছোট হোক, বড় হোক, বস্ত্র পরি ।"

"হ্যাঁ, তুমি বলছ তোমার বস্ত্র আছে, কিন্তু দেখছি দশ জায়গায় সেলাই রয়েছে । তোমার ঘর আছে, হ্যাঁ, কিন্তু ঘরের ছাউনিতে ত খড় নেই । নবদ্বীপের লোক যারা দুর্গা পূজা করেন, তারা সবাই ভাল ভাবে থাকেন । তুমি বরং দুর্গা পূজা কর ।"

শ্রীধর প্রভু উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, যা তুমি বলেছ, সেটাই ঠিক কিন্তু সবাইয়ের জীবন একই রকম যায়—বড় ঘরে থাকলে, রাজভোগ খেলে, ভাল কাপড় পরলে, সবাইয়ের শেষ ত একই, সবাই মরে যাবে । সবই ভগবানের ইচ্ছায় হয় । যে ভগবান দিয়েছেন, সেটাই ত যথেষ্ট, আমি সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট ।"

শ্রীধর প্রভুর কথা শুনলে নিমাই অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, "শ্রীধর, তোমার কাছে এত বড় ধন আছে কিন্তু তুমি এই ধনটা লুকিয়ে লুকিয়ে নিজে ভোজন করছ, আর কাউকে দিচ্ছ না । তুমি লোককে বঞ্চনা করছ !"

নিজের প্রশংসা শুনতে না চেয়ে, শ্রীধর প্রভু বললেন, “শুন, ঘরে যাও, এ সব পাগলের মত কথা বলে দরকার নেই। আমাকে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করা উচিত নহে।”

“আমি তোমাকে এই ভাবে ছেড়ে দেব না। বল, তুমি আজ কী আমাকে দেবে ?”

“যা ইচ্ছা তোমার, সেটাই নিয়ে নাও। যা আমি বিক্রি করি, সেটা তুমি জান, দামটাও জান।”

“তোমার যা পোতা ধন আছে, এখন তা থাকুক, বর্ত্তমানে বিনা দামে থোড়, কলা ও মোচা ত দাও—যদি দেবে, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, তোমার সঙ্গে কন্দল আর করব না।”

কিছু ভয় পেয়ে শ্রীধর প্রভু ভাবলেন, “এই বিপ্র ছেলেকে আমি যদি ‘না’ বলব, ও আমাকে বোধ হয় মারতেও পারে, আর মারলে আমি কি করব ? জিনিসটা না দিয়েও পারি না, এবং প্রতি দিন ওকে বিনামূল্যে সব কিছু দিতেও পারি না। কি করব আমি ?” শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঠিক করলেন, “যদি একজন ব্রাহ্মণ আমার কাছে কিছু ভিক্ষা করছে, আমার ক্ষতি কি ?আমাকে সেটা দিতেই হবে, সেটা আমারই ভাগ্য।”

তখন শ্রীধর প্রভু বললেন যে, নিমাই সব কিছু ওর কাছ থেকে নিতে পারেন, বিনা মূল্যে ।

আর এক দিন নিমাই শ্রীধর প্রভুর ঘরে এসে তাঁর কাছে এক গ্লাস জল চাইলেন। কিছু লজ্জা পেয়ে শ্রীধর প্রভু বললেন যে, ঘরে ঠিক মত গ্লাস ছিল না আর যে গ্লাস ছিল, তার ভিতরে ছিদ্র। ভাবগ্রাহী ভগবান্ শ্রীনিমাইসুন্দর আপত্তি করলেন না—এই ভেঙ্গে গ্লাস দিয়ে জল পান করলেন।

ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি’ না চায় ॥ (চৈঃ ভাঃ ২/৯/১৮৫)

কৃষ্ণ নিজেই বলেন, “আমি অভক্তের হাত থেকে কিছু নেব না। যে আমার সেবা করেন, আমি তাঁর হাত থেকে সব কিছু গ্রহণ করি। যদি কেউ আমাকে কিছু ভক্তি সহকারে দেন, সেটাই আমার যথেষ্ট।” কৃষ্ণ

কলার খোসা বিদুরের স্ত্রীর হাত থেকে খেয়ে নিলেন, সুদামা বিপ্রের কাছে চিড়া খেয়ে নিলেন, কিন্তু তিনি কখনও দুর্যোধনের রাজভোগ খেতে রাজি হলেন না। সব চাইতে বেশি কথা হচ্ছে যে, যা কিছু দেওয়া হয়, সব কিছু হৃদয় দিয়ে দিতে হবে। যদি আপনারা হৃদয়, মন, প্রাণ দিয়ে সেবা করতে পারেন, সেটা তো যথেষ্ট। লোক অনেক বাহ্য জিনিস করতে পারে, কিন্তু সেটা সেবা হতেও পারে, না হতেও পারে। সেবা করলে হৃদয়, মন, প্রাণ দিয়ে করতে হবে। সেটা হচ্ছে মূল জিনিস। তার প্রমাণ আমরা শ্রীধর প্রভুর কাছে পাই—তাঁর কিছু ছিল না, কোন ধনদৌলত, কোন টাকা-পয়সা, জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ছিল না, ঠিক মত ঘরও ছিল না কিন্তু যে তাঁর হৃদয়ে প্রীতি ছিল, সেটা মহাপ্রভু আনন্দ করে গ্রহণ করলেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর বড় সেবক।

কি করিবে বিদ্যা ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইলা যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবা তাহা॥

দেখি' মূর্খ দরিদ্র সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ-কর্ম্মদোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি॥

(চৈঃ ভাঃ ২/৯/২৩৪-২৩৫, ২৩৯-২৩৮)

এক দিন নিমাই শ্রীধর প্রভুকে বর দিতে চাইলেন। তিনি শ্রীধর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্রীধর, তুমি কী বর চাও ? বল আমাকে।"

শ্রীধর প্রভু হাত জোড় করে বললেন, "প্রভু, আমি কোন বর চাই না। যদি তোমার আমাকে বর দিতে হবেই, তাহলে এই বরটা আমি চাই :

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলা-পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণযুগল॥ (চৈঃ ভঃ ২/৯/২২৫-২২৫)

সেটা বলে শ্রীধর বাহু তুলে কাঁদতে কাঁদতে উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করতে লাগলেন।

যে দিন মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলেন, সেই দিনের আগের দিনে সমস্ত ভক্তবৃন্দ সমবেত হয়েছিলেন শচীমাতা ও নিমাই বিশ্বম্ভরের গৃহে।

সবাই এসেছিলেন, শ্রীধর প্রভুও ওই দিন এসেছিলেন । এসে তিনি নিমাইকে একটা লাউ দিয়েছিলেন । লাউটা নিয়ে নিমাইয়ের মনটা গলে গেল, তিনি ভাবলেন, "শ্রীধর, আমি সারা জীবন তোমার কাছ থেকে কলা-থোড়-মোচা ইত্যাদি কেড়ে নিয়েছি, চুরি করেছি আর তুমি এই শেষ রাতে এই লাউ আমার জন্য নিয়েছ । আমি সেটা অস্বীকার করতে পারি না । তুমি আমার নিত্য দাস, শ্রীধর । তোমাকে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে আমি দেখছি তোমার কোন অহংকার নেই । তোমার সেবা, ভক্তি ও প্রেমে তোমার কাছে আমি ঋণী ।" যখন একটু পরে আর কেউ দুধ নিয়ে এসেছিলেন, তখন মহাপ্রভু শচীমাতাকে অনুরোধ করলেন, "মা, ওই লাউকে নিয়ে লাউয়ের পায়েস (দুগ্ধ-লক্লকী—দুধ ও চিনি মিশিয়ে সিদ্ধ লাউ) তৈরি কর ।" সেই লাউয়ের পায়েস তিনি ওই রাতে গ্রহণ করলেন ।

যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শন বিনা থাকতে না পেরে, শ্রীধর প্রভু প্রতি বছর ভক্তগণের সঙ্গে পুরীতে যাত্রা করতেন, প্রভুর দর্শন করবার জন্য ।

এই জগতে লোকেরা ভগবানের পূজা করেন তিন ভাবে—কেউ ভগবানের পূজা করেন ভয়ের জন্য, কেউ পূজা করেন কারণ তাঁর কিছু কামনা-বাসনা আছে (তাঁরা ভগবানের কাছে সব সময় কিছু চান, সব সময় বিষয়ের প্রতি আসক্তি হয়ে থাকেন), আর কেউ ভগবানের পূজা করেন কর্তব্যর জন্য (তাঁরা ভাবছেন, "যেহেতু আমরা কৃষ্ণের নিত্য দাস, সেহেতু আমাদের কৃষ্ণ পূজা করতে হবে") । কিন্তু সেটা সব ঠিক নয়—গুরু, বৈষ্ণব, ভগবানের সেবা করতে হবে স্নেহ, ভালবাসার জন্য, প্রভুর শ্রীচরণে আসক্তির জন্য । তাহলে সেটা আসল সেবা হবে ।

তাই বহু ভাগ্যের ফলে, আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসীম কৃপায় এই নিত্য পবিত্র স্থানে এসে, আমরা শ্রীধর প্রভুর গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করে এই শ্রীগৃহে ধূলিকণা মাথায় নিয়ে প্রার্থনা করে থাকি যে, আমরা এক দিন সরল ভাবে, সব বিষয় ছেড়ে দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে আমাদের গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করতে পারি ।

শ্রীখোলাবেচা শ্রীধর প্রভু কি জয় । শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কি জয় ।

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি প্রতি বৎসর জগতে অবতীর্ণ হইলেও আমরা অনেকেই আমাদের চেতনের বৃত্তিতে শ্রীগৌরাবির্ভাবের আসন অধিষ্ঠিত করিতে পারি না কেন?—শ্রীগৌরাবির্ভাবের তাৎপর্য্য ও ঔদার্য্য হৃদয়ঙ্গম করি না কেন?—'গৌর' ব্যতীত অন্য বিষয়—গৌর-সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ—'গৌরনাম', 'গৌরকাম' ও 'গৌরধাম'-সেবা ব্যতীত অন্য উপায় ও উপেয়ের জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হই কেন ?—শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাই একমাত্র একায়ন-শিক্ষা বলিয়া বরণ করি না কেন?

এই সমস্যার উত্তর দিয়াছেন,—'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক'-কার শ্রীল করিকর্ণপুর—"তর্হি কথং তত্রৈবোদারমতে রমতে ন সর্ব্বঃ?

"বিবিধবাসনা সনাথোহি লোকো লোকোত্তরে বর্ত্মনি কথং সর্ব্ব এব প্রবর্ত্ততাং। বাসনাবদ্ধা শ্রদ্ধাশ্রয়তি হি ভেদকতাং মতেরিতি।"

অর্থাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—হে বিদ্বান ! শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও বিচারই যদি একমাত্র সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বত্রিক অদ্বিতীয় উদার সিদ্ধান্ত হয়, তবে কেন দুনিয়ার সকল লোকই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া অন্যান্য বহু মত ও বহু পথ গ্রহণ করিতে যান? ইহাতে সন্দেহ হয় ঐ সকল মত এবং পথও বুঝি পারমার্থিক রাজ্যেরই এক একটি সোপান ! তদুত্তরে বলিতেছেন,—তাহা নহে—তাহা নহে, সত্য—এক ; সত্যসূর্য্য এক পূর্ব্বশৈলেই উদিত হন ; পূর্ব্বদিক—একটিমাত্র ; পশ্চিম দিক, দক্ষিণদিক, উত্তরদিক—এই সকল পূর্ব্বদিক নহে বা ঐ সকল দিকে গমন করিলে কেহ পূর্ব্বদিকে গমন করিতে পারিবেন না, বরং পূর্ব্বদিক অধিকতর দূরেই পড়িয়া থাকিল। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিবার কারণ আছে। ভোগ-মোক্ষ প্রভৃতি বিবিধ বাসনাযুক্ত মনুষ্যগণ কি প্রকারে সেই লোকাতীত পথে প্রবৃত্ত হইবে? বাসনাযুক্ত শ্রদ্ধাই ভিন্ন মতি জন্মাইয়া থাকে।

—গৌড়ীয় থেকে

শ্রীসীমন্তদ্বীপ

— শ্রবণম্ —

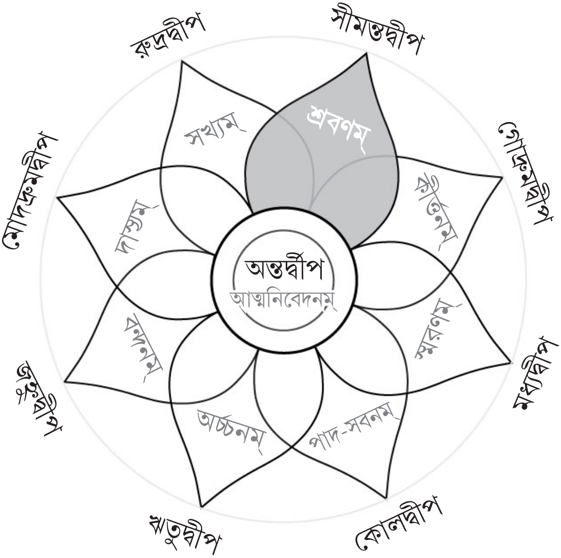
সীমন্তদ্বীপ
শ্রবণম্
গোদ্রুমদ্বীপ
কীর্ত্তনম্
মধ্যদ্বীপ
স্মরণম্
কোলদ্বীপ
পাদ-সেবনম্
ঋতুদ্বীপ
অর্চ্চনম্
জহ্নুদ্বীপ
বন্দনম্
মোদদ্রুমদ্বীপ
দাস্যম্
রুদ্রদ্বীপ
সখ্যম্
অন্তর্দ্বীপ
আত্মনিবেদনম্

শ্রীসীমন্তদ্বীপের মহিমা

পরিক্রমা মার্গ অনুসরণ করতে করতে আমরা শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পার করে শ্রীসীমন্তদ্বীপ প্রবেশ করেছি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থে এই দ্বীপের মহিমা বর্ণন করেছিলেন :

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী জীব গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে এই সিমুলিয়া গ্রামে এসেছিলেন। সেখানে এসে নিত্যানন্দ প্রভু বললেনঃ এই ত নিশ্চয় সীমন্তদ্বীপ। পরে গঙ্গা এই দ্বীপ গ্রাস করবে, শুধু মাত্রা এই স্থানটি দৃশ্যমান থাকবে।

এক দিন সত্যযুগে শিবজী মহারাজ গৌরাঙ্গের নাম করতে করতে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা দেখে পার্ব্বতী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি সব সময় ‘হা গৌরাঙ্গ ! হা গৌরাঙ্গ !’ বলে ডাকছ কেন ? সে গৌরাঙ্গ কে ? তোমার নৃত্য দেখে এবং গৌরাঙ্গের নাম শুনে আমার মন গলে যায়। আমি মনে করি যে, যে সব মন্ত্রতন্ত্র আমি আগে শুনেছি, সে সব জীবের জঞ্জাল ! তুমি এই গৌরাঙ্গের সম্বন্ধে আমাকে বলে দাও, আমি টের পাই যে, ওঁকে সেবা করলে আমি প্রাণ পাব।”

পার্ব্বতীর কথা শুনে মহাদেব বললেন, “তুমি আদি শক্তি, শ্রীরাধার অংশ, তাই আমি তোমাকে সব খুলে বলে দেব। কলিযুগে রাধার কান্তি ও ভাব নিয়ে কৃষ্ণ মায়াপুর গ্রামে অবতীর্ণ হবেন। তিনি কীর্ত্তনরঙ্গে মত্ত হয়ে সবাইকে প্রেমরত্ন বিচার বিনা বিস্তার করবেন। প্রভুর প্রতিজ্ঞা মনে করি আমি প্রেমের দ্বারা বিভোর হয়ে পড়ি। মন ধরতে না পেরে আমি কাশী ছেড়ে দিয়ে মায়াপুর ধামে এসে গঙ্গার তীরে একটি ছোট কুটিরে গৌরাঙ্গের ভজন করতে স্থির করলাম।

শিবজী মহারাজের কথা শুনে পার্ব্বতী দেবী সীমন্তদ্বীপে এসেছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে ধ্যান করতে লাগলেন। গৌরাঙ্গের নাম করতে

করতে তাঁর হৃদয়ে প্রেম উৎপন্ন হল। তিনি মন আর স্থির রাখতে পারলেন না। অবশেষে গৌর তাঁর সাপর্ষদের সঙ্গে পার্ব্বতীর কাছে এসে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পার্ব্বতী তুমি কী চাও? তুমি এখানে এসেছ কেন?" অধীর হয়ে প্রভুর শ্রীচরণে প্রণাম করে পার্ব্বতী দেবী উত্তরে বললেন, "প্রভু, তুমি জগতের জীবন, তুমি আমার প্রাণনাথ। তুমি সব জগতের প্রতি করুণা, স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদান কর কিন্তু আমার প্রতি তুমি এত নিষ্ঠুর! তুমি আমাকে এত নিষ্ঠুর সেবা দিয়েছ—আমি তোমার বহির্ম্মুখ জীবকে বন্ধন করি। আমি তাই করি কিন্তু আমি তোমার কৃপা থেকে বঞ্চিত! লোকে বলে যে, যথা কৃষ্ণ তথা মায়ার কোন স্থান নেই—আমি তোমার কাছ থেকে একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কবে ও কী করে আমি তোমার লীলা দেখতে পাব? তুমি কোন উপায় না দিলে আমি নিরাশ হয়ে পড়ব।"—এই কথা বলে পার্ব্বতী দেবী তখন গৌরাঙ্গের পদধূলি নিজের সীমন্তে মাখিয়ে দিলেন। ওখান থেকে এই জায়গা শ্রীসীমন্তদ্বীপের নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল , তবু জ্ঞানহীন লোক এখনও এই স্থান সিমুলিয়া-গ্রাম বলে থাকে।

পার্ব্বতীর কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন, "হে পার্ব্বতী, তুমি আমার ভিন্ন শক্তি নও। তুমি সর্ব্বেশ্বরী, তুমি আমার সহচরী। তোমার দুই রূপ আছে—স্বরূপ-শক্তিতে তুমি আমার রাধিকা, আর বহিরঙ্গা-রূপে রাধা তোমাতে বিস্তার করে। তোমার বিনা আমার লীলা অসম্ভব—যোগমায়ারূপে তুমি আমার লীলাতে সব সময় উপস্থিত হও। ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসীরূপে নিত্য লীলা কর, নবদ্বীপে তুমি প্রৌঢ়মায়ারূপে ক্ষেত্রপাল শিবজী মহারাজের সঙ্গে থাক।"—এটা বলে মহাপ্রভু অদৃষ্ট হয়ে পড়লেন।

এই কথা সব সময় হৃদয়ে রেখে গৌরের সেবার জন্য পার্ব্বতী দেবী সিমন্তিনী-দেবী-রূপে সীমন্তদ্বীপে এবং প্রৌঢ়মায়া-রূপে মায়াপুরে থাকেন। সেটা হচ্ছে শ্রীসীমন্তদ্বীপের মাহাত্ম্য।

জয় শ্রীসীন্তদ্বীপ কি জয়। জয় শ্রীল গুরুমহারাজ কি জয়।

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ্‌রে আমার মন
(একবার) নাচ্‌রে আমার মন নাচ্‌রে আমার মন ॥
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খেয়ে প্রেম দেয়)
ওরে অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন !
(অপরাধের বিচার তো নাই হে)
তখন কৃষ্ণনামে রুচি হবে ঘুচিবে বন্ধন ।
(অনুরাগ তো হবে হে)
তখন অনায়সে সফল হবে জীবের জীবন ॥
(নৈলে জীবন তো মিছে হে)
কৃষ্ণ-রতি বিনা জীবের জীবন তো মিছে হে
শেষে বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন ॥
গৌর-কৃপা হলে হে

চাঁদ কাজীর উদ্ধারণ

পরিক্রমা করতে করতে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় এগিয়ে গিয়ে চাঁদ কাজীর সমাধি মন্দিরে এসেছি। যে কাজীর নগরে এই সমাধি মন্দির উপস্থিত, সে নগরটা মথুরা থেকে অভিন্ন। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় যে কংস নামে প্রসিদ্ধ, তিনি গৌরলীলায় চাঁদকাজীর নাম পেয়েছিলেন।

এক দিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের পাশে গিয়ে বিধর্ম্মী কাজী ভক্তগণের কীর্ত্তন শুনতে পেলেন। বিরক্ত হয়ে তিনি বাড়ি প্রবেশ করলেন এবং মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিয়ে সবাইকে ভয় দেখালেন, “তোমাদের এই সব কীর্ত্তন বন্ধ করতে হবে! কীর্ত্তন বন্ধ না করলে আমি তখন তোমাদেরকে আরো বেশী শাস্তি দেব!” সবাই ভয় পেয়ে নিমাই পণ্ডিতের কাছে এসে তাঁদের দুঃখ জানিয়ে দিলেন। কাজীর অত্যাচারের কথা শুনে মহাপ্রভু হঠাৎ রেগে উঠলেন এবং ভক্তগণকে বললেন, “সবাইকে বলে দাও যে, সন্ধ্যার সময় সবাইকে এক এক দীপ নিয়ে বেড়িয়ে যেতে হবে। আজ আমরা প্রতি নগরে সঙ্কীর্ত্তন করব!” এই আদেশ সর্ব্বত্র ঘোষিত হল এবং সন্ধ্যার সময় লক্ষ লক্ষ লোক অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে বেড়িয়ে পড়ল—তখন সবাই ভক্তগণকে নিয়ে, খোল-করতাল নিয়ে, মহাপ্রভু মহা-নগর-সঙ্কীর্ত্তন শুরু করলেন। যে গ্রামে মহাপ্রভু তাঁর দলের সঙ্গে প্রবেশ করলেন, তথায় স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালকাদি সবাই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করতে এসে গেলেন। এটা দেখে সব পাষণ্ডিগণের হৃদয়জ্বালা উদিত হল।

কীর্ত্তন করতে করতে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ কাজীর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। ঘরের জানালার ফাক দিয়ে চাঁদ কাজী ভিড়টা দেখে ভয় পেলেন এবং বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফেললেন। মহাপ্রভু আদেশ দিলেন দরজা ভেঙ্গে ফেলে দিতে।

তখন, কাজীর ঘরের ভিতরে এসে মহাপ্রভু বললেন, “কী ব্যাপার ? আমরা আপনার বাড়ির অতিথি আর আপনি আমাদেরকে দেখে ঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়েছেন ? আপনার ধর্ম্মে এটা আছে যে, বাড়িতে অতিথি এসে গেলে, লুকিয়ে থাকতে হবে ?”

“না, সেটা নেয়। আমি ভাবছি যে, আপনারা রাগ করে এসেছিলেন, তাই আমি ভয় পেয়েছিলাম।”

“ভয় পাওয়ার কী দরকার ? আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।”

“তাই দেখছি। প্রভু, একটা কথা বলব ?”

“বলুন।”

চারদিকে তাকিয়ে এবং ঘন ভিড়টা দেখে চাঁদ কাজী আস্তে আস্তে বললেন, “মানে, একটা কথা আপনাকে গোপনে বলব ?”

মহাপ্রভু বললেন, “এরা সবাই আমার নিজের লোক, এদের সামনে বলুন না।”

“যে দিন আমি মৃদঙ্গ ভেঙ্গেছিলাম, সে দিনটা আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন ঘুমের মধ্যে এক সিংহ আমার বুকে লাফিয়ে উঠলেন। নখ দিয়ে বুকের মধ্যে চপ দিয়ে ওই নরসিংহ বললেন, ‘তুমি মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিলে বলে আজকে আমি তোমার বুক চেরে ফেলব !’ ওর বড় বড় সিংহের মত নখ দেখে আমি একবার চোখ বন্ধ করলাম। তখন সে বললেন, ‘কী ? ভয় পেয়েছ ? আমি এইবার তোমাকে মেরে ফেলব না, কিন্তু যদি তুমি আবার ভক্তের বিরোধী কিছু করবে, তাহলে আমি এটা আর সহ্য করব না—তোমাকে ও তোমার সারা বংশ ধ্বংস করব।’ সেটা বলে নরসিংহ চলে গেলেন, কিন্তু ওই দেখুন, আমার বুকে এখনও নখের চিহ্ন রয়েছে।”—তখন পাঞ্জাবি খুলে দিয়ে চাঁদ কাজী নিজের বুক সবাইকে দেখালেন। চিহ্নটা দেখে সবাই তাঁকে বিশ্বাস করলেন।

কাজী বললেন, “আমি এই কথা কাউকে বলি নি, কিন্তু পরের দিন একজন ভৃত্য আমার কাছে এসে বললেন যে, ও কীর্ত্তন বন্ধ

করতে গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ ওর মুখে আগুন লেগেছে—ওর দাড়ি পুড়ে গেল আর আগুনে গালে ফোস্কা হয়েছে ! তারপর আর একজন ভৃত্য এসে একই কথা বলে দিল। তারপর আরো একজন। আমি ওদরেকে বললাম কীর্ত্তন বন্ধ করতে যেতে আর হবে না, ঘরে গিয়ে সেখানে কিছু দিন বসে থাক। তখন, কিছু দিন পর কয়েক জন যবন ম্লেচ্ছ আমার কাছে এসে নালিশ করতে লাগল যে, হিন্দু ধর্ম্ম বেড়ে যাচ্ছে এবং সর্ব্বত্র 'হরি হরি' শোনা হয় ! হিন্দু লোকগুলোও আমার কাছে এসে নালিশ করছে যে, নিমাই পণ্ডিতের প্রভাবে এখন সব নীচু জাতি ভগবানের নাম করছে—সবাই সারা ক্ষণ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলে থাকে—আর এই পাপের ফলে ভগবানের নাম মলিন হয়ে যাবে, নামের শক্তি কমি যাবে। হিন্দু লোক বলে যে, ওরা নবদ্বীপ ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবে। সবাই এসে বলে, 'তুমি এই গ্রামের মালিক, তুমি নিমাইকে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও !' আমি সবাইকে বলি, 'নিজের বাড়ি যাও, আমি দেখব।' কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।"

এই সব কথা শুনে মহাপ্রভু খুব খুশি হলেন। কাজীর গা স্পর্শ করে মহাপ্রভু হাসিমুখে বললেন, "তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র, পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র। যেহেতু তুমি কৃষ্ণ নাম করেছ, সেহেতু তুমি পবিত্র হয়ে গেলে, তোমার সব পাপ দূরে গেল।"

মহাপ্রভুর কথা শুনে চাঁদ কাজী কাঁদতে শুরু করলেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়ে গেলেন। সেইভাবে উদ্ধার পেয়ে তিনি ভক্ত হয়ে গেলেন। আজকেও আমরা দেখতে পাই যেমন, কৃষ্ণ-নাম প্রভাবে সারা পৃথিবীর লোক এখন ভক্ত হয়ে কৃষ্ণ নাম করছে।

পরে একবার মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই কলিযুগে যবনগণ কি করে নিস্তার পাবে?" হরিদাস ঠাকুর বললেন, "নামাভাসে মুক্তি পাইবে।" 'হরে কৃষ্ণ' বললে, কৃষ্ণ নিজে আপনাদেরকে রক্ষা করবেন—আপনাদের আবার কুকুর, বিড়ালের দেহ পেতে হবে না, আপনি এই জড় জগৎ থেকে রেহাই পাবেন।

সেটা হচ্ছে হরিনামের ফল কিন্তু কৃষ্ণনাম করলে অপরাধ আসতে পারে আর কিন্তু নিতাই-গৌরের নাম করলে অপরাধের বিচার নেই। নিত্যানন্দ প্রভু অপরাধের কোন বিচার করেন না, শুধুমাত্রা নিষ্কপটভাবে তাঁর নাম বলে ডাকলে, সব নামের ফল এসে যায়।

সেইভাবে, মহাপ্রভু চাঁদকাজীকে প্রেমধন দিয়ে বৈষ্ণব করলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন যে, "সেটা হচ্ছে ব্রজ ও নবদ্বীপের মধ্যে পার্থক্য—যারা কৃষ্ণলীলায় অপরাধী, তারা নির্ব্বাণ পায়, আর যারা গৌরলীলায় অপরাধী, তারা প্রেমরত্ন ধন পায়। অতএব গৌরলীলা সর্ব্বোপরি হয়। অপরাধ থাকলে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম প্রভৃতি বদ্ধজীবকে বহু দিন পরে উদ্ধার করে কিন্তু গৌরধাম, গৌরনাম, গৌররূপ, গুণ, পরিকর বৈশিষ্ট্যে কোন অপরাধ মনে করে না—তারা সবাইকে অনায়াসে উদ্ধার করে, কোন অপরাধ সেটাকে দমন করতে পারবে না। যে এই চাঁদকাজীর সমাধি দর্শন লাভ করবে, তার সব দুঃখ-ব্যাধি দূরে সরে যায়।"

তাই এই চাঁদ কাজীর সমাধি স্থানে এসে আমরা চাঁদ কাজীর চরণে প্রণাম করে মহাপ্রভুর লীলা স্মরণ করতে করতে প্রভুর কৃপা-সেবা লাভ করবার জন্য প্রার্থনা করছি।

জয় চাঁদ কাজী কি জয়।
শ্রীনিমাই পণ্ডিত কি জয়।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কি জয়।
শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা কি জয়।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির

আমাদের পরিক্রমার প্রথম দিনের শেষ জায়গা হচ্ছে এই মনোরম স্থান যে, শঙ্খবণিক-নগর বা শ্রীশরডাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব প্রভু ও শ্রীসুভদ্রা মায়ী শবরগণের সঙ্গে বসবাস করেন (শবর মানে প্রাচীন শিকারি জাতি যাদের সঙ্গে জগন্নাথ প্রথম থাকতেন, পুরী ধামে আসার আগে)।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে লিখেছেন : "এক সময় যখন রক্তবাহু নামে একজন মুসলিম সুবাদার পাষণ্ডী ব্যক্তি ওড়িশায় বিভিন্ন অত্যাচার করে ভোগ করতেন, তখন প্রভু এখানে শবরগণের সঙ্গে এসেছিলেন এবং ওই সময় থেকে এখানে নিত্যকাল ধরে বসবাস করেন। এই স্থান অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র।"

ACALA NIVASAYA NITYAYA PARAMATMANE B
HADRABHYAM JAG ANNATHAYATE NA

ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে আমরা বাংলার লোক অভ্যর্থনা করি বটে, কিন্তু সেই অভ্যর্থনা কতটা হৈতুকী আর কতটাই বা অহৈতুকী, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। ঋতুরাজ নব-বসন্ত আমাদের কাম বর্দ্ধন করুক, বসন্তদূত কোকিলের কাকলি আমাদের কর্ণে স্বর্গীয় সুধা বর্ষণ করুক, বসন্তের প্রকৃতি লক্ষ্মী আমাদের প্রাকৃত সাহিত্যের নব উপহার সৃষ্টি করুক কিংবা ধন-ধান্যে বসুন্ধরাকে অধিকতর সুভোগ্যা করিয়া তুলুক—এইরূপ আশার স্বপ্ন দেখিয়া আমরা ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে অভ্যর্থনা করি ; অথবা বালক-বালিকা—প্রেমিক-প্রেমিকা-গণের সামাজিক ফাল্গোৎসবের আগমনী বার্ত্তার পতাকা লক্ষ্য করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করি ; না হয়, খুব জোর এই তিথিটিকে কোন বীর বা নায়ক—যিনি আমাদের অবাস্তব বস্তুতন্ত্র-জগতের কোন প্রকার সামাজিক বা ব্যবহারিক সুবিধাবাদের উপঢৌকন যোগাইয়াছেন, তাঁহারই জন্মতিথির স্মারকরূপে তাঁহার পূজা করিবার পরিবর্ত্তে আমাদেরই সুবিধাবাদের পূজা করিবার উদ্দীপক দিনবিশেষ মনে করি। কিন্তু শ্রীফাল্গুনী পৌর্ণমাসীর ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহা অবাস্তব বস্তুতান্ত্রিকতা বা বিশ্বজনীন হিংসাময় সুবিধাবাদের সার্ব্বজনীন ভেল্কীর প্রশ্রয় দেন না। ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে সার্ব্বজনীন অচৈতন্যভাব বিদূরিত হইবার সুবর্ণসুযোগ আবিস্কৃত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমা শ্রীচৈতন্যপূর্ণচন্দ্রের পাদপদ্মনখশোভা প্রকটিত করিয়া থাকেন। বাংলার আদি কবি গাহিয়াছেন,—

“চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এতিথির করে আরাধনা ॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥”

চৈঃ ভাঃ আঃ ৩-৪৩-৪৪

শ্রীরুদ্রদ্বীপ

— সখ্যম্ —

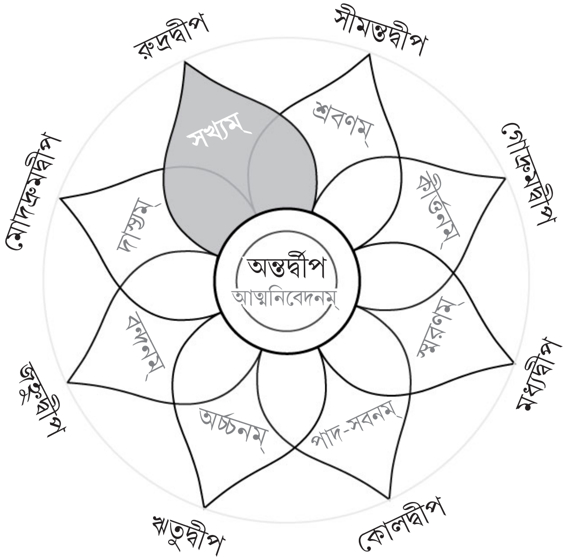
রুদ্রদ্বীপ
সীমন্তদ্বীপ
গোদ্রুমদ্বীপ
মধ্যদ্বীপ
কোলদ্বীপ
ঋতুদ্বীপ
জহ্নুদ্বীপ
মোদদ্রুমদ্বীপ
সখ্যম্
শ্রবণম্
কীর্ত্তনম্
স্মরণম্
পাদ-সবনম্
অর্চ্চনম্
বন্দনম্
দাস্যম্
অন্তর্দ্বীপ
আত্মনিবেদনম্

অবতার সার গোর অবতার
কেন না ভজিলি তাঁরে,
করি' নীরে বাস গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে ॥

কণ্টকের তরু সদাই সেবিলি (মন)
অমৃত পা'বার আশে।
প্রেমকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভাবিলি বিষে ॥

সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি (মন)
নাসাতে পশিল কীট।
'ইক্ষুদণ্ড' ভাবি' কাঠ চুষিলি (মন)
কেমনে পাইবি মিঠ ॥

'হার' বলিয়া গলায় পরিলি (মন)
শমন কিঙ্কর সাপ।
'শীতল' বলিয়া আগুন পোহালি (মন)
পাইলি বজর-তাপ ॥

সংসার ভজিলি শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহা-পরকাল দুকাল খোয়ালি (মন)
খাইলি আপন মাথা ॥

শ্রীরুদ্রদ্বীপ

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপের মধ্যে (উত্তর-পশ্চিম দিকে) আর একটি রমণীয় দ্বীপ আছে শ্রীরুদ্রদ্বীপ নামে। এই জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবান্ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ১৯৩৬ সালে শ্রীরুদ্রদ্বীপের উত্তর প্রান্তে শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেছিলেন।

এই শ্রীরুদ্রদ্বীপ গঙ্গার স্রোতের দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল—ভগবানের ইচ্ছা মত কেউ এই জায়গায় বসবাস করে না, কিন্তু এই জায়গার গুণ-মহিমার কীর্ত্তন নিত্যকাল করা হয়। এই দ্বীপের মধ্যে (পশ্চিম দিকে) শ্রীশঙ্করপুর নামে একটি গ্রাম প্রসিদ্ধ।

প্রচিন কালে শ্রীশঙ্কর আচার্য্য এই প্রথিবীতে প্রচার করতেন। বৈষ্ণব ও শিবজী মহারাজের (রুদ্রের) অংশ হয়েও তিনি ভগবানের বিশেষ আদেশ অনুসারে মায়ার কিঙ্কর-লীলা অভিনয় করে অদ্বৈতবাদ (প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ) প্রচার করতেন। যখন এই শ্রীশঙ্কর আচার্য্য দিগ্বিজয় করবার জন্য নবদ্বীপে এসেছিলেন, তখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর কাছে হাজির হয়ে মিষ্টি কথা এই ভাবে বললেন, “শঙ্কর, তুমি আমার দাস এবং আমার আজ্ঞা মাথার উপর ধরে মায়াবাদ বহু যত্ন করে প্রচার করছ কিন্তু এই নবদ্বীপ ধাম আমার প্রিয় স্থান, মায়াবাদ এখানে কোন স্থান কখনও পাবে না। বৃদ্ধশিব ও প্রৌঢ়ামায়া এখানে বাস করে কল্পিত সিদ্ধান্ত প্রচার করে কিন্তু যে জন ভক্তের প্রতি হিংসা করে, সেই জনকে শুধু মাত্রা তারা বঞ্চনা করে। তাছাড়া শুধু আমার ভক্তগণ এখানে বাস করে—এই স্থানে কোন ভুলসিদ্ধান্ত প্রচার করবার দরকার নেই। তুমি অন্যত্র যাও, নবদ্বীপবাসীগণকে উদ্বেগ দিও না।”

নবদ্বীপতত্ত্ব বুঝতে পেরে ভক্ত্যাবেশে হয়ে শঙ্কর আচার্য্য এখান থেকে চলে গেলেন।

এই রুদ্রদ্বীপেও অনেক রুদ্রগণ বসবাস করে নিরন্তর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গুণ-মহিমা নৃত্য কীর্ত্তন করেন। রুদ্র-নৃত্য দেখে দেবতা আকাশ থেকে আনন্দে পুষ্প-বরিষণ করেন।

এক সময় শ্রীবিষ্ণুস্বামী তাঁর শিষ্যগণের সঙ্গে দিগ্বিজয় করবার জন্য এখানে এসেছিলেন। বিষ্ণুস্বামীর শ্রুতি স্তুতি করা এবং তাঁর শিষ্যগণের ‘হরি ! হরি !’ বলা শুনে ও তাঁদের নৃত্য দেখে শিবজী মহারাজ খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের কাছে হাজির হলেন। শিবজী মহারাজকে দেখে সবাই অবাক হয়ে এক্ষুণি প্রণাম করে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন শিবজী মহারাজ দয়া করে বললেন, “তোমরা সবাই বৈষ্ণবগণ আমার কাছে প্রিয় জন। তোমাদেরকে দেখলে আমার মন আনন্দিত হয়। তোমরা আমার কাছে কী বর চাও ? বৈষ্ণবগণের জন্য আমি সব কিছু দিতে পারি।” তখন বিষ্ণুস্বামী বললেন, “যদি বর দিতে চান, তাহলে আমরা সেই বর চাই যেন আমরা একদিন ভক্তি-সম্প্রদায় স্থাপন করতে পারি।” মহানন্দ করে রুদ্র এই বর প্রদান করেছিলেন এবং বিষ্ণুস্বামীর ইচ্ছা মত সেই সম্প্রদায়ের নাম ‘রুদ্র সম্প্রদায়’ স্বীকার করেছিলেন।

শিবজী মহারাজের কৃপায় বিষ্ণুস্বামী এখানে কিছুদিন থাকলেন এবং সব সময় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভজন করতেন। এক দিন মহাপ্রভু স্বপ্নে তাঁর কাছে হাজির হয়ে বললেন, “শুন বিষ্ণু, আমার ভক্ত রুদ্র তোমাকে কৃপা প্রদান করেছে, তুমি খুব ভাগ্যবান যে, তুমি নবদ্বীপে ভক্তিদান পেয়েছ—কিন্তু এখন তোমার শুদ্ধাদ্বৈত-মত প্রচার করতে হবে। যখন আমি আবির্ভূত হব, তখন শ্রীবল্লভভট্ট রূপে উদয় হয়ে তুমি আমার সঙ্গে পুরীতে সাক্ষাৎ পেয়ে মহাবনে যাবে—সেখানে তোমার রুদ্র-সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে।” বিষ্ণুস্বামী মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

এই অঞ্চলে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর একই ভাবে শ্রীরামানুজ আচার্য্য, মধ্বমুনি ও নিম্বার্ক আচার্য্যকে দর্শন প্রদান করে হাজির হয়ে এসেছিলেন এবং যে ভাবে প্রচার করতে হবে, তাঁদের সবাইকে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই ভাবে এই শ্রীনবদ্বীপধামে প্রাচীন কাল থেকে চারটি

বৈষ্ণব স্প্রদায় এই পৃথিবীতে প্রকাশ হয়—শ্রী-সম্প্রদায় (রামানুজ আচার্য্য), ব্রহ্ম-সম্প্রদায় (মধ্বাচার্য্য), রুদ্র-সম্প্রদায় (বিষ্ণুস্বামী) ও কুমার-সম্প্রদায় (নিম্বার্ক আচার্য্য)।

যখন মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন তিনি নিজই শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেছিলেন। শ্রীরুদ্রদ্বীপে আসার আগে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামীকে শ্রীমধ্বাচার্য্যের কথা বলেছিলেন :

শ্রীমধ্বমুনিও এক সময় শ্রীনবদ্বীপধামে তাঁর শিষ্যের সঙ্গে বসবাস করতেন। একবার শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর কাছে স্বপ্নে এসে হাস্যমুখে বললেন, “মধ্ব, সবাই জানে যে, তুমি আমার নিত্যদাস। যখন আমি নবদ্বীপে প্রকট হব, তখন আমি তোমার সম্প্রদায়কে স্বীকার করব। এখন তুমি কাজ কর—সমস্ত দেশগুলো থেকে মায়াবাদ ও অপসিদ্ধান্ত উৎপাটন করে শ্রীমূর্ত্তি-মাহাত্ম্য প্রকাশ কর। আমি আসব এবং তোমার শুদ্ধ-সিদ্ধান্ত বিকাশ করব।” এই কথা বলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অন্তর্ধান হলেন এবং স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে মধ্বমুনি উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, “আমি কি এই সুন্দর গৌর-রূপ আবার কখনও দেখব?” তখন তিনি আকাশ-বাণী পেয়েছিলেন, “আমার সেবা করলে তুমি আমার কাছে এসে যাবে।” স্থির হয়ে মধ্বাচার্য্য তখন মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে সমস্ত মায়াবাদী-দিগ্বিজয়গণকে বিজয় করেছিলেন।

শ্রীরুদ্রদ্বীপে ভ্রমণ করতে করতে শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামীকে আরো বিভিন্ন স্থান দেখিয়ে দিলেন যেমন শ্রীপুলিন যেখানে শ্রীরাসমণ্ডল ও ধীর-সমীর প্রকাশিত হয়ে থাকে। শ্রীনবদ্বীপ ধাম শ্রীবৃন্দাবন ধাম থেকে অভিন্ন হয়ে এখানে সমস্ত তীর্থ প্রকাশিত হয় এবং সমস্ত লীলা চিরকাল চলে যাচ্ছে—প্রতি দিন কৃষ্ণ এখানে গোপ-গোপীগণের সঙ্গে রাসরঙ্গে বিহার করছে। যে ভাগ্যবান্, সে এটা মাঝে মাঝে দেখতে পায়।

গুরুদেব!
বড় কৃপা করি’, গৌড়বন-মাঝে
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিল মোরে, এই ব্রজে বসি’,
হরিনাম কর গান ॥

কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এ দাসেরে দয়া করি’।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি ॥

শৈশব-যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্ম-দোষে, এ দেহ হইল,
ভজনের প্রতিবন্ধ ॥

বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল’।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে
পড়িয়াছি সুবিহ্বল ॥

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ

— কীর্ত্তনম্ —

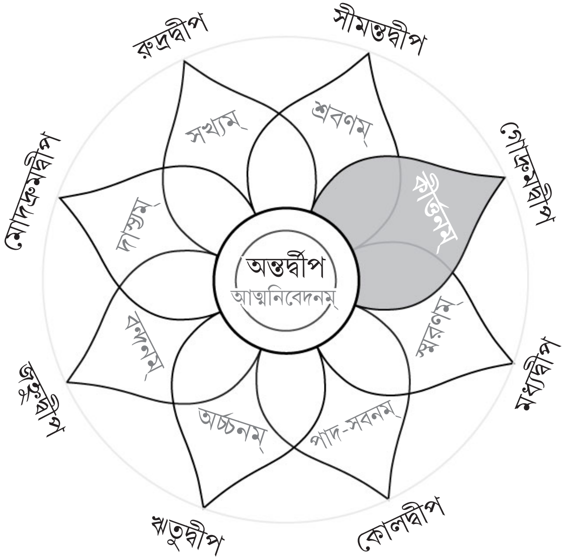
রুদ্রদ্বীপ
সীমন্তদ্বীপ
গোদ্রুমদ্বীপ
মধ্যদ্বীপ
কোলদ্বীপ
ঋতুদ্বীপ
জহ্নুদ্বীপ
মোদদ্রুমদ্বীপ
সখ্যম্
শ্রবণম্
কীর্ত্তনম্
স্মরণম্
পাদ-সেবনম্
অর্চ্চনম্
বন্দনম্
দাস্যম্
অন্তর্দ্বীপ
আত্মনিবেদনম্

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
∴ প্রতিষ্ঠাতা ∴
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
স্থান ∴ সুবর্নবিহার গৌড়ীয় মঠ • নদীয়া

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস-সার ।
গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারী ।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

শ্রীস্বুবর্ণবিহার

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার দ্বিতীয় দিন গোদ্রুমদ্বীপে প্রথম এই ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীস্বুবর্ণবিহার গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেছি।

সত্যযুগে এক রাজা এখানে বাস করতেন, সেই রাজার নাম ছিল শ্রীস্বুবর্ণ সেন। তাঁর এত তীব্র বিষয়-আসক্তি ছিল যে তিনি সব সময় রাজ্যের কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন—বয়স্ক হয়েও রাজ্যের কর্ম্ম ত্যাগ করতেন না। বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে তিনি সব সময় ভাবতন, “কি করে ধন বৃদ্ধি পাবে? কি করে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে?”

রাজা শ্রীস্বুবর্ণ সেনের কিছু পূর্ব্বজন্মের স্বুকৃতি বা পুণ্য ছিল যার প্রভাবে এক দিন তাঁর বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। এক দিন কোন ভাগ্যের ফলে শ্রীনারদমুনি রাজা শ্রীস্বুবর্ণ সেনের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। বিষয়ী রাজা হয়েও রাজার ভালো অভ্যাস ছিল—একজন সাধু বা অতিথিকে দেখলে তিনি তাঁকে আপ্যায়ন করতেন। তাই রাজা নারদমুনিকে খুব সম্মান দিয়েছেন বলে নারদ তাঁকে বিশেষ কৃপা বিস্তার করতে মনে করলেন—তিনি রাজাকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে এই তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন:

“তোমার দিন বৃথা যায়! তুমি সব সময় বিষয়ে নিয়ে ব্যস্ত থাক, তুমি সব সময় ‘টাকা টাকা টাকা’র চিন্তা করে থাক, তাই মায়া তোমাকে সব সময় আক্রমণ করছে, বিষয়-আসক্তি সব সময় আসবে। তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

“তুমি শুধু একবার হৃদয় দিয়ে ভেবে চিন্তা কর—অনর্থ মানে কী? অনর্থ মানে কামনা-বাসনা। কিন্তু পরমার্থ হচ্ছে আলাদা জিনিস—পরমার্থ মানে দিব্যজ্ঞান।

"যখন তুমি মরে যাবে, তখন তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্র, তোমার বন্ধুবান্ধবগণ, কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না। ওরা তোমার নিজজন নয়! ওরা এখন তোমার বন্ধুবান্ধব হতে পারে কিন্তু ওরা নিজের স্বার্থের জন্য তোমার সঙ্গে থাকে।

"যখন তুমি মরে যাবে, তখন ওরা সবাই তোমার দেহ ঘাটে নিয়ে যাবে, আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে নতুবা গঙ্গা-জলে ভাসাইয়া দিয়ে সবাই ঘরে ফিরে চলে আসবে। তবে কেন তোমার এই মিথ্যা আশা? তুমি সব সময় অসত্যের পিছনে কেন ঘুরছ? এই জগতে তোমার কেউ নেই।

"তুমি যদি বলবে, 'এটা ভুল কথা—আমার জীবনে কোন দুঃখ নেই, আমি এই জীবনে শুধু সুখ চাই, তাই আমি নিজের সুখের জন্য স্বাভাবিকভাবে টাকা উপার্জন করতে চেষ্টা করি।' সেটা মিথ্যা কথা। অর্থ থাকলেও তোমার ত্রিতাপ-জ্বালাই থাকে—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক (নিজের দেহ, প্রকৃতি ও অন্য জীব তোমাকে সব সময় কষ্ট দিয়েছে, দিচ্ছে ও দেবে)। যদি তোমার টাকা হয়, তাহলে কি কষ্ট-দুঃখ চলে যাবে? অর্থ থাকলে মানুষ কি সুখী হয়? যখন সব কিছু ত্যাগ করে তোমার চলে যাওয়ার সময় আসবে, তখন তোমার কি হবে? এসব বিষয় এক দিন চলে যাবে, তোমার সব ধন-সম্পত্তি চলে যাবে। এই জীবন অনিত্য—শুধু মাত্র একশো বছর বেঁচে থাকবে, তারপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তোমাকে চলে যেতে হবে।

"অতএব তোমার এই মায়াকে জয় করতে হবে—যখন তুমি মায়ার সংসার পার করবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে, সুখের মধ্যে কোন দুঃখ থাকে না, কোন ভয় বা শোক থাকে না। তুমি আমাকে বল: কি করে এইরকম অপূর্ব্ব ফল সাধিত হয়? সবাই জানে যে, কিছু লাভ করবার জন্য কিছু ত্যাগ করতে হবে কিন্তু কোন ত্যাগের দ্বারা, কোন জ্ঞানের দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হয় না। বৈরাগ্য বা জ্ঞানের বলে তোমার বিষয়-বন্ধন গলে যাবে কিন্তু তুমি শুধু 'কৈবল্য' (নির্বিশেষ ব্রহ্ম) পাবে। এই কৈবল্যে কোন আনন্দ নেই—সব প্রাণ নষ্ট হয়ে যাবে। এরফলে সব কিছু হারিয়ে গেলে তুমি কিছু শ্রেষ্ঠ ধন পাবে না। সেইজন্য যে বুদ্ধিমান্

ব্যক্তি, সে সব ভুক্তি-মুক্তি ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে। তুমি, রাজা, খুব বুদ্ধিমান্, তুমি বিচার কর কিসে ভালো হয়।

“পরমার্থে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন হচ্ছে বিষয়েতে অনাসক্তি এবং কৃষ্ণপদে অনুরক্তি। তুমি কৃষ্ণ পেতে যদি চাও, তাহলে শুধু ভক্তি দ্বারা তাঁকে পেতে পার—কোন কর্ম্ম দ্বারা নয়, কোন জ্ঞান দ্বারা নয়, কোন যোগ দ্বারা নয়। সমস্ত ভুক্তি-মুক্তি অতি তুচ্ছ জিনিস।

“যদি তুমি সব সময় কামনা-বাসনার বিষয়ের চিন্তা কর, তাহলে মায়ার স্পর্শের প্রভাবে তুমি সব সময় এই মায়ার বন্ধনে থাকবে। যে জীব মায়ার দ্বারা বদ্ধ হয়, তারা বিভিন্ন কর্ম্মে ব্যস্ত হয়ে থাকে—মায়া-জালে ভ্রমণ করতে করতে তারা বারবার এই জগতে এসে যায়। মাঝে মাঝে তারা অষ্টাঙ্গ যোগ করে, মাঝে মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলন করে, বিভিন্ন ধর্ম্ম সাধন করতে চেষ্টা করে থাকে কিন্তু সব বৃথা—তারা নিজের আত্মের জ্ঞানও পায় না। তারপর—‘ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব, গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ—বারবার যাওয়া-আসার পর কোন ভাগ্যের ফলে বদ্ধ-জীব শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পৌঁছে গিয়ে কিছু নির্ম্মল ভক্তি ও বিশ্বাস (শ্রদ্ধা) পায়।’ সেই সাধুসঙ্গ পেয়ে সমস্ত মলিন, সমস্ত অনর্থ জীবের হৃদয় থেকে দূরে চলে যায় এবং সেই ভাগ্যবান্ জীব পারমার্থিক নিষ্ঠা লাভ করে। নিষ্ঠা থেকে আস্তে আস্তে রুচি এসে, রুচি থেকে আসক্তি, আসক্তি থেকে প্রেম ও শুদ্ধ ভক্তি। সেইরকম সম্পূর্ণ ফল শ্রবণ কীর্ত্তনের ফলে আসবে।

“হে রাজা তুমি এত ভাগ্যবান্, তুমি এই নবদ্বীপে বসবাস কর ! সাধু-সঙ্গে দৃঢ়-বিশ্বাস পেয়ে কৃষ্ণনাম-গুণ গাও ! প্রেমের সূর্য তখন তোমার হৃদয়ে নিশ্চয়ই উদয় হবে।

“যখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কলিযুগে আসবে, তখন সবাই কৃষ্ণ-কৃপা পাবে। তুমিও তখন আবার এখানে আসবে—গৌরাঙ্গের নামে করবে। যে গৌরাঙ্গের নাম না করে কৃষ্ণ ভজন করে, তাঁর কৃষ্ণলোকে পৌঁছে যাওয়ার জন্য বহু-কাল লাগবে, কিন্তু যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হৃদয়ে অপরাধ থাকে না এবং সে শীঘ্রই কৃষ্ণ পায়।”

সে সব কথা বলতে বলতে নারদ মুনি কৃষ্ণ প্রেমে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং নাচতে 'গৌর ! গৌর !' গাইতে আরম্ভ করে এবং তাঁর বীণাও 'গৌর হরি ! গৌর হরি !" বলতে লাগল। শেষে, নারদ বললেন, " কবে এই ধন্য কলিযুগ আগমন করবে? কবে সেই গৌরাঙ্গ আসবে? গৌরনাম লইয়া আমি ধন্য হয়ে যাব !"—এই কথা বলে নারদ চলে গেলেন।

রাজা শ্রীসুবর্ণ সেন নারদ গোস্বামীর সঙ্গ পেয়ে তাঁর কথার চিন্তা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃদয় থেকে বিষয়ের বীজ আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে গেল, তারপর প্রথম বিষয়-বৈরাগ্য এবং পরে প্রেম উদয় হল—নারদ গোস্বামী কথার প্রভাবে তিনি 'হা গৌরাঙ্গ ! হা গৌরাঙ্গ !' বলতে বলতে নাচতে শুরু করলেন। সব সাধুগণের শ্রীচরণে পড়ে প্রেম ভিক্ষা করতে লাগলেন—তাঁর সব বিষয়-কামনা-বাসনা দূরে চলে গেল।

এক দিন শ্রীগৌর-গদাধর ভক্তগণের সঙ্গে রাজার কাছে স্বপ্নে এসেছিলেন। রাজা দেখতে পেলেন—সব ভক্তগণ তাঁর বাড়ির অঙ্গনে নাচতে নাচতে কোলাকুলি করে আর চারদিকে 'হরে কৃষ্ণ' মুখরিত হচ্ছে।

যখন স্বপ্নটা ভেঙ্গে গেল, তখন রাজা কাতর হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। হঠাৎ তিনি দৈববাণী শুনতে পেলেন—"হে রাজা, যখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আসবে, তখন তুমিও ওঁর পার্ষদ হয়ে আসবে। তোমার নাম হবে বুদ্ধিমন্তখাঁন এবং তুমি গৌরাঙ্গের সেবা করতে সুযোগ পাবে।" সেই ভাবে, যে সত্যযুগে ছিলেন রাজা শ্রীসুবর্ণ সেন, সে কলিযুগে বুদ্ধিমন্তখাঁন হলেন।

১৯৩৬ সালে এই শ্রীসুবর্ণবিহারে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেছিলেন।

নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল !

রাজা শ্রীসুবর্ণ সেন কি জয়। শ্রীসুবর্ণবিহার কি জয়। বুদ্ধিমন্তখাঁন কি জয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ কি জয়।

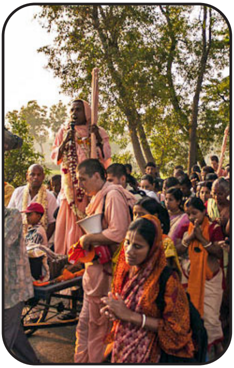

“দালালের গীত”

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই ॥

বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধা-মূল্যে শুদ্ধ-নাম সেই হাটেতে বিকায় ॥

যত ভক্ত-বৃন্দ বসি’।
অধিকারী দেখে’ নাম বেচ্ছে দর কষি’ ॥

যদি নাম কিনবে ভাই।
আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে য়াই ॥

তুমি কিনবে কৃষ্ণ-নাম।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হবে কাম ॥

বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধা-মাত্র ল’য়ে দেন পরম আনন্দ ॥

একবার দেখলে চক্ষে জল।
‘গৌর’ বলে’ নিতাই দেন সকল সম্বল ॥

দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ-শিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যাবল না করে অপেক্ষা ॥

অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল ॥

আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ॥

ভক্তিবিনোদ ডাকি’ কয়।
নিতাই-চাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয় ॥

শ্রীসুরভিকুঞ্জ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা প্রতি বছরের মত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে শ্রীসুবর্ণবিহার গৌড়ীয় মঠ থেকে এই পরম পবিত্র স্থান শ্রীসুরভিকুঞ্জে এসেছি।

এই দ্বীপের নাম হচ্ছে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ এবং এই দ্বীপটা কীর্ত্তনের স্থান। এখান থেকে এই সরস্বতী নদীর তীরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন ও শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য প্রচার শুরু করেছিলেন। শ্রীনবদ্বীপে গঙ্গার মধ্যে দুতো নদী আছে—এক তীরে গঙ্গার প্রবাহ, অপর তীরে সরস্বতীর প্রবাহ। গঙ্গা পার করার সময় আপনারা দেখতে পারেন যে, জলের রঙটা আলাদা। এই গোদ্রুমদ্বীপের মধ্যে গাদিগাছা, বালিরচর, মহেশগঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামপুর, হরিশপুর, সুবর্ণবিহার ও দেবপল্লী গ্রামগুলো আছে। মাঝে মাঝে লোকে বলে এই স্থানের নাম ‘গাদিগাছা’ কিন্তু বৈষ্ণবের

ভাষায় আমরা বলি 'গোদ্রুমদ্বীপ'। এই স্থানে সুরভি গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি গৌর ভজন করতে আদেশ লাভ করে শুদ্ধ ভক্তির আশ্রয় করেছিলেন। কৃষ্ণলীলায় মার্কণ্ডেয় মুনি স্বার্গের রাজা ইন্দ্রদেব ছিলেন। আসলে 'দ্রুম' মানে 'বৃক্ষ' এবং 'গো' মানে 'গরু' বা 'গাভী'। এই স্থানে একটা অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল আর সুরভি গাভী এই অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় অবস্থান করতেন বলে এই স্থানের নাম হয়েছিল 'গো-দ্রুম'। এই সব কথা আপনাদের হৃদয়ে রাখতে হবে।

আপনারা সবাই নববিধা-ভক্তির কথা শুনেছেন—এই নববিধা-ভক্তি এখানে নয়-দ্বীপের মধ্যে বিরাজ করে :

সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণং ; **গোদ্রুমদ্বীপ**—কীর্ত্তনং ; **মধ্যদ্বীপ**—স্মরণং ; **কোলদ্বীপ**—পাদ-সেবনং ; **ঋতুদ্বীপ**—অর্চনং ; **জহ্নুদ্বীপ**—বন্দনং ; **মোদদ্রুমদ্বীপ**—দাস্যং ; **রুদ্রদ্বীপ**—সখ্যং ; **অন্তর্দ্বীপ**—আত্মনিবেদনং। সেইভাবে, এই গোদ্রুমদ্বীপে কীর্ত্তন বিরাজ করে বলে আমাদের এখানে উচ্চঃস্বরে ভালো করে কীর্ত্তন করতে হবে।

এই সুরভি কুঞ্জের গৃহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৮৮ সালে স্থাপন করেছিলেন, এখানে আমাদের শ্রীল ভক্তিবেদান্ত অবধূত মহারাজ একা সেবা করছেন। যখন আমাদের গুরুদেব চলে গিয়েছিলেন, তখন এখানে এই ছোট বাড়ির ছাড়া মোটেই কিছু ছিল না তবু শ্রীল অবধূত মহারাজ এ সব করে আমাদের বসার জায়গা সুন্দর ভাবে ব্যবস্থা করেছেন। আমরা খুব ভাগ্যবান্ যে, আমরা এখানে আসতে পারি। উনি আমার প্রিয় বান্ধব এবং আমি ওঁকে অনুরোধ করছি যে, উনি কিছু কীর্ত্তন ও হরিকথা বলবেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত অবধূত মহারাজের শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের মাহাত্ম্য কথা :

আমাদের পরমানন্দ হচ্ছে যে, আমাদের পরম বন্ধু পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজকে আমরা এখানে পেয়েছি। উনি বছরের মধ্যে এই একটা দিনে আসেন কিন্তু যত সেবা মহারাজ

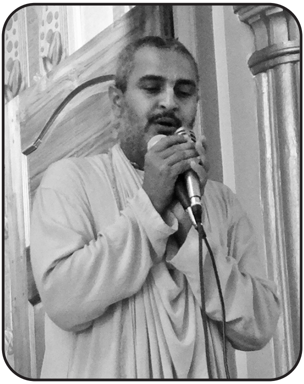

এখানে করেছেন, আমাদের এখনও সেইরকম সৌভাগ্য হয় নি—সে দিন আমার কবে হবে আমি জানিও না, যদি উনি আমাদের প্রতি কৃপা করেন, তাহলে হবে। আমরা অনেক বার ওঁকে আমাদের গুরুদেবের বিরহ তিথিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি কিন্তু মহারাজ সব সময় ব্যস্ত থেকে আসতে পারেন না আর আজকে যে আমরা ওঁকে পেয়েছি, আমরা খুব খুশি, সেটা আমাদের খুব ভালো লাগছে—"বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।"

পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের অবদান অতুলনীয়—ওঁর সেবার দ্বারা সর্ব্ববিধ কল্যাণ হয়েছে। আমি শুনেছি যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থানে একচক্রা ধামে সেখানেও মহারাজ মন্দির করেছেন। মায়াপুর ধামে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানের পাশেও মহারাজ সুন্দর মন্দির করতে যাচ্ছেন। আবার শ্রীনৃসিংহপল্লী, যেখানে বিঘ্ন-বিনাশনকারী এবং ভক্তের রক্ষক শ্রীনৃসিংহদেব নিত্যকাল থাকেন, সেখানেও উনি মন্দির করেছেন। সেটা আমাদের পরম আনন্দ। উপরন্তু মহারাজ কত স্নেহ আমাদের প্রতি করেন। আমরাও ওঁর জন্য অনেক চিন্তা করে থাকি—ওঁর গুরুদেবের ওঁর প্রতি প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ রয়েছেন বলে উনি ক্ষতিকরই অবস্থার মধ্যে, ক্ষতিগ্রস্ত হন না। ওঁকে দেখলে আমাদের মনে পড়ে যেমন ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজের অন্তরের ভক্তিকে পরীক্ষা করেছিলেন (তাঁর পিতা তাঁকে কত পীড়ন করেছিলেন!)—পূজ্যপাদ ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজকেও সেরকম ভগবান পরীক্ষা করেছেন কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবগণ সব সময় নিকটে রয়ে ওঁকে রক্ষা করছেন। গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি— যে আমার ভক্ত, সে কখনো বিনষ্ট হয় না।"

যা হোক, যেখানে আজকে আপনারা এসেছেন, সেই নিত্য পবিত্র স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নামের হট্ট স্থাপন করে মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে প্রচার শুরু করেছিলেন। পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এসে এই নামের হট্টের মাহাত্ম্যের সম্বন্ধে একটা বিশেষ কীর্ত্তন 'বড় সুখের খবর গাই' (দালালের গীত) রচনা করেছেন।

দ্বাপরযুগে ইন্দ্রদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে না পেরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ করেছিলেন। কী অপরাধ সেটা হল? ব্রজবাসীগণ সাধারণভাবে প্রতি বছর ইন্দ্র-পূজা করতেন বৃষ্টির জন্য—যদি বৃষ্টি থাকে, তাহলে ঘাস হবে, গাভী ঘাস খাবে, ফসল হবে, ইত্যাদি। কিন্তু এক দিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সব ব্রজবাসীগণকে বললেন, "আমরা এবার গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করব! ইন্দ্র-পূজা আর করব না! গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজা করলে আমাদের সব পাওয়া যাবে।" তখন নন্দ মহারাজ সমস্ত ব্রজবাসীগণকে নিয়ে সকলে মিলে ইন্দ্র-পূজা বন্ধ করে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করলেন।

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করার পর ইন্দ্রদেব রেগে গিয়ে বৃন্দাবনে প্রচুর বৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। ব্রজবাসীগণ ভয় পেয়ে গেলেন, "ইন্দ্রদেব রেগে গিয়েছেন! হে ভগবান, আমাদেরকে রক্ষা কর!" কৃষ্ণ তাঁদেরকে আশ্বাস দিলেন, "কোন ভয় নয়! গিরিরাজ গোবর্দ্ধন আমাদের রক্ষা করবেন।" তখন কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনকে ধারণ করে ব্রজবাসীগণকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে রেখে সাত দিন ধরে আশ্রয় দিলেন। তারা সবাই ভুলে গিয়েছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক-রূপে দর্শন প্রদান করেন। তারপর, সাত দিন পর ইন্দ্রদেব বৃষ্টি বন্ধ করলেন—তিনি মনে করলেন, "ব্রজবাসীগণ ভয় পেয়ে নিশ্চয়ই আমার পূজা আবার শুরু করবে।" কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ করার পর, জল যখন শুকিয়ে গেল, ব্রজবাসীগণ তখন ঘরে ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখলেন যে, সমস্ত জিনিস একই রকম রয়েছে—কোন ক্ষতি হয় নি। ব্রজবাসীগণের খুব আনন্দ হল, "আমরা এখন প্রতি বছর গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করব! আমরা ইন্দ্রের পূজা আর করব না।"

এদিকে ইন্দ্রদেব সন্দেহ করতে লাগলেন, "ব্রজবাসীর কোন ভয় হয় নাই, কোন ক্ষতি হয় নাই, কিছু হয় নাই !" তখন তিনি স্থুরভি গাভীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন—এসে তিনি বললেন, "মা, বল তো এই কৃষ্ণ কে? ও কি সাধারণ ছেলে, গোপ বালক? ও বলেছে আমার পূজা বন্ধ করে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করতে হবে আর গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করার পর ওদের আনন্দ বেড়ে গেছে !" স্থুরভি গাভী বললেন, "কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, উনি সকলকে রক্ষা করেছেন। তুমি ভুল করেছ—ওঁকে চিনতে না পেরে তুমি ওঁকে সাধারণ বালক মনে করেছ। তুমি ওঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর।" ইন্দ্রদেব রাজি হলেন কিন্তু বললেন, "আমি ভয় পাচ্ছি একা যেতে। তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

সেই ভাবে স্থুরভি গাভীর সঙ্গে ইন্দ্রদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কাছে এসে ইন্দ্রদেব স্তব স্তুতি করে অভিষেক করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন বিধান করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রদেবের অপরাধ মার্জনা করেছিলেন।

ইন্দ্রদেব তখন স্বর্গলোক চলে এলেন কিন্তু কিছু দিন পরে আবার তাঁর মনে ভয় চলে এল। স্থুরভি গাভীর কাছে আবার চলে এসে তিনি বললেন, "মা স্থুরভি, আমার মনে আবার ভয় জেগে উঠেছে..." তখন স্থুরভি গাভী বললেন, "রাজা, আমার কথা শুন। কলিযুগে নবদ্বীপধামে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হবেন, তিনি সমস্ত অপরাধীগণকে কৃষ্ণনাম দিয়ে অপরাধ থেকে মুক্ত করবেন—কৃষ্ণ-ভক্তি দিয়ে, কৃষ্ণ-প্রেম দিয়ে তাঁদেরকে ধন্য করবেন।" তখন ইন্দ্রদেব বললেন, "মা স্থুরভি, আমি তো কৃষ্ণকে চিনতে পারি নাই, তাই যখন এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আসবেন, আমি তখন আবার গৌর-লীলা বুঝতে না পেরে, চিনতে না পেরে আবার অপরাধ করে ফেলব। মা, তুমি কাজ কর—এখন আমাকে নবদ্বীপ ধামে নিয়ে চল, আমি গৌর-ভজন করে তাঁর দর্শন করব।"

সেইভাবে দ্বাপরযুগে ইন্দ্রদেব স্থুরভি গাভীকে নিয়ে যেখানে আমরা এখন বসে আছি, সেখানে অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল, তার নিচে বসে

সুরভি গাভী ও ইন্দ্রদেব ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে লাগলেন। কিছু কাল পরে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদেরকে দর্শন দিলেন—মহাপ্রভুর দর্শন পেয়ে ইন্দ্রদেব মনে খুব আনন্দ হলেন। ইন্দ্রদেব তখন স্বর্গলোকে চলে গেলেন আর সুরভি গাভী এখানে থাকলেন, সেইজন্য এটাকে সুরভিকুঞ্জ বলা হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, এই গোদ্রুমদ্বীপ হচ্ছে অভিন্ন নন্দগ্রাম। এই গোদ্রুদ্বীপের এখান থেকে নৃসিংহপল্লী পর্যন্ত পরিধি। আর যে অশ্বত্থ বৃক্ষ এখানে ছিল, সে যজন বা আট কিলোমিটার বিস্তীর্ণ।

এক সময় বিশাল প্লাবন হয়েছিল। মার্কণ্ডেয় মুনি নামে একজন ঋষি শিবের কাছ থেকে সপ্তকল্প বর পেয়েছিলেন বলে প্রতি কল্পের প্রলয় যখন হয়, তখন তিনি মরে গেলেন না। এক দিন প্রলয়ের সময় জলে ভাসতে ভাসতে মার্কণ্ডেয় মুনি নবদ্বীপধামে চলে এসেছিলেন। এই নবদ্বীপধামে মাহাত্ম্য এইরকম যে, এই ধাম কখন প্লাবিত না। সেইভাবে নবদ্বীপধামে এসে মার্কণ্ডেয় ঋষি সুরভি গাভীকে দেখতে পেলেন আর তাঁর কাছে এসে অনুরোধ করলেন, "মা, আমি বহু কাল ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। আমাকে দুধ পান করে সুস্থ কর !" দয়াময় সুরভি গাভী দুধ খাইয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে সুস্থ করে দিলেন।

তারপর, সুস্থ আবার হয়ে সুরভি গাভীকে বন্দনা করলে মার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন, "মা সুরভি, তুমি এখানে কেন বসে আছ? তুমি স্বর্গ লোকে থাক না কি?"

সুরভি গাভী বললেন, "আমি এখানে আমার প্রভুর ভজন করে বসে আছি।"

"তুমি এত ভাগ্যবতী ! আমি কেন এই সপ্তকল্প বর পেয়েছি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—এই বর পেয়ে আমি শুধু দুঃখ পাই। আমি এখন কী করব?"

সুরভি গাভী উত্তরে বললেন, "এখানে থেকে গৌর ভজন কর !"

মার্কণ্ডেয় ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, “গৌর ভজন করলে কী লাভ হয় ?”

“গৌর-ভজন করলে, মহাপ্রভু তোমাকে দর্শন দেবেন—তুমি দিব্য-শক্তি বা কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করতে পারবে, আর কোন দুঃখ থাকবে না। গৌর ভজনে কোন বিচার নেই—যে গৌরনাম লয়, তার সমস্ত কর্ম্মবন্ধন, বিষয়-আসক্তি ও মুক্তি-বাসনা বিনষ্ট হয়ে যায়।”

ভক্তির দ্বারা অভিভূত হয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম করতে লাগলেন—হরিনাম করতে করতে তিনি প্রাণ পেলেন।

তারপর মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং পুরীধামে চলে যাওয়ার পরে তিনি এখানে নিত্যানন্দ প্রভুকে পাঠিয়ে দিলেন প্রচার করবার জন্য। নবদ্বীপধামে এসে নিত্যানন্দ প্রভু তিন মাস ধরে থাকতেন এবং ওই সময় এখানে নামের হট্ট স্থাপন করলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর চলে যাওয়ার পর তিনশত বছর পর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম ১৮৮৮ সালে এখানে এসে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুনরায় এই নামহট্টের প্রকাশ শুরু করলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোদ্রুম-স্তব লিখেছেন :

স্বুর-সরীদ উপকণ্ঠে গোদ্রুমে গৌর দিয়েছে
বসতি স্বুরভিকুঞ্জে ভক্তিপূর্ব্বং বিনোদ
যুগল-চরণে সেবা সখ্য-লভিয়া অশো
ব্রজরস-রসিকয়া পাদপদ্ম আশ্রয় অত্র

এখানে বসে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক গ্রন্থ লিখেছেন—জৈবধর্ম্ম, শরণাগতি, চৈতন্যচরিতামৃতের ‘অমৃত-প্রবাহ ভাষ্য’, ইত্যাদি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই স্বুরভিকুঞ্জ থেকে প্রচার করতেন আর আমরা আজকে তাঁর কৃপায় এই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে পারছি।

গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরিব আমি
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ শুদ্ধ প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁর সেবার তুলনা হয় না। আমাদের এই সুরভি কুঞ্জেও তিনি সেবা করেছেন, আমাদেরকে এই মন্দির নির্মাণ করতে এত বড় সাহায্য প্রদান করেছেন। আমরা তাঁর শ্রীচরণে বন্দনা করি যেন আমাদেরও এইরকম শক্তি ধামসেবার জন্য, গুরুসেবার জন্য থাকবে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পূজ্যপাদ ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের জয় হোক।

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥

(শ্রদ্ধাবান জন হে, শ্রদ্ধাবান জন হে)
প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটির (স্বানন্দ-সুখদা-কুঞ্জ)

বন্দে ভক্তিবিনোদং শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপকম্ ।
ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞসম্রাজং রাধারসসুধানিধিম্ ॥

শ্রীল গুরুদেবের কৃপায়, সমস্ত ভক্তিবৃন্দের কৃপায় আমাদের শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ (আন্তর্জাতিক) পরিক্রমা সঙ্ঘ এখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটির ও সমাধি-মন্দিরে এসেছে। এই গৃহে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর থাকতেন ও ভজন করতেন।

যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এখানে এসেছিলেন, তখন মায়াপুরে কিছু ছিল না—যে সমস্ত মঠ-মন্দির, দারুণ অট্টালিকা, ইত্যাদি আপনারা এখন দেখতে পারছেন, সেটা তখন কিছু ছিল না। মহাপ্রভুর জন্মস্থানও লুকায়িত ছিল। সমস্ত গৌড়ীয় মঠের মন্দিরগুলো শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল।

আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্ পড়ে শ্রীল পভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর খুব খুশি হয়ে গেলেন, বিশেষ ভাবে এই শ্লোকের দ্বারা :

শ্রীগৌরানুমতং স্বরূপবিদিতং রূপাগ্রজেনাদৃতং
রূপাদ্যৈঃ পরিবেশিতং রঘুগণৈরাস্বাদিতং সেবিতম্ ।
জীবাদ্যৈরভিরক্ষিতং শুক-শিব-ব্রহ্মাদি-সম্মানিতং
শ্রীরাধাপদসেবনামৃতমহো তদ্দাতুমীশো ভবান্ ॥

“শ্রীগৌরচন্দ্রের অনুজ্ঞালব্ধ শ্রীস্বরূপ দামোদর যাহার মর্ম্মজ্ঞ, শ্রীসনাতন গোস্বামী যাহার আদরকারী, শ্রীরূপপ্রমুখ রসতত্ত্বাচার্য্যগণ যাহা পরিবেশন করিতেছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ যাহা

আস্বাদন ও সমৃদ্ধ করিতেছেন, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতি যাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং শ্রীশুক, দেবাদিদেব মহাদেব ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি যাহা (দূর হইতে) সম্মান করিতেছে—অহো সেই শ্রীরাধাপদপরিচর্য্যা-রসামৃত—তাহাও দান করিতে আপনি সমর্থ।”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদেরকে কী দিয়েছেন ?

গুরুদং গ্রন্থদং গৌরধামদং নামদং মুদা
ভক্তিদং ভূরিদং বন্দে ভক্তিবিনোদকং সদা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের **গুরু দিয়েছেন**।

আসলে যদি তিনি আমাদের শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর না দিতেন, তাহলে কোথায় আমরা আশ্রয় পেতাম ? কার চরণে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করতাম ? কোথা থেকে আমরা আমাদের গুরু বা গুরুবর্গ পেতাম ?

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক জায়গায় উড়িষ্যা বা পশ্চিমবঙ্গে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আস্তে আস্তে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্তি, শুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল এবং বহু অপসম্প্রদায়—আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী—সব জগতে ঘুরে বেড়ায়। তীব্র দুঃখ পেয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (তাঁর নাম ছিল শ্রীকেদারনাথ দত্ত ওই সময়) তাঁর স্ত্রী ভগবতীদেবীর সাথে জগন্নাথ মন্দিরে বিমলাদেবীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, “হে দেবী ! তুমি আমাকে একজনকে পাঠাও যে এই শুদ্ধ ভক্তির সিদ্ধান্ত প্রবাহিত করাতে পারবে !” বিমলাদেবী কৃপা করে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সন্তান দিলেন—তাঁর নাম হয়েছিল বিমলা প্রসাদ। সেই বিমলা প্রসাদ পরে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর হয়েছেন—তিনি সর্ব্ব দেশে এমনকি বিদেশেও প্রচার করে ৬৪টি মঠ স্থাপন করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকি কৃপায় আমরা এখন এই পরিক্রমা করতে পারি এবং এই শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের সঙ্গে থাকতে সুযোগ পেয়েছি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের **গ্রন্থ দিয়েছেন**।

যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রথম মহাপ্রভুর শুদ্ধ সিদ্ধান্ত জানতে ও পড়তে চাইছিলেন, তখন তিনি বহু যত্ন করে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। ওই সময় সব গ্রন্থ প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল বা বিভিন্ন প্রাচীন মন্দিরের গ্রন্থাগারের মধ্যে রাখা হল। মহাপ্রভুর শুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচার করবার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক গ্রন্থ সংগ্রহও করেছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনাও করেছিলেন। তিনি অনেক গীতি-কবিতা, গ্রন্থভাষ্য, বক্তৃতা, প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রতি দিন আমরা যে সকাল-সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন করি, সে প্রায় সমস্ত কীর্ত্তন তিনিই রচনা করেছিলেন। অনেক কীর্ত্তনগুলোও শরণাগতি থেকে আছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের **গৌরধাম দিয়েছিলেন**।

যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন অনেকেই ভাবতেন যে, মহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চিন্তা করলেন, “গঙ্গা নিতে পারে কিন্তু গঙ্গা ফিরেও দিতে পারে। নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর জন্মস্থান এখনই বর্তমান।”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভ্যাস ছিল এইরকম : উনি প্রত্যেক দিন খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেন—সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়লে আবার রাত দুপুরের সময় উঠতেন, সারা রাত তিনি হরিনাম করতেন। এক দিন সকাল বেলায় উঠে এই বাড়ির ছাদের উপরে হরিনাম করতে করতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এখান থেকে কিছু দূরে দিব্য জ্যোতি দেখতে পেলেন। যেখানে দিব্য জ্যোতি ছিল, সেখানে সকাল বেলায় তিনি আর একজনকে নিয়ে চলে এলেন আর তুলসী বাগান দেখলে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এই জমির নামটা কী ?”

লোকটি বললেন, “ঠিক মত জানি না, সবাই বলে মিয়াপুর।”

“আর জমিটা কার ?”

“আমরাও বলতে পারি না।”

“তোমরা এখানে কি চাষবাস করছ না ?”

“না, আমরা চেষ্টা করলাম, পাট ও ধান লাগিয়ে দিয়েছি কিন্তু কিছু হয় নি, যা লাগাই, সব তুলসী গাছ হয়ে যায়।”

তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভাবলেন, “এটা নিশ্চয়ই একটি বিশেষ স্থান, নতুবা তুলসী বাগান এখানে কেন ?”

তখন নবদ্বীপে ফিরে এসে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মহারাজ, আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন? আমি একটি অদ্ভুত স্থান দেখেছি, আপনাকে এই জায়গা দেখাতে চাই।” বয়স্ক হয়ে (তাঁর বয়স তখন কাছাকাছি ১৩৫ বছর ছিল) শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ হাঁটতে পারতেন না, তাই তাঁর সেবক তাঁকে ঝুড়ি করে মাথায় বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। যখন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ওই স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ঝুড়ি থেকে লাফ দিয়ে নাচতে শুরু করলেন! তিনি চিৎকার করতে থাকলেন, “হ্যাঁ! পেয়েছি! এইটা প্রভুর জন্মস্থান! এইটা যোগপীঠ!”

এইভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান—মহাপ্রভুর ধাম প্রকাশ করেছিলেন। মায়াপুর আবিষ্কার করার পর, তিনি ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সমস্ত গৌর-পার্ষদগণের স্থানগুলো কিনে নিয়ে সেখানে গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের কৃপায় আমরা এখন মন্দিরে মন্দিরে তীর্থে তীর্থে গিয়ে এই ধাম পরিক্রমা করতে পারি।

আর একটা কথা বলা ও জানা উচিত যে, যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মায়াপুর ধাম আবিষ্কার করেছিলেন, তখন সমস্ত বাবাজীগণ সকলে মিলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরুদ্ধে কেস (মোকদ্দমা) দায়ের করলেন—ওরা বললেন, “না, মহাপ্রভুর জন্মস্থান আসলে নবদ্বীপটাউনে (মায়াপুরে নয়, গঙ্গার অপর তীরে)!” কিন্তু হাই কোর্ট (High Court) ও সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) সবাই রায় দিয়েছেন যে, না, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থানটা মায়াপুর (যোগপীঠে)। এই কথা আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। সহজিয়া, আউল,

বাউল, ইত্যাদি ভাবছে ও বলছে যে, নবদ্বীপটাউন হচ্ছে প্রাচীন মায়াপুর ও মহাপ্রভুর জন্মস্থান কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেটা কখনও ভাবেন না—যোগপীঠ, মায়াপুর হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের **নাম দিয়েছেন**।

মহাপ্রভু বলেছিলেন :

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভুর পর অনেক নাম-অপরাধী উৎপন্ন হয়ে গেল। অনেক অপসম্প্রদায় হরিনাম বিতরণ করতে শুরু করল কিন্তু তাঁদের হরিনাম ইচ্ছামত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভাবলেন, "নিত্যানন্দ প্রভু নামের হট্ট স্থাপন করেছেন আর আমি এই নামহট্টে ঝাড়ুদার হব—ঝাড়ু দিয়ে আমি সম ভুল সিদ্ধান্ত নামের হট্ট থেকে বিতাড়ন করব !" এই রকম ঘোষণা করলে তিনি তাই করেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের **ভক্তি দিয়েছেন**।

ভগবানের কাছ থেকে তাঁর ভক্তি লাভ করা এত সহজ নয়—ভগবান্ সব সময় লুকিয়ে থাকেন।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥

যদিও ভগবান তাঁর ভক্তি দেন, সেটা সম্পূর্ণ ভক্তি নয়—তিনি অনেক কিছু দিতে পারেন কিন্তু নিজেকে তিনি কাউকে দেন না। উপরন্তু কৃষ্ণের কাছে তাঁর সঙ্গ লাভ করবার জন্য গেলে আপনি অসুর-হত্যাকারী কৃষ্ণ পেতে পারেন—তাঁর সঙ্গ করলে আপনাদের কী অবস্থা হবে ? কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সত্যিকারে কে দিতে পারে? শুধু বৈষ্ণব-ঠাকুর, ভগবানের ভক্ত। যখন ভগবানের প্রিয় ভক্ত আপনাদের কিছু দেন, তখন সেটা সম্পূর্ণ দান। সেই জন্য যে দান ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদেরকে দিয়েছিলেন, যে ভক্তি-সিদ্ধান্ত

তিনি এই জগতে প্রচার করতেন, সেটা শুদ্ধ ভক্তি। তার চাইতে এই জগতে আর কোন দান নেই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের **ভূরিদা**।

তিনি হচ্ছেন সপ্তম গোস্বামী। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামীকে পাঠিয়েছেন : শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। মহাপ্রভু ওঁদের আদেশ দিলেন যে, ওঁরা বৃন্দাবনে গিয়ে মহাপ্রভুর মূল-সিদ্ধান্ত প্রচার করবেন। ওঁরা সফল ছিলেন—মহাপ্রভুর অভীষ্ট সম্পূর্ণরূপে ওঁরা সিদ্ধ করলেন।

কিন্তু তারপর তাঁরা সব স্বধামে চলে গেলেন... কে তাঁদের পর প্রচার করবেন? এক দিন শিশির ঘোষ লিখেছেন, "কে সপ্তম গোস্বামী হতে পারেন? যদি এই জগতে ছয় গোস্বামীর পরে কেউ গোস্বামী হতে পারেন, তাহলে সেটা মাত্রই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় হতে পারে।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি কিন্তু তাঁর মূল শিক্ষা তাঁর গ্রন্থের মধ্যেই রেখেছেন। যদি আপনারা তাঁর বইগুলো পড়বেন, আপনারা বুঝতে পারবেন সনাতন-ধর্ম্ম বা জৈব-ধর্ম্ম কাহাকে বলা হয়, আমাদের সিদ্ধান্ত কী ইত্যাদি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর না থাকতেন কি করে আমরা এসব পেতে পারতাম? কি করে আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে পেতাম? প্রভুপাদ না আসতেন আমরা শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজকে কি করে পেতাম? আর শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ যদি শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ স্থাপন না করতেন, তাহলে আমরা কি করে আমাদের গুরুদেবকে (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজকে) পেতাম? তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান ও কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

আমাদের পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্ রচনা করেছিলেন :

হা হা ভক্তিবিনোদঠক্কুর ! গুরো ! দ্বাবিংশতিস্তে সমা
দীর্ঘাদ্দুঃখভরাদশেষবিরহাদ্দুঃস্থীকৃতা ভূরিয়ম্ ।
জীবানাং বহুজন্মপুণ্যনিবহাকৃষ্টো মহীমণ্ডলে
আবির্ভাবকৃপাং চকার চ ভবান্ শ্রীগৌরশক্তিঃ স্বয়ম্ ॥১॥

হা হা ! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ! হে পরমগুরো ! এই দ্বাবিংশবর্ষকাল দীর্ঘদুঃখময় আপন অপরিসীম বিরহে এই পৃথিবী দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়াছে। জীবগণের বহুজন্ম-সুকৃতিপুঞ্জদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরশক্তি আপনি স্বয়ং এই ভূমণ্ডলে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥১॥

দীনোঽহং চিরদুষ্কৃতির্নহি ভবৎপাদাব্জধূলিকণা-
স্নানানন্দনিধিং প্রপন্নশুভদং লব্ধুং সমর্থোঽভবম্ ।
কিন্ত্বৌদার্য্যগুণাত্তবাতিযশসঃ কারুণ্যশক্তিঃ স্বয়ম্
শ্রীশ্রীগৌরমহাপ্রভোঃ প্রকটিতা বিশ্বং সমন্বগ্রহীৎ ॥২॥

আমি দীন ও অতি দুষ্কৃতি, তজ্জন্যই আর পাদপদ্মধূলীকণায় স্নানানন্দরূপ প্রপন্নমঙ্গলপ্রদ নিধিলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু আপনার উদারতাগুণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তি স্বয়ং মহাযশা আপন হইতে প্রকাশিত হইয়া এই বিশ্বকে অনুগ্রহ দান করিলেন (অর্থাৎ বিশ্বের অন্তর্গত হওয়ায় আমি তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলাম) ॥২॥

হে দেব ! স্তবনে তবাখিলগুণানাং তে বিরিঞ্চাদয়ো
দেবা ব্যর্থমনোরথাঃ কিমু বয়ং মর্ত্ত্যাধমাঃ কুর্ম্মহে।
এতন্নো বিবুধৈঃ কদাপ্যতিশয়ালঙ্কার ইত্যুচ্যতাং
শাস্ত্রেষ্বেব 'ন পারয়েঽহ'মিতি যদ্গীতং মুকুন্দেন তৎ ॥৩॥

হে দেব ! আপনার নিখিল গুণরাশির (সুষ্ঠভাবে) স্তব করিতে যখন সেই ব্রহ্মাদি দেবগণও ব্যর্থমনোরথ হন, তখন অধম মনুষ্যমাত্র আমাদের কা কথা। এই উক্তিকে পণ্ডিতগণ কখনও অতিশয়ালঙ্কার বলিবেন না। কারণ ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই (তোমাদের ভক্তির প্রতিদান দিতে) "আমি পারি না" বলিয়া শাস্ত্রসমূহে সেই প্রসিদ্ধ গান গাহিয়াছেন ॥৩॥

ধর্ম্মশ্চর্ম্মগতোঽজ্ঞতৈব সততা যোগশ্চ ভোগাত্মকো
জ্ঞানে শূন্যগতির্জপেন তপসা খ্যাতির্জিঘাংসৈব চ।

দানে দাম্ভিকতাঽনুরাগভজনে দুষ্টাপচারো যদা
বুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং বিভেদ হি তদা ধাত্রা ভবান্ প্রেষিতঃ ॥৪॥

যে সময়ে ধর্ম্ম চর্ম্মবিচারময়, অজ্ঞতাই সাধুতা এবং যোগ ভোগাভিসন্ধিমূলক—যখন জ্ঞানানুশীলনে শূন্যমাত্র গতি এবং জপ ও তপস্যায় যশঃ ও পরহিংসাই অন্বেষণের বিষয়—যখন দানে দাম্ভিকতার অনুশীলন এবং অনুরাগভক্তির নামে ঘোরতর পাপাচার প্রভৃতি বিচার বুদ্ধিমান্ জনগণেরও বুদ্ধিভেদ ঘটাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বিধাতাকর্ত্তৃক আপনি প্রেরিত হইলেন ॥৪॥

বিশ্বেঽস্মিন্ কিরণৈর্যথা হিমকরঃ সঞ্জীবয়ন্নোষধীর্-
নক্ষত্রাণি চ রঞ্জয়ন্নিজসুধাং বিস্তারয়ন্ রাজতে।
সচ্ছাস্ত্রাণি চ তোষয়ন্ বুধগণং সম্মোদয়ংস্তে তথা
নূনং ভূমিতলে শুভোদয় ইতি হ্লাদো বহুঃ সাত্বতাম্ ॥৫॥

এই বিশ্বে হিমকর চন্দ্র যেরূপ কিরণ সমূহ দ্বারা ওষধি সকলকে সঞ্জীবিত ও তারাগণকে রঞ্জিত করিয়া নিজ জ্যোৎস্নামৃত বিস্তার করিতে করিতে শোভা পাইতে থাকেন, তদ্রূপ শুদ্ধ শাস্ত্রসমূহের (অনুশীলনদ্বারা) তোষণ এবং পণ্ডিতগণের (শ্রৌত সিদ্ধান্তদ্বারা) পূর্ণানন্দ বিধান করিয়া নিশ্চিতই এই পৃথিবীতে আপনার শুভোদয়। ইহাতে সাত্বতগণের সুখের সীমা নাই ॥৫॥

লোকানাং হিতকাম্যয়া ভগবতো ভক্তিপ্রচারস্ত্বয়া
গ্রন্থানাং রচনৈঃ সতামভিমতৈর্নানাবিধৈর্দর্শিতঃ।
আচার্য্যৈঃ কৃতপূর্ব্বমেব কিল তদ্রামানুজাদ্যৈর্বুধৈঃ
প্রেমাম্ভোনিধিবিগ্রহস্য ভবতো মাহাত্ম্যসীমা ন তৎ ॥৬॥

লোকসমূহের কল্যাণার্থে আপনি বহু গ্রন্থের রচনা দ্বারা এবং সাধুসম্মত নানাবিধ উপায়ে শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ প্রভৃতি মনীষিগণ ও অন্যান্য অনেক আচার্য্যও এইপ্রকার কার্য্য পূর্ব্বকালে করিয়াছেন ; এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু প্রেমামৃত-মূর্ত্তিস্বরূপ আপনার মাহাত্ম্যসীমা তাহাতেই (আবদ্ধ) নয় ॥৬॥

যদ্ধাম্নঃ খলু ধাম চৈব নিগমে ব্রহ্মেতি সংজ্ঞায়তে
যস্যাংশস্য কলৈব দুঃখনিকরৈর্যোগেশ্বরৈর্মৃগ্যতে।
বৈকুণ্ঠে পরমুক্তভৃঙ্গচরণো নারায়ণো যঃ স্বয়ম্
তস্যাংশী ভগবান্ স্বয়ং রসবপুঃ কৃষ্ণো ভবান্ তৎপ্রদঃ ॥৭॥

যাঁহার চিদ্ধামের জ্যোতির্মাত্র 'ব্রহ্ম'সংজ্ঞায় বেদে সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশাংশের অংশমাত্র যোগেশ্বরগণ বহুদুঃখ স্বীকার করিয়া অন্বেষণ করেন, পরমমুক্তকুল যাঁহার পাদপদ্মে মধুকরস্বরূপে শোভমান, সেই পরব্যোমনাথ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণেরও যিনি অংশী স্বয়ং ভগবান্ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাকেই আপনি প্রদান করেন ॥৭॥

সর্ব্বাচিন্ত্যময়ে পরাৎপরপুরে গোলোক-বৃন্দাবনে
চিল্লীলারসরঙ্গিনী পরিবৃতা সা রাধিকা শ্রীহরেঃ।
বাৎসল্যাদিরসৈশ্চ সেবিত-তনোর্মাধুর্য্যসেবাসুখং
নিত্যং যত্র মুদা তনোতি হি ভবান্ তদ্ধামসেবাপ্রদঃ ॥৮॥

সর্ব্বপ্রকারে অচিন্ত্য গুণময় পরব্যোমের পরমোচ্চ প্রদেশে গোলোক নামক শ্রীবৃন্দাবনধামে, যেখানে সখীজনে পরিবৃত হইয়া সেই চিন্ময়লীলারস-বিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা বাৎসল্যাদি-রসচতুষ্টয়সেবিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যরসময় সেবাসুখ নিত্যকাল পরমানন্দের সহিত বিস্তার করিতেছেন, আপনি সেই ধামের সেবা প্রদান করিতে পারেন ॥৮॥

শ্রীগৌরানুমতং স্বরূপবিদিতং রূপাগ্রজেনাদৃতং
রূপাদ্যৈঃ পরিবেশিতং রঘুগণৈরাস্বাদিতং সেবিতম্।
জীবাদ্যৈরভিরক্ষিতং শুক-শিব-ব্রহ্মাদি-সম্মানিতং
শ্রীরাধাপদসেবনামৃতমহো তদ্দাতুমীশো ভবান্ ॥৯॥

শ্রীগৌরন্দ্রের অনুজ্ঞালব্ধ শ্রীস্বরূপ দামোদর যাহার মর্ম্মজ্ঞ, শ্রীসনাতন গোস্বামী যাহার আদরকারী, শ্রীরূপপ্রমুখ রসতত্ত্বাচার্য্যগণ যাহা পরিবেশন করিতেছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ যাহা আস্বাদন ও সমৃদ্ধ করিতেছেন, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতি যাহার রক্ষণাবেক্ষণ

করিতেছেন এবং শ্রীশুক, দেবাদিদেব মহাদেব ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি যাহা (দূর হইতে) সম্মান করিতেছে—অহো সেই শ্রীরাধাপদপরিচর্য্যা-রসামৃত—তাহাও দান করিতে আপনি সমর্থ ॥৯॥

ক্বাহং মন্দমতিস্ত্বতীবপতিতঃ ক্ব ত্বং জগৎপাবনঃ
ভো স্বামিন্ কৃপয়াপরাধনিচয়ো নূনং ত্বয়া ক্ষম্যতাম্।
যাচেঽহং করুণানিধে ! বরমিমং পাদাব্জমূলে ভবৎ-
সর্ব্বস্বাবধি-রাধিকা-দয়িত-দাসানাং গণে গণ্যতাম্ ॥১০॥

কোথায় আমি মন্দমতি, অতি পতিতজন, আর কোথায় আপনি জগৎপাবন মহাজন ! হে প্রভো ! কৃপাপূর্ব্বক (এই স্তবকারী) আমার অপরাধ সমূহ আপনি নিশ্চিতই ক্ষমা করিবেন। হে করুণাসাগর ! আপনার পাদপদ্মমূলে এই বর প্রার্থনা করিতেছি য়ে, আপনার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাসগোষ্ঠীমধ্যে আমাকে গণনা করিয়া কৃতার্থ করুন ॥১০॥

আমাদের গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের মঠের গৌড়ীয় দর্শন পত্রিকায় একটি খুব সুন্দর প্রবন্ধ ১৯৫৫ সালে লিখেছেন। শেষ করে আমরা এই বিশেষ প্রবন্ধ এখানে প্রদান করি :

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথিতে

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের
বক্তৃতার মর্ম্ম, শ্রীধাম নবদ্বীপ)

"মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায়তে ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

আজ শ্রীমঠে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুপস্থিতিতে তাঁর ইচ্ছায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহিমা শংসন জন্য আপনাদের সম্মুখে আমি দণ্ডায়মান্, আমার মত এজন পতিত অধম জড়ধীর কোন অধিকারই নাই—সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব ঠাকুর মহাশয়ের কথা কীর্ত্তন করিবার। কেন না—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর। বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর ॥" শ্রীভগবান্ বা তাঁহার ভক্তগণ—পার্ষদগণ,—অধোক্ষজতত্ত্ব ; তাঁহাদের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট সমস্তই অধোক্ষজ। অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে সেই তত্ত্ব জানা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। বেদাদি সর্ব্ব-শাস্ত্রেই স্পষ্টরূপে একথা কীর্ত্তিত আছে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন—" ইত্যাদি। অতএব আমার মত মূঢ় কিভাবে সেই তত্ত্বের পরিচয় দিতে পারে? তবুও আমি আজ আপনাদের ন্যায় মহান্ বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের সম্মুখে যে দণ্ডায়মান্ হয়েছি,—তাহা একমাত্র গুরু-পাদপদ্মের কৃপাদেশ বলেই। "বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ, শুনিয়াছি সাধু-গুরুমুখে।"—কিন্তু আমি অযোগ্য। তবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইলে বিষ্ঠাভোজী কাক ও ভগবদ্বাহন গরুড়ের পদবী লাভ করিতে পারে ; পঙ্গুও পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের সামর্থ্য লাভ করিতে পারে ; মহামুর্খও পাণ্ডিত্য-প্রতিভালোকে দশদিক উদ্ভাসিত করিতে পারে এমনকি মুক অর্থাৎ বাক্-শক্তিরহিত ব্যক্তিও সরস্বতীর ন্যায় বক্তা হইতে পারে ; অতএব আমি সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সেবামুখে তাঁহার করুণা-শক্তি প্রার্থনা করি।

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাতেই তাহার কৃপা-শক্তি বিগ্রহ ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ আজ হ'তে প্রায় ১১৭ কি ১১৮ বৎসর পূর্ব্বে গৌর-ধামের অন্তর্গত নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামে আবির্ভূত হন।

ভগবান্ বা তদীয়গণের আবির্ভাব-কালের লক্ষণ, শাস্ত্রে এই প্রকার দেখা যায় যে,—যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সেই সেই কালে সাধুগণের পরিত্রাণ বা পালন, দুষ্কৃতগণের বিনাশ বা দমন এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ বা তাঁর পার্ষদ বা তাঁর ভক্তগণ জগতে

আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কিছু পরে, ঠিক অনুরূপ অবস্থা জীব-জগৎকে অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছিল ; সর্ব্ব-শাস্ত্র-তাৎপর্য্যসার সুবিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম কাল-প্রভাবে ক্রমশঃ আত্মগোপন করিতে থাকিলেন এবং তৎস্থানে মায়াপিশাচীর নব-নব বিলাস-ধর্ম্ম, জীবগণকে মহাধ্বান্তপূর্ণ ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতে থাকিল ; ফলে ধর্ম্ম, চর্ম্মগত-বিচারময় হইয়া পড়িল ! অজ্ঞতাই সাধুতার আসন গ্রহণ করিল ; যোগাদি, ভোগাভিসন্ধিমূলক হইয়া পড়িল ; জ্ঞানানুশীলন, শূন্যগতিতে পর্য্যবসিত ; জপাদি যশোলোভের জন্য, তপস্যাদি পরহিংসার জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল ; দানাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ এবং অনুরাগময় ভগবদ্ভজনের নামে ঘোরতর ব্যভিচার, বুদ্ধিমানগণেরও বুদ্ধিভেদ ঘটাইতেছিল। সাধুগণ—কালের প্রবল-প্রভাব দর্শন করিয়া, ও নিজেদের ভজন-জীবনের অত্যন্ত বিপদ-শঙ্কুল অবস্থা সমাগত দেখিয়া—ভীত হইয়া পড়িলেন এবং জীব-মঙ্গলের জন্য আকুল প্রাণে ভগবচ্চরণে যখন সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন,—ঠিক সেই সময় ভুবনমঙ্গল অবতার নদীয়া-বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপা-শক্তি-বিগ্রহ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ প্রভুর মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করতে নদীয়ার পূর্ব্বশৈল উদ্ভাসিত করিয়া বিমলানন্দ-জনকরূপে সাধুগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ বা তাঁহার পার্ষদগণের জন্মাদি লীলা প্রাকৃতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও তাহা অপ্রাকৃত—একথা আপনারা বহুবার শুনিয়াছেন ; কর্ম্ম-ফলবাধ্য জীব স্বকৃত-কর্ম্মফল-ভোগের জন্য এই জগতে জন্ম-গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্তু ভগবান্ বা তদীয়গণ, কৃপা পরবশ হইয়া অচিৎ জগৎ হইতে—এই বিপদ-শঙ্কুল সংসার হইতে জীবগণকে চিন্ময়ানন্দময় জগতে লইবার জন্য—ভগবৎ সেবানন্দরূপ স্বরূপ-সম্পদ দান করিবার জন্য স্বেচ্ছায় জন্মলীলা পরগ্রিহ করেন। একটি—পরতন্ত্রতা বশতঃ ; অপরটী—স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। আংশিক দৃষ্টান্তস্বরূপ,—কারাগারে কয়েদীগণ ও কয়েদীগণের মঙ্গলবিধানকারী শিক্ষকগণকে ধরা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাঁরা যে কোন কুলেই জন্মগ্রহণ করুন্

না কেন—কুলের সঙ্গেও তাঁদের কোন সম্পর্ক থাকে না। হনুমান্—কপিকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; ভগবদ্বাহন গরুড়দেব—পক্ষীকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের পূজাই করিয়া থাকে। এই জগতের শাস্ত্রীয় দৈব-বর্ণাশ্রম বিধিতেও দেখা যায় যে,—যে কোন কুলোৎপন্ন ব্যক্তিই তাহার গুণ-কর্ম্মাদি লক্ষণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সংজ্ঞায়—সংজ্ঞিত হইবে। জন্মের পরিচয়ে তাহাদের বর্ণ-নিরূপণ হইবে না। সুতরাং ভগবৎপার্ষদ যাঁরা—যাঁরা নিত্যমুক্ত, কুল-পরিচয়ে তাঁহাদের পরিচয় কিরূপে সম্ভব হইবে? এই জন্য জীব-শিক্ষক শ্রীল সনাতন গোস্বামী,—শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর বংশ পরিচয় বিষয়ে—"কায়স্থ-কুলাব্জ-ভাস্করঃ" এই পরিভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। পদ্মের সঙ্গে সূর্য্যের যতটুকু সম্পর্ক অর্থাৎ পদ্ম—জল জাত কোমল পুষ্প এবং সূর্য্য জগৎ-প্রকাশক, জ্বলন্ত অগ্নি-পিণ্ডস্বরূপ ; এই দুইএর কুলগত বা পদার্থ গত কোন সাম্য বা সাদৃশ্য নাই। তথাপি সূর্য্য স্বীয় কর-বিতরণের দ্বারা পদ্মকে প্রস্ফুটিত ও প্রফুল্লিত করিয়া যেটুকু সম্পর্ক অঙ্গীকার করেন, কুলের সঙ্গে বৈষ্ণবগণের সেইটুকু সম্পর্ক—এ দৃষ্টান্তও আংশিকভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে পার্ষদগণ বা বৈষ্ণবগণ যে কুলকে অঙ্গীকার করিয়া আবির্ভূত হন সেই কুলই পবিত্র হইয়া যায়—এবিষয়ে শাস্ত্রের এই শ্লোকটী প্রমাণরূপে আপনারা বিচার করিয়া দেখিবেন—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতি শ্চ ধন্য।" 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' এই শ্রৌত ন্যায়ানুসারে বিচার করিলে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, ভক্তের আবির্ভাব তিথির মাহাত্ম্য শ্রীভগবদাবির্ভাব তিথি-মাহাত্ম্য অপেক্ষাও অধিক মঙ্গলদায়ক। যেহেতু ভক্তের জীবনচরিতে অতি সুষ্ঠুভাবে শ্রীভগবৎ-তত্ত্বানুশীলন শিক্ষার যতটা সুযোগ হয় সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরিত্রে ততদূর হয় না। সেইজন্যই শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব ভক্ত-তত্ত্বের আচ্ছাদনে শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে জগতে উদিত হইয়া ভক্তি-শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব জগতের হাওয়া ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং ঠাকুরের মহাপুরুষ-লক্ষণ

সমূহ সজ্জনগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করে। প্রাকৃত পরিচয়ে,—বালক স্বল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে বিদ্যাধ্যয়নাদি কার্য্যে কালাতিবাহিত করেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা, মনোমুগ্ধকর চেষ্টা, অভূত পূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি এবং প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়া আত্মীয় বর্গ বিস্মিত হইয়া যান এবং বালকের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হইতে থাকেন। ধর্ম্মানুরাগ ঠাকুরের জীবনে এত প্রবলরূপ ধারণ করে যে, সেই অল্প বয়সেই সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে পণ্ডিতগণও মোহযুক্ত হইয়া পড়িতেন। সেই সময় হইতেই ঠাকুর মহাশয় বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করিতে থাকেন। আত্মীয়গণও বালকের কৈশোর-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত জীবের ন্যায় কর্ম্ম-লীলায় অবতীর্ণ হইয়া ঠাকুর মহাশয়, তৎকালে বঙ্গ-সন্তানগণের দুর্ল্লভ পদবী সমূহ গ্রহণ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে উড়িষ্যায় গমন করেন এবং সেখানে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থান করিতে থাকেন। তৎকালে তাঁহার ধর্ম্মালোচনার বিশেষ সুবিধা হয় এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীভক্তিমণ্ডপ স্থাপন করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে বহু ভক্তবৃন্দ, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরিশোভিত হইয়া জগৎ-জীবের ভব-বন্ধন-ছেদন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহ বিচার করিতেন। কৃষ্ণ-বিমুখ—বহির্ম্মুখ জীবের দুঃখে এতবেশী কাতর হইতেন যে, সময় সময় আত্মভোলার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে—"হা গৌরাঙ্গ হা নিত্যানন্দ ! তোমরা এই জগৎ-জীবের প্রতি একবার চাও প্রভো !" বলিয়া অজস্র রোদন করিতেন। সেই ভক্তিবিনোদ প্রভুর আকুল আহ্বানেই গৌর মহাপ্রভুর করুণার মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে একদিন জগদ্বাসী শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণ-ধূলি লাভ করিয়াছিল।

অত্যল্পকালের মধ্যেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারাদি আচার্য্য-লীলায় বহু শিক্ষিত

গণ্যমান্য সজ্জনগণও সেবকসূত্রে যোগদান করেন। শ্রীল ঠাকুরের প্রচারের পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বিমল-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, কতকগুলি অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের দ্বারা এরূপভাবে কলুষিত, বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল যে, লোকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলিতে—অত্যন্ত হেয়, ঘৃণ্য, নীচ-প্রকৃতি উপহাস করিত ; কিন্তু ভক্তিবিনোদের অভ্যুদয়ে ও চেষ্টায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্লানিমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বীয় বিমল-স্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্মের শীর্ষস্থানে 'জৈব-ধর্ম্ম'রূপে জগতের ধর্ম্মাকাশে নবোদিত প্রভাত-ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে গাগিল ; সজ্জনগণ সকলেই জানিলেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মই একমাত্র নির্ম্মল-উজ্জ্বল-নির্ম্মৎসর-ভক্তিবিনোদন কারী স্বরূপধর্ম্ম,—যার ভিতর নাই কোন কপটতা—আবিলতা—অবরতা এবং আরও জানিলেন—যদি সমস্ত ধর্ম্মও ব্যাষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয় তবে নিশ্চিত সেগুলি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপানরূপে শোভা পাইতে থাকিবে।

তথাকথিত চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর ভ্রান্ত-ধারণা নিরসন করিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মই যে, সর্ব্ব-ধর্ম্মের একমাত্র মহান্ চিৎসমন্বয় প্রদান করিতে পারে, একথা ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ভাষা-লেখনী ও সর্ব্ব-প্রকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের পরে জীব-জগৎকে তিনি যেভাবে হরিবিমুখতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে কোনদিনই কাহারও প্রতি মৎসরভাব পোষণ করিতে কেহই দেখে নাই, তবে নিরপেক্ষ-সত্যকথা কীর্ত্তনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাও তাঁহার ছিল না। ভক্তির নামে ছলধর্ম্ম, মিছাভক্তি বা অভক্তিপর বিচারের প্রশ্রয় কোনদিনই দেন নাই। তাঁহার লেখনী নির্ভীকভাবে তারস্বরে সত্যকথা ঘোষণা করিয়াছে। জাগতিক প্রতিষ্ঠাকে তিনি শূকরের বিষ্ঠার তুল্য মনে করিতেন। সেই সময় বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গৌরাঙ্গ-বিষয়ক নাটকের উদ্বোধনের জন্য শ্রীল ঠাকুরকে বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাহা সোজাসুজি পাঁচ-মিশালী ব্যাপার বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। উড়িষ্যার কোন এক মহাযোগী (?) যৎকালে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা পাহাড়ের

চুড়া হইতে নিজেকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া নরকের পথে স্ব-দলবলে অগ্রসর হইতেছিল এবং সনাতন-ধর্ম্মের পথে কণ্টকরাশি প্রদান করিতেছিল, তখন তিনিই তাঁহাকে কঠোরভাবে দমন করিয়াছিলেন। ভারতের বিশেষ বিশেষ মলিনতীর্থ সমূহকে যখন নির্ম্মল করিবার জন্য তিনি অভিযান করেন তখন কত অধম, কত পাপী তাপী তাঁহার সুশীতল চরণ স্পর্শ লাভে নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল তাহার আর কত উদাহরণ দিব। তাঁহার ভারত ভ্রমণে বহু বিরূদ্ধধর্ম্মের অবসান হইয়াছিল। এইসবের দ্বারা তাঁহার মহিমার দিগ্‌দর্শন করাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে ;—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অতি সংক্ষেপে (বিস্তৃত ত আছেই) দুই একটী পয়ারের মাধ্যমে ঠাকুর মহাশয়ের যে নিগূঢ় পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহার সুষ্ঠু পরিচয় পাইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের “অনুভাষ্য” শেষে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"তাঁহার করুণা-কথা, মাধব-ভজন-প্রথা,
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁর সম অন্য কেহ, ধরিয়া এ নর-দেহ,
নাহি দিল কৃষ্ণ-প্রেম-ধনে ॥
সেই প্রভু-শক্তি পাই, এবে অনুভাষ্য গাই,
ইহাতে আমার কিছু নাই।
যাবৎ জীবন রবে, তাবৎ স্মরিব ভবে,
নিত্যকাল সেই পদ চাই ॥
শ্রীগৌর-কৃপায় দুই, মহিমা কি কব মুই,
অপ্রাকৃত-পারিষদ-কথা।
প্রকট হইয়া সেবে, কৃষ্ণ-গৌরাভিন্ন-দেহে,
অপ্রকাশ্য কথা যথা তথা ॥"

এই পয়ার কয়টী শুনিলেই আমাদের মুখ বা কলম একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ; মনে হয় করিতেছি কি ! শিব গড়িতে গিয়ে বাঁদর গড়িয়া ফেলিতেছি ! ঠাকুরের মহিমা গাহিবার মত শক্তি আমাদের কোথায়?—কোথায় সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের অমল-চরিত, আর

কোথায় আমি মহাপতিত নরাধম !—শুধু এইটুকু আশাবন্ধ যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর অনুসম্বন্ধও জীবের সর্ব্বোত্তম কল্যাণ প্রদানে সমর্থ। বস্তুতঃপক্ষে ঠাকুরের করুণা সহস্রমুখে সহস্রধারায় প্রবাহিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিয়াছে।

এমন কোন পদার্থ, এমন কোন ভাব, এমন কোন বিষয়ই ছিল না, যাহাকে শ্রীল ঠাকুর কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিযুক্ত না করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার প্রধান দুইটি ধারার মধ্যে যেন ভাগীরথী ধারায় (স্বয়ং আচার ও প্রচার) সমগ্র জগৎকে পূত করিয়া কৃষ্ণসেবার উপকরণ করিয়াছেন ; আর সরস্বতী ধারায় বেদব্যাসের ন্যায় বেদাদি শাস্ত্রসমূহ মন্থন করিয়া আরও সহজ এবং সরলভাবে সর্ব্বত্র মুক্ত হস্তে কৃষ্ণপ্রেম-নবনীত বিলাইয়া দিয়াছেন। জগতে শ্রীল ভক্তিবিনোদের এই অতুলনীয় দানের কোন উপমা নাই—কোন বিনিময় নাই। গ্রন্থ জগতেও ঠাকুরের অপূর্ব্ব মহিমা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। তাঁহার রচিত "কি সূত্র-গ্রন্থ ; কি সংহিতা গ্রন্থ ; কি গীতি-গ্রন্থ ; কি ভাষা-গ্রন্থ ; কি লীলা-গ্রন্থ ; কি রস-বিজ্ঞানমূলক-গ্রন্থ ; কি সমালোচনা-গ্রন্থ ; কি টীকা-টিপ্পনী, কি ভাষ্য-রচনা ; কি তত্ত্ব-সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থ ; কি কাব্য-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন" প্রভৃতির আলোচনার গ্রন্থসমূহ ; তাঁহার প্রকাশিত অপ্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থ-রত্নাবলীই আজ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর সুস্নিগ্ধ সেবাময় আলোকে আরও অধিকরত উদ্ভাসিত হইয়া জগতের জীবকল্যাণ বিষয়ে মহাবদান্য অবতারীর অমন্দোদয়া-দয়ার আধারস্বরূপে তদভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে অতএব আর ২।১টী কথা বলিয়াই আমি বিদায় লইব।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধাম-সেবায় যিনি নিজের চেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই ভক্তিবিনোদপ্রভুর ধাম-প্রকাশের কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। বহু অপস্বার্থপর ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার বিষয়ে তাঁহাকে বহুপ্রকারে বাধা দিয়াছিল—কিন্তু তিনি অচল-অটলভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট যে শ্রীধামের প্রকাশ, তাহা এরূপ সুষ্ঠুভাবে করিয়া গিয়াছেন যে আজ সমস্ত অপস্বার্থপর

ব্যক্তিগণের কলুষিত জিহ্বার কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন আর মায়াপুরকে চাপা দিবার কোন উপায়ই তাহারা খুজিয়া পায় না। এখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে মায়াপুরের গুণগান করিয়া থাকে। এককথায় বলিতে গেলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ছিলেন একাধারে—শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-রায়রামানন্দ—হরিদাস-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম-প্রভুগণের মিলিতস্বরূপ। কেন না গোস্বামিবর্গের সমস্ত চেষ্টার পরাকাষ্ঠা তাঁহাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান দেখা যায়। কি ধাম প্রকাশ কার্য্যে ; কি লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার বিষয়ে ; কি অপ্রাকৃত গ্রন্থাদি-রচনায় ; কি ভক্তি-সিদ্ধান্তে ; কি বৈরাগ্যে ; কি দার্শনিক বিচারে ; কি হরিকথা কীর্ত্তনে ; কি হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা জীবোদ্ধারলীলায়; সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার অপ্রাকৃত সামর্থ্যের মহিমা যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়াছেন।

আজ্কের এই তিথিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি প্রকটিত হইয়াছিলেন। অতএব এই তিথিও পরম পূজনীয়া, বরণীয়া এবং করুণাময়ী। আমার এমন কোন উপায়নই নাই যাহার দ্বারা আমি এই তিথিবরার পূজা করি। আপনারা মহান্—পরম বৈষ্ণব ; আপনারা কৃপা পূর্ব্বক এই তিথিবরার পূজা করিবার যোগ্যতা আমাকে প্রদান করুন ; আর আপনাদের কৃপায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর কৃপা প্রার্থনার মহান্ আর্ত্তি জাগরিত হইয়া আমার অন্তর্বহিঃ শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তনের দ্বারা গৌরব মণ্ডিত হউক এবং নিত্যকাল শ্রীবিনোদ-সারস্বতগণের সেবায় নিযুক্ত করুক—এই প্রার্থনা।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও ভজন কুটির

নির্মিত
ইং ১৮৯৯ সাল
গোদ্রুম
শ্রীস্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ
ধাম
শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটির
SRI SWANANDA SUKHA KUNJA
SRILA HAKTI VINODE THAKU BHAJAN KUTIR

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার॥

তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন॥

তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার॥

তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত-দুঃখ-সুখ-সংঘটন॥

মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥

তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥

নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন মরণ॥

শ্রীহরিহর ক্ষেত্র

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করতে করতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটির থেকে এখন এই মনোরম স্থানে এসেছি। এটা হচ্ছে শ্রীহরিহর ক্ষেত্র। তার সম্বন্ধে একটা প্রাচীন কালের কথা আছে।

এক সময় দুর্ব্বাসা মুনি (বিরাট ঋষি ও যোগী) রাস্তায় গিয়ে হঠাৎ করে রাজা ইন্দ্রদেবকে সাক্ষাৎ করলেন। দুর্ব্বাসা মুনি দেবতার রাজাকে আশীর্বাদ দিতে চেয়ে নিজের গলা থেকে মালা নিয়ে রাজাকে প্রদান করলেন কিন্তু অহঙ্কার ও ঐশ্বর্য্যে মত্ত ইন্দ্রদেব মালাটা তাঁর হস্তীবাহন ঐরাবতকে দিয়েছিলেন। তাঁর তাচ্ছিল্য দেখে দুর্ব্বাসা মুনি ইন্দ্রদেবকে অভিশাপ দিলেন, “ত্রিলোকের সহিত তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যে ধন-দৌলত রহিত হোক !”

ওই খবর শুনে এবং আনন্দ পেয়ে অসুররা দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে হেরে গিয়ে দেবতাগণকে স্বর্গ থেকে পালিয়ে যেতে হল। তখন তাঁরা সবাই ব্রহ্মার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা দেবতার সঙ্গে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে এসে ভগবানের স্তব স্তুতি করতে লাগলেন, এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের স্তবে তুষ্ট হয়ে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে তাঁদের অসুরগণের সঙ্গে কৌশলে সন্ধিস্থাপন করবার পর মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকীকে রজ্জু করে অমৃতোৎপাদনার্থ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান্ আর একটা কথা বললেন—ঐ মন্থনফলে যা কিছু উৎপন্ন হবে, তার জন্য লোভ বা লড়াই করতে হবে না।

সেইজন্য দেবতারা এই উপদেশ অনুসারে অসুরগণের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবার পর অমৃত পাওয়ার জন্য (যে তাঁদেরকে অমর করবে)

সকলে মিলে মন্দর পর্ব্বত গিয়ে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করতে প্রস্তাব করলেন। অসুররা রাজি হলেন। বহু যত্ন করে সাগর মন্থন করতে করতে পরিশ্রম কষ্টের ফলে অনেক দেবতরা ও অসুরগণ প্রাণ ছেড়ে দিলেন কিন্তু পরম করুণাময় ভগবান্ এসে তাঁদেরকে আবার জীবিত করলেন। যেহেতু মন্দর পর্ব্বত সমুদ্রের জলের মধ্যে ভেসে ছিল, সেহেতু মন্থন করতে অসম্ভব ছিল—তখন ভগবান্ কুর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হয়ে জলের মধ্যে পিঠের উপরে মন্দরকে ধারণ করলেন। তারপর এই সমুদ্রমন্থনের ফলে অনেক কিছু স্ফূর্ত হতে লাগল—প্রথম ছিল বিষ। সবাই বিষটাকে দেখলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু দেবতারা শিবজী মহারাজের কাছে এসে তাঁকে প্রার্থনা করতে লাগলেন। শিবজী মহারাজ দয়া করে এসে সমস্ত বিষটাকে পান করেছিলেন (ওই সময় থেকে তিনি নীলকন্ঠ নামে প্রসিদ্ধ—আর যে বিষের এক এক বিন্দু মাটিতে পড়ে গেল, সেটা সাপ, বিছা, বিষাক্ত গাছগুলোর ইত্যাদি মধ্যে প্রবেশ করল)। তারপর আবার সমুদ্রমন্থন করতে করতে সুরভি গাভী উত্থিত হয়েছিল । দেবতারা ওকে গ্রহণ করেছিলেন যজ্ঞ করবার জন্য (গাভী ঘি, মাখন, ইত্যাদি দেন) । তারপর উচ্চৈঃশ্রবা নামে ঘোড়া উত্থিত হয়েছিল। বলি মহারাজ ওকে নিয়েছিলেন। তারপর অনেক কিছু হল—কৌস্তুভমণি, পারিজাত ফুল, অপ্সরাগণ, লক্ষ্মী দেবী, ইত্যাদি। এসবগুলা দেবাতার কাছে চলে গেল। অবশেষে ভগবান্ ধন্বন্তরি নামে পুরুষ-রূপে অবতীর্ণ হয়ে অমৃত নিয়ে এসেছিলেন। অমৃতের পাত্রটাকে দেখলে অসুররা সময় নষ্ট না করে ধন্বন্তরির হাত থেকে পাত্রটাকে শীঘ্র করে চুরি করলে পালিয়ে গেলেন । তারপর ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে লাগলেন। অসুরের দম্ভ দেখে অবাক হয়ে দেবতারা আবার বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বিষ্ণু উত্তরে কিছু না বলে অত্যন্ত সুন্দরী রমণীয় যুবতী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করেছিলেন।

অসুরদের কাছে এসে মোহিনী তাঁর সামনে কিছু মোহ প্রদান করেছিলেন—সমস্ত অসুরগণ তাঁর অপূর্ব্ব রূপের দ্বারা সম্পূর্ণ বিমোহিত হয়েছিলেন। অসুরদের দুর্বলতা অবস্থা বুঝে ভগবান্

মোহিনীরূপে অমৃত ভাগ করতে রাজি হলেন কিন্তু যেহেতু অসুররা এত বেশি তাঁর সুন্দরী রূপে অকৃষ্ট হয়ে ছিলেন, সেহেতু তাঁরা টের পেলেন না যে, ভগবান তাঁদেরকে ফাঁকি দিয়েছিলেন—সমস্ত অমৃত তিনি দেবতাগণকে দিয়ে দিলেন। বোকা অসুররা এত বেশি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা কিছু টের পেলেন না।

তার আগে এক সময় শিবজী মহারাজ ভগবানের চিন্তা করতে করতে প্রার্থনা করলেন, "প্রভু, একটা লীলা আমাকে দেখাও। আমি তোমার অদ্ভুত রূপ দেখতে চাই।" তাই যে দিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী মূর্ত্তির রূপ ধারণ করলেন, সেই দিন তিনি শিবজী মহারাজকে পরীক্ষা করতে মনে করলেন।

যখন কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে এই মোহিনী-রূপ ধারণ করলেন, তখন তিনি শিবজী মহারাজের প্রার্থনা শুনে তাঁর কাছে হাজির হয়ে একটা বল নিয়ে পিং পং করে খেলা করছিলেন। এই অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেয়ে শিবজী মহারাজ সম্পূর্ণ মোহিত হয়ে পড়লেন আর মেয়েটার পিছনে পিছনে দৌড়াতে লাগলেন।

সবাই তাঁকে দেখে বললেন, "আরে বাবা ! ওই সাধু লোকটি মেয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছে কেন ? ও কি পাগল হয়ে গেল ?"

পার্ব্বতীও বললেন, "আরে ! তুমি কোথায় যাচ্ছ, প্রভু ?! আমি তোমার স্ত্রী আছি !"

কোনটি স্ত্রী ! সব ছেড়ে দিয়ে শিবজী মহারাজ কিছু শুনতে পেলেন না। দৌড়ে গিয়ে অবশেষে মেয়েটাকে ধরে ফেললেন কিন্তু তিনি যখন তাঁকে আলিঙ্গন করলেন তখনই মেয়েটা কৃষ্ণ-রূপ হয়ে গেলেন আর উভয়ের দুই অঙ্গ মিশে গেল—একটা হরি আর একটা হর।

যে স্থানে এসব হয়ে ছিল, সেই স্থানের নাম হল 'হরিহর ক্ষেত্র'। সেখানে আমরা আজকে বহু ভাগ্যের ফলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও ভক্তগণের কৃপায়, এসেছি এবং এই অদ্ভুত ভগবানের লীলা স্মরণ করতে সুযোগ পেয়েছি।

জয় শ্রীল গুরু মহারাজ কি জয়। শ্রীহরিহর ক্ষেত্র কি জয়।

শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥

শ্রীনৃসিংহপল্লী

আমাদের পরিক্রমার এই দিনে শেষ জায়গা হচ্ছে শ্রীনৃসিংহপল্লী মন্দির। শ্রীল গুরুদেবের কৃপায়, শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় এবং শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপায় আমরা এখানে একটা ছোটা জায়গা পেয়েছি এবং প্রতি বছর এখান থেকে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে সুযোগ পাই।

শ্রীনৃসিংহদেব ও প্রহ্লাদ মহারাজের কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, আপনাদের এই কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে হবে এবং সব সময় মনে রাখতে হবে।

হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ আসলে দুই ভাই বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষক ছিলেন, তাঁদের নাম জয় ও বিজয়। এক দিন যখন নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, তখন জয় ও বিজয় পাহারা দিচ্ছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার চারজন পুত্র উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে এসে গিয়েছিলেন। জয় ও বিজয় তাঁদেরকে তাচ্ছিল্য করলেন, "নারায়ণ এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তোমাদের এখন যাওয়া হবে না।" তাঁরা যে ব্রহ্মার পুত্রগণ ছিলেন না জেনে জয় ও বিজয় শিশুদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন কিন্তু শিশুর মধ্যে একজন তাঁদেরকে বললেন, "তোমাদের আমরা অভিশাপ দেব! তোমাদের এই মর্ত্যে আসতে হবে আর বৈকুণ্ঠে থাকতে পারবে না।" জয় ও বিজয় অবাক হয়ে প্রায় মূর্চ্ছা হয়ে পড়লেন—"কী? এরা কি করেছেন? অভিশাপ দিয়ে দিলেন?"

ওই সময় ভিতর থেকে নারায়ণ চেঁচামেচিটা শুনে বাহিরে চলে এসে জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে। জয় ও বিজয় বললেন, "প্রভু, আমরা আপনার দ্বাররক্ষক—এই ছেলেগুলো আমাদেরকে আপনার

বিশ্রামে বিঘ্ন করতে বলল আর আমরা যেহেতু রাজি হয়ে গেলাম না, তাঁরা সেহেতু আমাদেরকে অভিশাপ দিয়েছে।"

নারায়ণ তখন বললেন, "তথাস্তু ! তাই হবে।"

"সে কী ? আমাদের মর্ত্যে যেতে হবে?!"

"যখন তারা অভিশাপ দিয়েছে, তখন যেতে হবে।" (সব কিছু ভগবানের ইচ্ছায় হয়েছে।) তখন নারায়ণ তাঁদের এক শর্ত দিলেন, "যদি তোমরা মর্ত্যে এসে আমার সঙ্গে মিত্রতা করবে, আমার পূজা ও সেবা করবে, তাহলে তোমাদের ফিরে যাওয়ার জন্য সাত জন্ম লাগবে। আর যদি আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে, তাহলে তিন জন্ম লাগবে। কোনটা করবে ?"

"প্রভু, আপনার কাছে তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য আমরা শত্রুই থাকব !"

তখন তাঁরা সত্যযুগে হলেন হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতাযুগে হলেন রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরযুগে হলেন শিশুপাল ও দন্তবক্র—তাঁরা সব সময় কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঘৃণা করতেন।

তাই, তাঁরা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ দুই ভাই হলেন। সেই অসুর দুই ভাই সবাইকে উৎপাটন করতে শুরু করলেন। কত ভীষণ অত্যাচার তাঁরা করতে লাগলেন ! স্বর্গ থেকে দেবতারা তাঁদের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে স্বর্গ রাজ্য থেকে পালিয়ে গেলেন। এটা শুনে হিরণ্যাক্ষ আরও বেশী অত্যাচার করতে লাগলেন, তখন ভগবান রেগে গিয়ে শূকররূপ ধারণ করে (বরাহ অবতার) হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন।

যখন হিরণ্যকশিপু খবর পেয়েছিলেন যে, তাঁর ভাই মরে গিয়েছিলেন, ভীষণ রেগে গিয়ে তিনি তখন জঙ্গলে চলে গিয়ে ব্রহ্মার তপ করতে লাগলেন। না খেয়ে তিনি হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন (এমন ভাবে তপ করেছে যে তাঁর শরীর থেকে সমস্ত মাংসগুলো পর্যন্ত চলে গিয়েছে—শুধু হাড়টা রয়েছে)। তখন এক দিন ব্রহ্মা তাঁর তপে খুব খুশি হয়ে তাঁর কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল তুমি কী বর চাও ?"

“আমি অমরতা চাই। এই বর আমাকে দাও যেন আমাকে কেউ মারতে না পারবে।”

“এটা তো আমার বাহিরে, এটা আমার হাতে নয়। আমার অনেক আয়ু বেশী কিন্তু আমাকেও এক দিন এই দেহ ছেড়ে দিতে হবে। আমি এটা তোমাকে দিতে পারব না। আর অন্য কিছু চাও ?”

তখন হিরণ্যকশিপু তাঁর অসুরের চাতুরতা প্রকাশ করতে মনে করলেন। তিনি বললেন, “তখন আমি চাই, যেন আমি দিনেও মরব না রাত্রেও মরব না।”

ব্রহ্মা বললেন, “ঠিক আছে।”

“আমি তোমার কোন স্ৃষ্ট জীবের দ্বারা মরব না।”

“তাও ঠিক আছে।”

“আমি আকাশেও মরব না, মাটিতেও মরব না, পাতালেও মরব না।

“তাও ঠিক আছে।”

“আমি ঘরেও মরব না, বাহিরেও মরব না।”

“তাও ঠিক আছে। তুমি যে বরটা চাও, আমি তোমাকে এই বরটা দিয়ে দিলাম।”

ইতিমধ্যে, জঙ্গলে চলে যাওয়ার আগে হিরণ্যকশিপু তাঁর স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন—তাঁর নাম ছিল কয়াধু। যখন হিরণ্যাক্ষকে ভগবান্ বধ করেছিলেন, দেবতারা আবার স্বর্গে ফিরে এলেন। এক দিন তাঁরা হিরণ্যকশিপুর বাসস্থানে এসে তাঁর বাড়িটা লণ্ডভণ্ড করে দিলেন। কয়াধুকে একা দেখে তাঁরা ওঁকে হত্যা করবার জন্য মনে করলে ওঁকে নিয়ে চলে গেলেন। মাঝখানে রাস্তায় নারদের সঙ্গে দেখা হল।

নারদ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা একে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? মহিলার স্বামী এখন ব্রহ্মার তপ করতে জঙ্গলে গিয়েছেন আর তোমরা কোথায় একে নিয়ে যাচ্ছো ?”

“একে মেরে ফেলতে যাচ্ছি ! এর গর্ভে হিরণ্যকশিপুর সন্তান আছে, এই সন্তান যদি জন্ম গ্রহণ করবে, তাহলে সেও অসুর হবে। আমরা এটা সহ্য করতে পারব না !”

নারদ তাঁদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, “তোমরা জান না, এর গর্ভ থেকে যে সন্তান হবে, সে মহান্ ভক্ত হবে—ও তোমাদেরকে রক্ষা করবে। কাজ কর, বরং মহিলাকে আমার কাছে দিয়ে দাও।”

তাই, কয়াধু নারদের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে চলে গেলেন। সেখানেই তিনি ঠাকুরের বাসন মাজা, সেবা, পূজা, ইত্যাদি করতে লাগলেন, আর যখন নারদ প্রত্যেক দিন ভাগবত্ পাঠ করতেন, তখন প্রতি দিন কয়াধু ওঁর মুখে হরিকথা শ্রবণ করতেন। ভাগবতে যে শিক্ষাগুলো দেওয়া হয়, প্রহ্লাদ মহারাজ মায়ের পেটে বসে সে শিক্ষাগুলা শ্রবণ করেছেন আর পরে তিনি তাঁর বাবা ও স্কুলের বালকগণকে সেই শিক্ষা দিয়েছেন।

এক দিন নারদ মুনি কয়াধুকে বললেন, “কয়াধু, তোমার সেবায় আমি খুব খুশি হয়েছি, তুমি কী বর চাও? বল।” কয়াধু বললেন, “আমার স্বামী বনে চলে গিয়েছে ব্রহ্মার স্তপ করতে। অসুর হলেও সে তো আমার স্বামী... আপনি আমাকে এমন বর দিন : স্বামী ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার সন্তান যেন প্রসব না হয়।” নারদ রাজি হয়ে তাঁকে ওই বর দিয়ে দিলেন।

এদিকে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ফিরে এলেন। এসে তিনি দেখলেন যে, বাড়িটা লণ্ডভণ্ড অবস্থায়—রেগে গিয়ে তিনি হুংকার দিলেন, “কোথায় গেল আমার স্ত্রী?!” একজন তাঁকে বলল, “নারদ মুনি এখানে এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন, আপনার স্ত্রী তাঁর আশ্রমে।” নারদ গোস্বামীর আশ্রমে গিয়ে হিরণ্যকশিপু স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে চলে এলেন। তখন তাঁর সন্তান প্রসব হলেন। তাঁরা তাঁকে নাম রাখলেন প্রহ্লাদ।

আস্তে আস্তে প্রহ্লাদ বড় হতে লাগল। অসুরদের গুরু ছিল শুক্রাচার্য্য, তাঁর দুই পুত্র ছিল, ষণ্ড আর অমর্ক। হিরণ্যকশিপু ছেলেকে তাঁদের কাছে পড়তে পাঠিয়ে দিয়ে আজ্ঞা দিলেন, “সাম-দান-দণ্ড-ভেদ সব শিক্ষাগুলো তাঁকে দাও—কার সঙ্গে দণ্ড করতে হবে, কার সঙ্গে ভেদ জ্ঞান করতে হবে, এ সব শিক্ষা দেবে।” তাঁরা সেটাই করতেন কিন্তু যত ষণ্ড-অমর্ক প্রহ্লাদকে শিক্ষা দিচ্ছে, ওই সব তাঁর কানে যাচ্ছে না।

এক দিন হিরণ্যকশিপু ষণ্ড-অমর্কে ডাকলেন, “আমার ছেলে কী শিখেছে? ওকে একবার নিয়ে চলে এস!” প্রহ্লাদ বাড়িতে এলেন, মা তাঁকে নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে, মাথায় তেল দিয়ে, ইত্যাদি বাবার কাছে বসিয়ে দিলেন। বাবা ছেলেকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাবা, তুমি এই স্কুলে পড়লে কি ভালো শিক্ষা পেয়েছ? তুমি যেটা ভালো শিখেছ, তার মধ্য থেকে একটা সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা কী? বল।”

প্রহ্লাদ বললেন, “বাবা, আমি শিক্ষাটা বলব।” তখন বললেন,

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

এটা শুনলে হিরণ্যকশিপু তাঁকে একবার কোল থেকে ছুড়ে ফেলে দিলেন, “এটা আমার ঘরে শত্রু জন্মিয়েছে রে!! আমার গণে শত্রু হয়েছে!” ষণ্ড-অমর্কে ডেকে বললেন, “ওই রে! আমার ছেলেকে তোমরা কি শিখিয়েছ?!”

ষণ্ড-অমর্ক উত্তরে বললেন, “প্রভু, বিশ্বাস করুন, এসব শিক্ষা আমরা ওকে কোন দিন দিই নি! কোথা থেকে ও এটা পেয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না।”

হিরণ্যকশিপু তখন তাঁদেরকে কঠোর নির্দেশ দিলেন, “ভালো করে লক্ষ্য রাখ: বোধ হয় তোমাদের স্কুলে অন্য কেউ এসে একে এটা শিখিয়ে দেয়!”

“ঠিক আছে। আমরা দেখব।”

আর প্রহ্লাদ কী করলেন? যে স্কুলে অসুররা ছিল, তারা সবাই প্রহ্লাদ মহারাজের দলে এসেছিলেন—স্কুলের মাস্টরমশাইটা যা বলতেন, প্রহ্লাদ তাদেরকে উলটো কথা বলতেন।

কিছু দিন পরে হিরণ্যকশিপু আবার প্রহ্লাদকে বাড়িতে নিয়ে এলেন, আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “বল, কী ভালো শিক্ষা শিখেছিস তুই? মাস্টরমশাই কী তোকে শিখিয়েছে?”

প্রহ্লাদ তখন বললেন, “শ্রবণং, কীর্ত্তনং, স্মরণং, বন্দনং, পাদ-সেবনম্, দাস্যং, সখ্যম, আত্মনিবেদনম...”

“এ কী ?? ! এসব কী বলছিস !?”

একেবারে হিরণ্যকশিপু রেগে গেলেন ! হুংকার দিয়ে বললেন, “ওই রে ! কুলাঙ্গার !” আর নিজে মনে করলেন, “এর যে অবস্থা হয়েছে, একে বধ করতে হবে !”

ছেলেকে মেরে ফেলতে হিরণ্যকশিপু নানা উপায় চেষ্টা করেছিলেন—জলের মধ্যে ফেলে দিলেন, মত্ত হস্তির পায়ের মধ্যে বেঁধে দিলেন, সাপের বিষ দিলেন, আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন, ইত্যাদি, বিভিন্ন উপায় চেষ্টা করলে—কিছুতেই তাঁকে মারতে পারলেন না—সব চেষ্টা বিফল।

তখন হিরণ্যকশিপু তাঁর লোকজনকে ডেকে বললেন, “তোমাদের দ্বারা কিছু হল না, আমার কাছে ওকে নিয়ে চলে এস ! আমি ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব !” প্রহ্লাদ তাঁর পাশে এসে বসলেন।

হিরণ্যকশিপু গর্জন দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “এখন বলে দাও—তুই এই সব শিক্ষাগুলো কোথা থেকে পেয়েছিস ?”

প্রহ্লাদ শান্ত স্বরে বললেন, “বাবা, যাঁর এটা শিক্ষা, তিনিই এটা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।”

“মাস্টরমশাইও বলছে এটা ওর শিক্ষা নয় !” বলে হিরণ্যকশিপু ভাবলেন, “ওরা ওকে মারতে পারল না, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি !” আর আবার বললেন, “হে কুলাঙ্গার ! বল, তুই এই বলটা কোথা থেকে পেয়েছিস ? আগুনে পুড়ে মরছিস না, জলের মধ্যে ফেলে দিলে ডুবে মরছিস না, তোকে পাহাড় থেকে ফেলে দিলাম, তুই মরলি না ! বল ! তোকে কে এমন বল দিয়ে দিল ?”

“হে পিতা ঠাকুর ! আপনি যে বলে বলীয়ান, আমিও সেই বলে বলীয়ান। আপনি যেখান থেকে বর পেয়েছেন, আমিও সেখান থেকে পেয়েছি। আপনি ব্রহ্মার কাছ থেকে বল পেয়েছেন, ব্রহ্মা তাঁর সমস্ত শক্তি হরির কাছ থেকে পেয়েছেন আর আপনি ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়ে অহঙ্কারে একবারে মত্ত হয়ে ভুলে গিয়েছেন আপনি বরটা কোত্থেকে পেয়েছেন। সব বর হরির কাছ থেকে এসে যায়।”

“আঃ ! বারবার ‘হরি’, ‘হরি’ বলছিস ! তোর হরি কোথায় আছে ?”

“কৃষ্ণ সর্বত্রই আছেন।”

“তাই না কি ? তোর হরি কোথায় থাকে ?”

“হরি কোথায় না থাকেন ?”

“সর্ব্বত্রই আছে ? হরি এই স্তম্ভের মধ্যেও আছে ?”

“হ্যাঁ, এখানেও আছেন।”

“এখানে আছে তোর হরি ??!”

তখন হিরণ্যকশিপু ঐ স্তম্ভে ঘুষি মারলেন—স্তম্ভটা ভেঙ্গে পড়ে গেল আর সেখান থেকে বিশাল চিৎকার শোনা হল—অসুরের সামনে স্বয়ং ভগবান্ আবির্ভূত হয়েছিলেন ! এই খুঁটি থেকে নৃসিংহদেব (আধা নর, আধা সিংহ) আবির্ভুত হয়েছিলেন। তাঁকে দেখলে হিরণ্যকশিপু খুব উদ্দণ্ড মত্ত হয়ে গেলেন আর অসুরকে দেখলে নৃসিংহদেবও খুব উন্মত্ত হয়ে গেলেন। ভগবান আগে জয় আর বিজয়কে বলেছিলেন, “আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াই করব,” সে লড়াইয়ের কথা তাঁকে এখন মনে পড়ল আর তিনি লড়াই করতে নিজেকে প্রস্তুত করলেন।

তখন হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে নৃসিংহদেবের জোর লড়াই হয়েছিল। ওই ভীষণ যুদ্ধের দৃশ্য দেখে সব দেবতারা বললেন, “হায় হায় কী হবে ? আমার প্রভু বোধ হয় এক্ষুণি হেরে যাবে ! যদি ভগবান্ হেরে যান...” কিন্তু ভগবান্ হিরণ্যকশিপুকে হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে আবার তাঁকে হাতে ধরলেন আর আবার ফট্ করে ছেড়ে দিলেন। দেবতারা ভয় পেয়ে বললেন, “হায় হায় ! প্রভু বোধ হয় পারবে না ? প্রভু লড়াইরে হেরে যাচ্ছ ?!” তারপর হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করলেন—এই সময় নৃসিংহদেব তাঁকে আর একবার ধরে তুলে নিয়ে নিজের ঊরুর মধ্যে রাখলেন (ব্রহ্মা তাঁকে বর দিলেন যে, তিনি মাটিতেও মরবেন না, আকাশেও মরবেন না, পাতালেও মরবেন না, কোন অস্ত্র দ্বারাও মরবেন না, ইত্যাদি)। তখন আর দেরি না করে ভগবান্ নখ দিয়ে হিরণ্যকশিপুর বুকটাকে চিঁড়ে ফেললেন আর নাড়িভুঁড়িটাকে বাহির

করে নিজের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন !

রাগ প্রকাশ করে ভগবান চিৎকার করে থাকলেন—ওই চিৎকার শুনে দেবতারা ভয়ে কাঁপতে শুরু করলেন। লক্ষ্মীদেবীর কাছে গিয়ে সবাই বললেন, “লক্ষ্মী, তুমি যাও, প্রভুর হুংকারে এই পৃথিবী লয় হয়ে যাবে !” লক্ষ্মীদেবী বললেন, “আমি পারব না, আমি ঠাণ্ডা নারায়ণের সেবা করি আর প্রভু এখন এমন রেগে গিয়েছেন আমি যাব না।” তখন সমস্ত দেবতারা প্রহ্লাদ মহরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে ভগবানকে ঠাণ্ডা করতে অনুরোধ করলেন।

প্রহ্লাদ মহারাজকে দেখলেই মাত্র নৃসিংহদেব হঠাৎ করে স্থির হয়ে খুব আনন্দ পেলেন (“ভক্তের অধীন দয়া করেন ভগবান”)।

তিনি বললেন, “প্রহ্লাদ, বাবা, তুমি একটা কিছু বর চাও ?”

প্রহ্লাদ বললেন, “প্রভু, আমি আর কী বর চাইব? আপনি আমাকে কৃপা করবার জন্য এসেছেন—প্রভু, আমার এইটা যথেষ্ট। আমি আর কিছু চাই না...”

“না, কিছু নিতে হবে।”

“তাহলে আমার বাবা আপনার শ্রীঅঙ্গে আঘাত করেছেন—কৃপা কর ওঁকে উদ্ধার করে দিন।”

“সেটা কিন্তু বর নয়। তোমার বাবা আমার অঙ্গ স্পর্শ করেছে। আমার যে কীর্ত্তন করে, আমার যে নাম করে, আমাকে যে একবার দর্শন করে, সে কৃপা পেয়ে বৈকুণ্ঠে চলে যাবে—আর তোমার বাবা আমাকে স্পর্শ করেছে। সে রাগের ঠেলায় করুন বা মারামারি ঠেলায় করুন, সে তো আমাকে স্পর্শ করেছে তাই সে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়েছে। সেইজন্য এটা বর নয়। বল আর কী বর চাও ? কী বর আমি তোমাকে দিতে পারি ?”

তখন প্রহ্লাদ বললেন, “আর কী চাইব ? আপনার যদি কিছু দিতে হয়, তাহলে এই বর আমি চাই, আমার যেন সমস্ত চাওয়ার বাসনা কেটে যায়। এই বরটা আমাকে দিন, প্রভু।”

এইটা হচ্ছে মূল শিক্ষা এখানে। ভগবানের কাছ থেকে চাওয়ার বাসনাটা কেটে যেতে হবে। ভগবানের কাছ থেকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করবার জন্য আমরা সবসময় এই চাই, সেই চাই—এইটা বন্ধ করতে হবে। প্রহ্লাদ মহারাজ, হিরণ্যকশিপু, নৃসিংহদেব লীলার অর্থ হচ্ছে যে, লোক নৃসিংহদেবের কাছে এসে সব সময় বলেন, "আমার ছেলে চাকরি হোক," "মেয়ের বিয়ে হোক," "শরীর ভালো হোক," "টাকা-পয়সা হোক" ইত্যাদি। যে শুদ্ধ ভক্ত, সে প্রার্থনা করে, "ভগবান্, আমি তোমাকে একমাত্র প্রার্থনা করি, যেন আমার শুদ্ধ ভক্তি আর তোমার চরণে অচলা ভক্তি থাকে, তোমার চরণে যেন রতিমতি থাকে, যেন তোমার কৃপায় তোমার জন্য চিরন্তন আমি সেবা করতে পারি। ভক্তির বিনাশ যেন না হয় তুমি শুদ্ধ ভক্তির বিঘ্ন বিনাশ কর ! ওই মায়ার কবলে পড়ে যেন আমার ভক্তিতে বিনষ্ট না হয়, সেইরকম তুমি একবার কৃপা দাও। সেরকম বরটা আমি চাই—নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করবার জন্য আমি কিছু চাই না !"

প্রহ্লাদকে রক্ষা করবার জন্য, শুদ্ধভক্তির বিঘ্নকে বিনাশ করবার জন্য নৃসিংহদেব এই জগতে এসেছিলেন এবং এই গোদ্রুমধামের লগ্নে বিশ্রাম নিয়েছিলেন—হিরণ্যকশিপুরকে বধ করবার পরে এই পুকুরের মধ্যে যা মন্দিরের পাশে আছে, তিনি তাতে হাত ধুয়ে ওখানে বিশ্রম নিয়েছিলেন। পরে ভগবান্ নৃসিংহদেব বিগ্রহ-রূপ ধারণ করে এখানে সেবা গ্রহণ করবার জন্য নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেই ভগবান্ নৃসিংহদেবের বিগ্রহের সেবা নবদ্বীপধামে সত্য-যুগ থেকে চলছে।

ভক্তের লাঞ্ছনা, ভক্তের কষ্ট ভগবান সহ্য করতে না পেরে ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য তিনি এই নরসিংহ-রূপ ধারণ করেছিলেন। এটা আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে এবং আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যে আমি শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীমুখে শুনেছি। এই কথা সবাইকে হৃদয় দিয়ে শুনতে হবে এবং সব সময় মনে রাখতে হবে। সাধারণ বুদ্ধিতে (বিষয়-আসক্তি বুদ্ধি, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি, ধর্ম্ম-অর্থ-

কাম-মক্ষার বুদ্ধি দিয়ে) নৃসিংহদেবের শিক্ষা বোঝা যাবে না। শুদ্ধ ভক্তি লাগে, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ লাগে।

এক দিন একজন ভক্ত নৃসিংহদেবের তাবিজ গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছেন । তাবিজটাকে লক্ষ্য করলে শ্রীল গুরুদেব ওই ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কী ?"

উনি উত্তর দিলেন, "নৃসিংহদেবের তাবিজ।"

গুরুদেব তখন প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি নৃসিংহদেবকে নিজের কাজে ব্যবহার করছেন না নৃসিংহদেবের সেবা করছেন। নৃসিংহদেবকে নিজের স্বার্থে লাগাছেন না নৃসিংহদেবকে সেবা করবেন ? কোনটা করা উচিত ? সিদ্ধান্ত বলুন।"

উনি বরিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আমি গুরুমহারাজের প্রশ্ন শুনলে অবাক হয়ে গেলাম—চুপ করে বসে থাকলাম। শ্রীল গুরু মহারাজ তখন বললেন, "আপনি নৃসিংহদেবকে নিজের কাজে লাগাছেন কিন্তু নৃসিংহদেব শুদ্ধ ভক্তির বিঘ্ন বিনাশকারী— নৃসিংহদেব আপনার বিঘ্ন-বিনাশকারী নন ! নৃসিংহদেবকে ব্যবহার করবেন না— নৃসিংহদেবকে সেবা করবেন।"

তার অর্থটা কী ? সবাই বলে, "হে নৃসিংহদেব, আমার বিঘ্ন বিনাশ করে দাও", "আমার এই করে দাও," "সেই করে দাও" কিন্তু তারা নৃসিংহদেবকে ব্যবহার করেন—আমরা নৃসিংহদেবের কাছে যাই নৃসিংহদেবের সেবা করবার জন্য, নৃসিংহদেবকে প্রণাম করবার জন্য, নিজের কাজে নৃসিংহদেবকে ব্যবহার করবার জন্য নয়। আপনারা নৃসিংহদেবকে স্মরণ করতে পারেন, কিন্তু নৃসিংহদেবকে আপনার শরীরের জন্য, আপনার দেহের জন্য, আপনের মনের জন্য আপনারা ব্যবহার করবেন না। এটা হচ্ছে আমাদের গুরুমহারাজের কথা।

যে শিক্ষা শ্রীল গুরুদেব আমাকে দিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যে কথাটা তিনি বলেছেন, সেটা আমি এখনও মনে রাখি এবং আপনাদের মঙ্গল প্রদান করবার জন্য এখন বলে দিচ্ছি। আপনারা নৃসিংহদেবের সেবা করতে পারেন কিন্তু আপনাদের বিঘ্ন

বিনাশ করবার জন্য আপনারা নৃসিংহদেবকে ব্যবহার করতে পারেন না। কত সুন্দর কথা শ্রীল গুরুদের বলেছেন।

আমি যখন নৃসিংহপল্লীর পাশ দিয়ে যাই, তখন রাস্তায় প্রণাম করে আসি। গাড়ি সামনে থামিয়ে মন্দিরে এসে প্রণাম করি আর মাঝে মাঝে ওখানে বেশি ভিড় আছে, তখন আমি দূর থেকেও প্রণাম করে আসি। আসলে নৃসিংহদেবের দর্শন করবার জন্য আমাদের চোখ নেই—আমি সেখানে এসে যাই আর আমি কী দেখতে পাই, কী দেখতে না পাই, সেটা আমার ব্যপার নয়—নৃসিংহদেব সেটা ভালো করেই জানেন। আমি যে তাঁর কাছে এসেছি, সেটা নৃসিংহদেব দেখতে পেলেই ভালো। আমি যে, নৃসিংহদেবকে দেখব, সেই চোখটা আমার নেই।

অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয ধূলিতে।
কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥

সেই জন্য, নৃসিংহদেবকে সেবা করতে হবে, নৃসিংহদেবকে ব্যবহার করবেন না। নৃসিংহদেবের তাবিজ অনেক জায়গায় বিক্রি করা হয়—লোকগুলো নৃসিংহদেবকে নিয়ে ব্যবসা করে, নৃসিংহদেবকে বিক্রি করে, ওরা নৃসিংহদেবের সেবা করে না। সেরকম উদ্দেশ্যে আমরা নৃসিংহদেবের কাছে যাই না। নৃসিংহদেবকে পায়াস ভোগ দেব, পরমান্ন ভোগ দেব, দুধ সেবায় লাগাব, চাল সেবায় লাগাব, চিনি সেবায় লাগাব, ফল সেবায় লাগাব—সেটা হচ্ছে নৃসিংহদেবের সেবা। এই বুদ্ধি নিয়ে সব সময় থাকতে হবে ।

সুতরাং, যা ওই দিন হয়েছিল (যখন ওই ভক্ত তাবিজ গলায় পড়ে শ্রীল গুরুদেবের সামনে হাজির হলেন), সেটা আমি আপনাদেরকে ভাল ভাবে বলে দিলাম। আর একটা কথা আছে এই তো : যে শিক্ষা বা কথা প্রহ্লাদ মহারাজ মায়ের পেটে বসে শুনিছিলেন, সেই কথাগুলা ভাগবতে লেখা আছে। সেই কথাগুলা তিনি নারদ মুনি থেকে শুনিছেলেন। নারদ মুনির প্রধান শিক্ষা হচ্ছে যে, যা কিছু হয়, সব কিছু ভগবানের কাছ থেকে এসে যায়।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ (ব্রহ্মসংহিতা, ৫/১)

অর্থ বলুন, ধর্ম্ম বলুন, কাম বলুন, মোক্ষ বলুন—এটা সব সাময়িক (temporary) কিন্তু ভক্তি দিয়ে যদি ভগবানকে লাভ করা যায়, সেটা চিরস্থায়ী (permanent)। সেইজন্য সমস্ত ধর্মধ্বজী—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—বাদ দিয়ে আমাদের ভক্তি অনুশীলন করতে হবে।

ভক্তির মধ্যে বিভিন্ন রস বা ভাব আছে—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুররস। শান্তভক্তের অধিকারী হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ। খুব অল্প বয়সে (৫ বছর বয়সে) হয়েও ভগবানকে শান্তরসে আরাধনা করে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে লাভ করেছিলেন আর শুধু তাই নয়—যেমন বলি মহারাজ তাঁর গুরুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, যেমন ভরত মহারাজ তাঁর মাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তেমন ভগবানকে পাওয়ার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজও তাঁর পিতাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। যখন বলি মহারাজের গুরু তাঁকে খারাপ উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশ তাঁর ভাল লাগল না কারণ ওই উপদেশ অনুসরণ করলে ভগবানের সেবার বিঘ্ন হত, তাই বলি মহারাজ গুরুর কথা না মেনে ওঁকে ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। আর বাবাকে ত্যাগ করে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন—সেটা হচ্ছে নির্মৎসর। প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তি হচ্ছে নির্মৎসর ও নিষ্কাম। ওঁর ভক্তি সকাম ভক্তি নয়।

যখন আমরা নৃসিংহপল্লীতে গিয়ে নিজের মন সম্পূর্ণ করবার জন্য—গাছের সঙ্গে একটা পুঁতি বেঁধে দিয়ে চলে আসি, সেটা শুদ্ধ ভক্তি নয়। ভক্তের মধ্য ভাগ আছে—সকাম ভক্তি ও নিষ্কাম ভক্তি। সকাম ভক্তি মানে ভক্তির বিনিময়ে আমরা কিছু চাই,—"ভগবানের সেবা করব আর তার বিনিময়ে কিছু চাই।" প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তি ছিল নিষ্কাম ভক্তি। তিনি বললেন, "হে ভগবান্, আমি তোমার সেবা করব আর তার বিনিময়ে কিছু চাই না। বরং তুমি আমার এমন বর দাও, যেন আমার চাওয়ার বাসনা চলে যায়।"

এটা হচ্ছে প্রধান শিক্ষা।

আমি বলেছি যে, ধর্ম্ম বলুন, অর্থ বলুন, কাম বলুন, মোক্ষ বলুন—এগুলা ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী কী হবে? ভক্তি অনুশীলন করলে, কৃষ্ণ অনুশীলন করলে, ভগবানকে পাবেন।

তাই আমাদের শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে আমরা শ্রীনৃসিংহপল্লী এসেছি। এই কথাগুলা আমাদের সব সময় হৃদয়ে রাখতে হবে। সাধু সাবধান!

জয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেব কি জয় / জয় প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়
জয় শ্রীশ্রী গৌরনিত্যানন্দ প্রভু কি জয় / শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কি জয়
শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ কি জয়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি॥

অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥

দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ'—বিশ্বাস পালন॥

ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বকার।
ভক্তি-প্রতিকূল ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার॥

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি'॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥

শ্রীগাদিগাছা গ্রাম

আমরা বলেছি যে, শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের কীর্ত্তনের স্থান—এখানে এসে কীর্ত্তন করতে হবে। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে আমরা কীর্ত্তনের মহিমার প্রমাণ দেখতে পাই। ওই ঘটনা গাদিগাছা গ্রামে হয়েছিল, এই গোদ্রুমদ্বীপে।

বৃন্দাবনের চুরাশী ক্রোশের মধ্যে এক বন কাম্যবন নামে আছে। সত্যযুগে এক দিন দুর্ব্বাসা মুনি এই বনের মধ্যে শুয়ে ছিলেন আর এক দেবতার পুত্র (দেবশিশু) খেলার ছলে তাঁর শিখাকে কেটে দিয়েছিলেন। দুর্ব্বাসা মুনি খুব রেগে গিয়ে ওঁকে অভিশাপ দিলেন, "তুই চার জন্ম কুমির হবি !" সেইভাবে ওই দেবশিশুকে কুমিরের ছানা হয়ে জলের মধ্যে থাকতে হল। দুর্ব্বাসা মুনির কথা শুনে দেবশিশু কাঁদতে কাঁদতে শুরু করলেন, "প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন ! আমার অপরাধ হয়ে গিয়েছে, কৃপা করে ক্ষমা দিন !"

দুর্ব্বাসা মুনি তখন বললেন, "অভিশাপটা আমি দিয়ে দিয়েছি তাই ফেরত নিতে এখন পারি না" কিন্তু দেবশিশুর কান্নাকাটি শুনে মুনি তখন বললেন "শুনো দুষ্ট ছেলে ! তোর তিন জন্ম পর চার জন্ম যখন আসবে, নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তখন কলিযুগে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রূপে আসবেন ("কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার / নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার")—তখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাম-কীর্ত্তন করতে করতে তোর পুকুরের ধারে চলে আসবেন আর নাম শ্রবণ করে তুই উদ্ধার হয়ে যাবি।"

তখন সত্য-যুগ গেল, ত্রেত গেল, দ্বাপর গেল—কলিযুগ আসল। এক দিন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু (নিমাই বিশ্বম্ভর) মায়াপুর থেকে কীর্ত্তন করতে করতে এই গোদ্রুমদ্বীপের মধ্যে একটি লেকের

ধারে চলে আসলেন যেখানে দেবশিশু কুমির রূপে থাকত চলে এসেছিলেন। এসে তিনি দেখলেন একজন গো-রাখাল তাঁর সামনে চলে যাচ্ছেন—এসে বললেন, "আমার নাম ভীম ঘোষ, আমার মা শচীমাকে মা বলে ডাকে। মামা, তুমি এদিকে চলে এসো, মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন—মাখন, ছানা তৈরি করে রেখেছেন তোমার জন্য। তুমি এস না।"

"চল, তোমার বাড়ি চল !"— মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে নিয়ে ভিম ঘোষের ঘরে চলে এসেছিলেন। ভীম তাঁকে একটা চেয়ার বসতে দিয়েছেন আর ভীমের মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "দাদা, মা ভালো আছে ত ?"

নিমাই বললেন, "হ্যাঁ, ভালো আছে।"

"তাই ভালো। তোমরা বসো, আমি তোমাদেরকে প্রসাদ দিয়ে দেব।"

সবাই তখন নিচে বসলেন এবং ভীমের মা সবাইকে প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ নেওয়ার পর নিমাই বললেন, "চল, চল আমরা ওই লেকে গিয়ে কীর্ত্তন করব।"

ভয় পেয়ে ভীম বললেন, "মামা, ও দিকে যেও না !"

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন রে ?"

"ওই দিকে জলের মধ্যে কুমির ছানা আছে। ওখানে আমরাও যাই না, গভীগুলো ওই দিকে জল খায় না, শুধু ভয়ে হাম্বা হাম্বা করে— কুমির দেখে ভয় পায়।"

নিমাই সবাই জানেন। তিনি বললেন, "কুমিরের কিসের ভয় ? চল !"

তখন কীর্ত্তন করতে করতে নিমাই লেকের ধারে চলে এসেছিলেন। সেখানে এসে সবাই বসে বসে কীর্ত্তন করছিলেন আর হরিকীর্ত্তন ও মহামন্ত্র শুনে ওই কুমিরের ছানা একবারে চলে এসে মহাপ্রভুর পায়ে ধরে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ মনুষ্য রূপ ধারণ করলেন।

মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথা থেকে চলে আসলে ? কেন জলের মধ্যে থেকেছ ?"

দেবশিশু বুঝিয়ে দিলেন, “প্রভু, আমি আগে কুমির ছিলাম না, আমি দেবশিশু ছিলাম কিন্তু যেহেতু আমি খেলার ছলে দুর্ব্বাসা মুনির জটা কেটে দিয়েছিলাম সেহেতু তিনি আমাকে অভিশাপ দিলেন। আর আপনি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে আমাকে উদ্ধার করেছেন !”

সেটা হচ্ছে হরিনামের ফল। সেই ঘটনা এখানে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে হয়েছিল।

কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু পার।
ধন্য কলিযুগে রে চৈতন্য অবতার ॥

আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে উজানখেয়া বয়।
কড়িপাতি নাহি লাগে অমনি পার হয় ॥

হরিনামের তরীখানি শ্রীগুরুকাণ্ডারী।
সংকীর্ত্তনকেরোয়াল দু'বাহু পসারি ॥

সর্ব্বজীব উদ্ধার হৈল প্রেমের বাতাসে।
লোচন পড়িয়া রৈল করমের দোষে ॥

শ্রীমধ্যদ্বীপ

— স্মরণম্ —

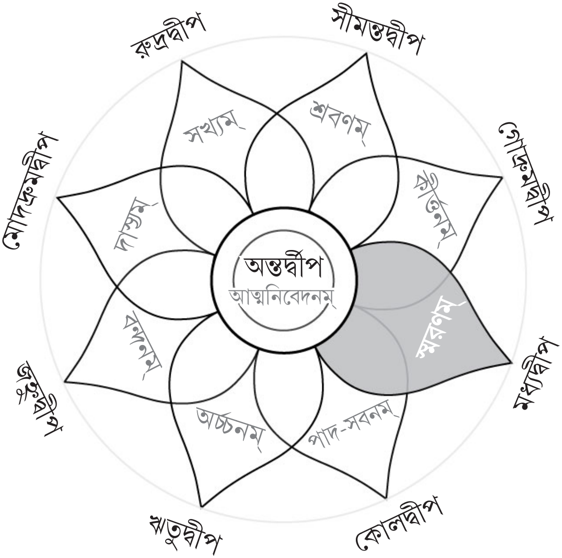
রুদ্রদ্বীপ
সীমন্তদ্বীপ
গোদ্রুমদ্বীপ
মধ্যদ্বীপ
কোলদ্বীপ
ঋতুদ্বীপ
জহ্নুদ্বীপ
মোদদ্রুমদ্বীপ
সখ্যম্
শ্রবণম্
দাস্যম্
কীর্ত্তনম্
অন্তর্দ্বীপ
আত্মনিবেদনম্
বন্দনম্
স্মরণম্
অর্চ্চনম্
পাদ-সবনম্

শ্রীমধ্যদ্বীপ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য শ্রীগ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীমধ্যদ্বীপের মহিমা এই ভাবে বর্ণনা করেন :

শ্রীমধ্যদ্বীপে প্রবেশ করে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে বললেন, "এইটা **মাজিদা গ্রাম** (মাজদিয়া)। এক সময় সত্যযুগে সাতজন ঋষিগণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেম লাভ করবার জন্য ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং এক দিন তাঁদের প্রার্থনায় খুব সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁদের কাছে এসে বললেন, 'তোমাদেরকে নবদ্বীপে যেতে হবে—সেখানে গিয়ে তোমরা গৌর গুণ গাইলে অনায়াসে গৌরপ্রেম লাভ করবে। ভগবানের ধামের কৃপা লাভ করলে সাধুসঙ্গ পাওয়া হয়— সাধুসঙ্গে হরিভজন করলে পরম কল্যাণ বস্তু লাভ হবে। সেই ত পরমানন্দ এবং জীবনের সার। যে নবদ্বীপে রতি-মতি লাভ করে, সে ব্রজে বাস করতে অধিকার পায়। সমস্ত সাধুগণ এই অপ্রাকৃত ধামে বসবাস করতে আশা করেন।' ব্রহ্মার উপদেশ শুনে ঋষিগণ নবদ্বীপধামে এসে নাচতে নাচতে গৌর ভজন, গৌর কীর্ত্তন করতে লাগলেন। শ্রীগৌরহরির দর্শন পাওয়ার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করতে করতে ঋষিগণ নিজেকে তীব্র তপস্যায় নিযুক্ত করতেন—সমস্ত খাওয়া ও ঘুম ছেড়ে দিয়ে তাঁরা সব সময় শুধু গৌরনাম করলেন। এক দিন গৌরহরি দয়া করে ঋষিগণকে নিজের অপূর্ব্ব দর্শন দিয়ে দিলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সুবর্ণরূপ দেখলে ঋষিগণ বিস্মিত হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাঁরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, 'হে প্রভু, আমরা তোমার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হই। কৃপা কর, আমাদেরকে তোমার ভক্তি ধন প্রদান

কর।' তাঁদের প্রার্থনা শুনে দয়াময় গৌরহরি বললেন, 'শুন ঋষিগণ! সমস্ত অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণকথা বলতে থাক। যে আমি তোমাদেরকে বলেছি, সেটা তোমরা এখন কাউকে বলবে না। আমি অল্পদিনের মধ্যে এই নবদ্বীপধামে আসব, তখন আমার লীলা প্রকাশিত হবে—তোমরাও আমার লীলা দর্শন পাবে। এখন তোমরা শ্রীকুমারহট্টে গিয়ে সেখানে ঘাটে বসে হরিভজন কর।' এই কথা বলে গৌরহরি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। ঋষিগণ তখন গৌরহরির আদেশ অনুসারে এখানে শ্রীকুমারহট্টে গিয়ে কৃষ্ণ ভজন করতে লাগলেন। যে এই শ্রীমধ্যদ্বীপে সাতটা মনোহর টিলা দেখা যায়, সে ওই ঋষিগণের বাসস্থান হয়। এখানে বসে তাঁরা গৌরহরিকে পেলেন।"

এই কথা বলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে আর দুই-এক স্থান দেখা দিয়েছিলেন—এখানে সুপবিত্র **গোমতী** নদী ও **নৈমিষকানন** বর্ত্তমান। পূর্ব্ব কল্পে শৌনক অন্যান্য ঋষিগণের সঙ্গে শ্রীসূত গোস্বামীর কাছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গুণ-মহিমা শুনেছিলেন। এক দিন নিজের নন্দী বৃষ বাহন ছেড়ে দিয়ে শিবজী মহারাজ ব্রহ্মার হংসবাহন নিয়ে এখানে এসে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গুণ-গান শুনেছিলেন নিজের পার্ষদগণের সঙ্গে—সমস্ত ভক্তগণ শিবজী মহারাজকে ঘিরে নাচতে নাচতে কীর্ত্তন করতে করতে পুষ্প বৃষ্টি প্রদান করলেন।

এই শ্রীমধ্যদ্বীপে দক্ষিণ দিকে আর একটি মনোহর তীর্থ আছে **শ্রীপুষ্করতীর্থ** নামে। শ্রীব্রাহ্মণপুরায় উপস্থিত হয়ে এখানে একটি গুহ্য লীলা ঘটেছিল।

সত্যযুগে একজন ব্রাহ্মণ দিবদাস নামে বাস করতেন। তিনি গৃহ ত্যাগ করে সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগলেন। এক দিন শ্রীপুষ্করতীর্থে (রাজস্থান) এসে তিনি ওই জায়গার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তবু যখন তিনি পরে ভ্রমণ করতে করতে এই নবদ্বীপধামে এসেছিলেন তখন স্বপ্নে তিনি হঠাৎ করে দিব্যবাণী শুনেছিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি এই নিত্যধামে এসে এখানে থাক।"

ভগবানের আদেশ অনুসারে দিবদাস এই নবদ্বীপধামে ছোট কুটির করেছিলেন এবং এখানে বসবাস করতে লাগলেন। তারপর বৃদ্ধ হয়ে তাঁর মন চঞ্চল হয়েছিল—তিনি সব সময় ওই পুষ্কর তীর্থ স্মরণ করতেন। ভ্রমণ করতে আর না পেরে তিনি অতি দুঃখিত হয়ে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি ভাবলেন, "আমি আর কখনও আমার প্রিয় শ্রীপুষ্করতীর্থ দর্শন পাব না !"

ভগবান পুষ্করনাথ দিবদাসের প্রতি দয়া করে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে দিবদাসের সামনে হাজির হয়েছিলেন। এসে তিনি বললেন, "হে দিবদাস, কাঁদো না। তোমার সামনে এই কুণ্ড আছে—তুমি ওখানে গিয়ে স্নান কর, জলের মধ্যে তুমি শ্রীপুষ্করতীর্থ দর্শন পাবে।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনে দিবদাস শীঘ্র করে পুকুরে গিয়ে স্নান করলেন এবং দিব্যচক্ষু পেয়ে শ্রীপুষ্করতীর্থ দর্শন লাভ করেছিলেন। প্রিয় তীর্থ দেখলে দিবদাস কাঁদতে কাঁদতে পুষ্করনাথকে বললেন, "আমার লাগি তোমার এত কষ্ট হয়েছিল, এত দূর থেকে তোমার আসতে হল !"

পুষ্করনাথ উত্তরে বললেন, "তুমি এত ভাগ্যবান্, দিবদাস ! আমি দূর থেকে আসি নি, আসলে আমি এখানে নিত্যকাল বাস করি। এই নবদ্বীপধাম সর্ব্বতীর্থময়—সমস্ত তীর্থ এখানে উপস্থিত হয়। আমিও এখানে নিত্যকাল বসবাস করি। সেইজন্য যে ব্যক্তি নবদ্বীপ ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করতে চায়, সে ব্যক্তি মূঢ় ও দুর্জন। সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করলে ভাগ্যবান্ জীব এই নবদ্বীপধামে বসবাস করতে সুযোগ পায়। ওই দিকে দেখলে তুমি শ্রীকুরুক্ষেত্র ও ব্রহ্মাবর্ত্ত দেখতে পার। এখানে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী বর্ত্তমান। হে দিবদাস, আমি তোমাকে একটা গুপ্ত কথা বলে দেব—অল্পদিনের মধ্যে এই নবদ্বীপধামে অত্যন্ত আনন্দ হবে কেননা গৌরাঙ্গসুন্দর এখানে অবতীর্ণ হয়ে চারদিকে প্রেমধন বিস্তার করবেন। সমস্ত নবদ্বীপধাম ভ্রমণ করতে করতে প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে ভক্তগণের সঙ্গে নাচবেন। সব জগৎ তখন প্রেমবন্যা জলে ভাসাবে। কুতার্কিকের (তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিতের) ছাড়া সমস্ত জীবগণ মহাপ্রেম লাভ করবে। কোটী কোটী বছর ধরে কৃষ্ণ ভজন করলে

দুর্ভাগা জীব নামের রতি-মতি পায় না, কিন্তু গৌরাঙ্গ ভজন করলে জীবের সমস্ত অনর্থ বিতাড়িত হয়ে যায় এবং অতি শীঘ্র ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত হয়। হে দেবদাস, তুমি এখানে থাক, তুমি নিশ্চয়ই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণের দর্শন পাবে।” এটা বলে পুষ্করনাথ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছু ক্ষণ পর দিবদাস আকাশ থেকে দিব্যবাণী পেয়েছিলেন, “হে ব্রাহ্মণ ! ধন্য কলি ! তুমি কলি যুগে জন্ম গ্রহণ করে শ্রীগৌরকীর্ত্তন প্রেমে সাঁতার কাটবে।”

ওসব পুরাণ কথা বলতে বলতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে আর কুরুক্ষত্রের **উচ্চহট্ট** দেখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, “সমস্ত দেবগণ এখানে এসেছিলেন—যে তীর্থ ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুক্ষত্রে আছে, সে সমস্ত তীর্থ এখানে এসে শ্রীনবদ্বীপধামের সেবা করেন। এখানে এক রাত্র কাটালে একশো বছর ধরে কুরুক্ষত্রে বসবার করার ফল লাভ হয়। দেবগণ এখানে বসবাস করে একটি **হট্টডাঙ্গা** নামে হট্ট স্থাপন করেছিলেন যেখানে তাঁরা গৌরকথা আলোচন করতেন।”

এরপর, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ও ভক্তগণের সঙ্গে গঙ্গা পার করে শ্রীকোলদ্বীপে এসেছিলেন…

জয় শ্রীমধ্যদ্বীপ কি জয়।
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কি জয়।
জয় শ্রীল গুরু মহারাজ কি জয়।

শ্রীকোলদ্বীপ

— পাদ-সেবনম্ —

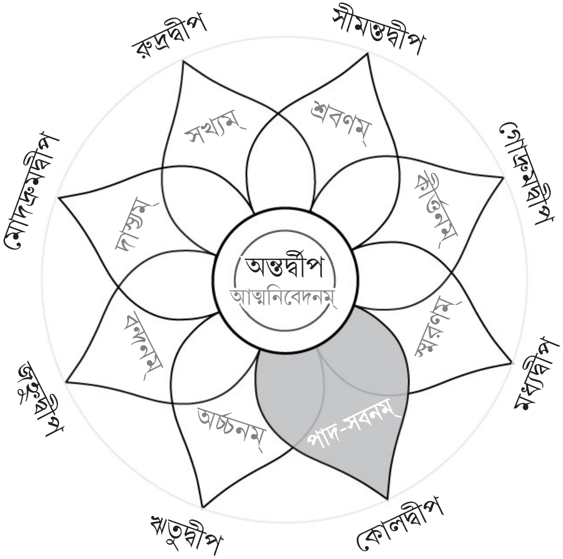

রুদ্রদ্বীপ
সীমন্তদ্বীপ
গোদ্রুমদ্বীপ
মধ্যদ্বীপ
কোলদ্বীপ
ঋতুদ্বীপ
জহ্নুদ্বীপ
মোদদ্রুমদ্বীপ
সখ্যম্
শ্রবণম্
কীর্ত্তনম্
স্মরণম্
পাদ-সেবনম্
অর্চ্চনম্
বন্দনম্
দাস্যম্
অন্তর্দ্বীপ
আত্মনিবেদনম্

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, কোলদ্বীপ

শ্রীকোলদ্বীপ

শ্রীবরাহদেবের দর্শন ও গুপ্ত-গোবর্দ্ধন

এই দ্বীপ কুলিয়া পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ হয় কারণ এই দ্বীপ উচ্চ জায়গায় পর্ব্বতের মত গঙ্গা তীরে উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে এই কুলিয়া নগর কোলদ্বীপ নামে বর্ণিত হয়।

সত্যযুগে এখানে একজন ছেলে ছিল, তাঁর নাম বাসুদেব। তিনি প্রতি দিন বরাহদেবের পূজা করতেন। বরাহদেবের পূজা করতে করতে তিনি সব সময় প্রার্থনা করতেন, “হে প্রভু, কৃপা করি তোমার দর্শন আমাকে দাও—আমার জীবন সফল কর! তোমাকে না দেখলে আমার জীবন বৃথা কেটে যাবে!”

এক দিন স্বয়ং ভগবান্ বরাহদেব অপূর্ব মনোহর কোল (বা শূকর) রূপ ধারণ করে দয়া করে বাসুদেবের সামনে হাজির হয়েছিলেন। নানারত্ন বিভূষিত বরাহদেব পাহাড়ের মত লম্বা ছিলেন। বাসুদেব ভগবান দর্শন পেয়ে প্রেমাবেশে মাটিতে দণ্ডবৎ করে পড়লেন। তাঁর ভক্তি দেখে ভগবান্ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “বাসুদেব, তুমি আমার ভক্ত, আমি তোমার পূজার দ্বারা খুবই সন্তুষ্ট। নবদ্বীপধাম-সম ধাম এই ত্রিভুবনে নেই। তুমি এত ভাগ্যবান্, তুমি এখানে বসবাস করছ। যেহেতু তুমি আমার পূজা এই নবদ্বীপে করছ, সেহেতু যখন আমি কলিযুগে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়ে আসব তখন তুমিও জন্ম গ্রহণ করে আমার সঙ্কীর্ত্তন দর্শন পাবে।” এটা বলে বরাহদেব অদৃশ্য হয়ে পড়লেন।

এরপর বাসুদেব আনন্দিত হয়ে সঙ্কীর্ত্তন করতে শুরু করলেন। তিনি সব সময় গৌরনাম করতেন। বরাহদেবের দর্শন পেয়ে বাসুদেব এই স্থানে কোলদ্বীপ পর্ব্বত নাম দিয়েছিলেন। যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে এখানে নিয়েছিলেন, তখন তিনি বললেন

যে, এই কোলদ্বীপ গিরি-গোবর্দ্ধন থেকে অভিন্ন। সেইজন্য এই স্থানের নাম হচ্ছে গুপ্তগোবর্দ্ধন। অতএব শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করলে গোবর্দ্ধন পরিক্রমার ফল পাওয়া যায়।

এই শ্রীকোলদ্বীপের মধ্যে আরো অনেক উচ্চতম স্থানগুলা আছে—এখানে বহুলাবন, খদিরবন, দ্বারকা, মহাপ্রয়াগ, গঙ্গসাগর, কুলিয়া গ্রাম, সমুদ্রগড়, চম্পাহাড়ি, বিদ্যা-বাচস্পতির টোল নিত্য বিরাজ করেন।

কুলিয়া গ্রাম : অপরাধ-ভঞ্জনের পাট

কোলদ্বীপের আধুনিক নাম হচ্ছে 'নবদ্বীপ টাউন'। আগে ওর নাম ছিল কুলিয়া গ্রাম (গঞ্জ)। এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ লীলা ঘটিয়াছিল।

যখন মহাপ্রভু নিমাই বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, তখন তিনি নবদ্বীপ থেকে পুরীধামে যাত্রা করলেন। কিছু দিন পর তিনি বৃন্দাবনে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন আর বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় তিনি আবার গৌড়দেশে এসেছিলেন।

মহাপ্রভু আবার নবদ্বীপে এসেছিলেন খবর পেয়ে হাজার হাজার লোক তাঁর দর্শন পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে আসতে শুরু করলেন। ভিড়ের শেষ নেই। যেমন যারা মহাপ্রভুর কাছে অপরাধ করেছিলেন—সমস্ত পাপীগণ, পাষণ্ডিগণ, ইত্যাদি—তারাও মহাপ্রভুর কাছে এসে তাঁর শ্রীচরণে পড়ে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মহাপ্রভু সমস্ত লোকের অপরাধ ক্ষমা করে কৃষ্ণপ্রেম অবাধ বিস্তার করেছিলেন বলে এই কুলিয়া গ্রাম অপরাধ-ভঞ্জনের পাটের নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। চপালগোপালও এখানে উদ্ধার পেয়েছিলেন। তাঁর কথা আমরা আগে শ্রীমায়াপুরে বলেছিলাম।

এই কুলিয়া গ্রামে একটা বিখ্যাত ভাগবত-টোলবাড়ী ছিল। সেখানে দেবানন্দ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন—তাঁর দৈনন্দিন পঠ শ্রবণ করবার জন্য অনেক লোক উপস্থিত হত। এক দিন এই দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর কাছে কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "তুমি বৈষ্ণব অপরাধ করেছ, তাই তুমি কৃষ্ণপ্রেম পেতে পার না।" মহাপ্রভুর কথা শুনে দেবানন্দ পণ্ডিত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কখন ও কার কাছে আমি অপরাধ করেছি? আমার মনে হয় না!" তখন মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা স্মরণ করালেন।

এক দিন শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দ পণ্ডিতের পাঠে এসেছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতম্ শোনাবার জন্য। পাঠ শুনতে শুনতে শ্রীবাস পণ্ডিত হঠাৎ করে কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত হয়েছিলেন। “অহো ! ভাগবতম্ অক্ষরে অক্ষরে প্রেমময় !”—সেটা ভাবতে ভাবতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। দেবানন্দ পণ্ডিতের শিষ্যের মধ্যে কয়েকজন শিষ্য বিশেষ বিরক্ত হয়ে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন, “বন্ধ কর ! তুমি পাঠ নষ্ট করছ !” আর কেউ বললেন, “যাও এখান থেকে !” অবশেষে তাঁরা শ্রীবাস পণ্ডিতকে হাত ধরে নিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত এটা দেখলেন কিন্তু কিছু বলেন নি—সেটা ছিল তাঁর অপরাধ।

(আমাদের সব সময় সাবধান থাকতে হবে—কখন আমরা অপরাধ করছি সেটা আমরা বুঝতে পারি না।)

অধিকন্তু—এক দিন মহাপ্রভুর দেবানন্দ পণ্ডিতের কথা মনে পড়ল এবং তিনি এত বেশী বিরক্ত হয়েছিলেন যে তিনি বললেন, “আমি ওর ভাগবতম্ ছিঁড়িয়া ফেলব ! যা তিনি ব্যাখ্যা করছে, সেটা সব মায়া ! সব ভুলসিদ্ধান্ত !” শ্রীবাস পণ্ডিত ও ভক্তগণ মহাপ্রভুকে থামিয়ে দিলেন। সেইজন্য, ভাগবতম্ পড়তে এত সহজ নয়। এক সময় শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু একজনকে বললেন, “ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে, একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে !” ভাগবতম্ পড়তে চাইলে বৈষ্ণবের শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে হবে এবং তাঁদের শ্রীমুখে শ্রবণ করতে হবে—তা না হলে স্বাধীন ভাবে ভাগবতম্ পড়া খবরের কাগজ পড়ার মত হতে পারে।

অবশেষে মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে বললেন, “যদি তুমি শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলে তুমি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবে।” দেবানন্দ অত্যন্ত লাজ্জুক হয়ে পড়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এই সব ঘটনা এই কুলিয়ায় হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ

শ্রীকোলদ্বীপে এসে আমাদের আর একটা প্রগাঢ় কথা বলা উচিত। এই গুপ্তগোবর্দ্ধনের মধ্যে আমাদের শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ বিরাজ করে।

আমাদের পরমগুরুদেব পূজ্যপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক

শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ এখানে ১৯৪১ সালে এসেছিলেন। প্রথম তিনি একটি ছোট কুটিরে গঙ্গা তীরে বাস করতেন—তাঁর ছোট ভাই মনিবাবু মাসে দশটাকা তাঁকে দিতেন এবং শ্রীল শ্রীধর মহারাজ ওই টাকার নিয়ে একাই এখানে জীবনযাপন করতেন। তিনি ভিক্ষা করতে যেতেন না এবং বিশেষ ভাবে প্রচারও করতেন না। কিছু দিন পর শ্রীপদ সখীচরণ প্রভু তাঁকে প্রস্তাব করলেন, "যদি আপনি একটি জমি নির্বাচন করবেন, আমি ওই জমিটাকে কেনবার জন্য টাকা দেব।" অপরাধ-ভঞ্জনের পাট এবং গুপ্ত গোবর্দ্ধনের মহিমা স্মরণ করে শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ তখন এই শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের জমি কোলেরগঞ্জে নির্বাচন করেছিলেন আর ১৯৪১ সালে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা দিনে সেখানে প্রবেশ করে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি মঠের নাম রেখে দিয়েছিলেন 'শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ'।

যদিও আমরা ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়, আসালে রাগানুগ-ভক্তির সিদ্ধান্ত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদে এই সিদ্ধান্ত বীজরূপে উপস্থিত হয় এবং আমরা দেখতে পাই যে, এই বীজটা সম্পূর্ণভাবে বৃক্ষরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে স্ফুরিত হয়। সুতরাং আমাদের সম্প্রদায়ের এই মূলস্বরূপ মনে রেখে শ্রীল শ্রীধর মহারাজ তাঁর মঠের নামে রাখলেন 'শ্রীচৈতন্য' শব্দ। আর শ্রীল শ্রীধর মহারাজের গুরুদেবের নাম হচ্ছে ওঁ বিষ্ণুপাদ ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ—সেইজন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বরূপ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তর্গত করবার জন্য শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ তাঁর মঠ ও মিশনের নাম রেখেছিলেন 'শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠ'।

প্রথম শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের জমি ১ একর (প্রায় ৩ বিঘা) ছিল—ওই সময় এখানে অনেক গাছ, বাগান, দারুণ অট্টালিকা কিছু ছিল না। এখানে শুধু তিন আমগাছ, দুটো পেয়ারা গাছ এবং কিছু বাঁশ বাগান ছিল। কিন্তু শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ এই জমি কিনে নিয়ে প্রথম দিনে সর্ব্বাগ্রে একটি লম্বা ও দামি বাঁশের খুঁটি নিজ হাতে বাঁশ বাগানে গিয়ে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন—যেখানে এখন

মূল মন্দির বিরাজ করে, সেখানে তিনি একটা পতাকা উত্তোলন করে খুঁটিটা মটিতে পুঁতে দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন :

শ্রীমচ্চৈতন্য-সারস্বত-মঠবর-উদ্গীতকীর্ত্তির্জয়শ্রীং
বিভ্রৎ-সংভাতি গঙ্গাতটনিকটনবদ্বীপ-কোলাদ্রিরাজে।
যত্র শ্রীগৌর-সারস্বত-মতনিরতা গৌরগাথা গৃণন্তি
নিত্যং রূপানুগশ্রী-কৃতমতি-গুরুগৌরাঙ্গ-রাধাজিতাশা ॥

“যে পরম রমণীয় দিব্য-আশ্রমে শ্রীগৌর-সরস্বতীর মতানুরক্ত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন-তৎপর নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ নিত্যকাল সপার্ষদ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরগণের প্রেমসেবন তৎপরতায় আশাবন্ধ-হৃদয়ে অফুরন্ত মাধুর্য্যোজ্জ্বল প্রেম-সম্পদের ভাণ্ডারী শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের পরমানুগত্যে নিরন্তর মহাবদান্য অবতারী ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নামগুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, দিব্যচিন্তামণিধাম শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধামে পতিতপাবনী ভগবতী ভাগীরথীর মনোরম তটনিকটবর্ত্তী গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন কোলদ্বীপে দেদীপ্যমান এই মঠরাজবর্য্য শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, তাঁহার ক্রমবিবর্দ্ধমান্ উদ্গীত কীর্ত্তির উড্ডীয়মান বিজয়-বৈজয়ন্তীর সুশীতল স্নিগ্ধছায়ায় নিখিলচরাচর বিস্মাপিত করিরা জয়শ্রী ধারণ পূর্ব্বক নিত্য বিরাজমান্ রহিয়াছেন।”

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন ভক্তগণ শ্রীল শ্রীধর মহারাজের সঙ্গে থাকতে শুরু করলেন। অনেক গুরুভ্রাতাও শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে খুঁজে পেয়ে তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সেইরকম ছিল শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের আরম্ভ।

যখন শ্রীল শ্রীধর মহারাজ প্রথম এখানে এসেছিলেন, তখন তিনি গিরিধারী ঠাকুরকে এখানে বৃন্দাবন থেকে নিয়েছিলেন। ১৯৪৪-১৯৪৫ সালে মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন আর যখন আমাদের গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ মঠে যোগদান করেছিলেন, তখন প্রায় চার বছর পর শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরজিউ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পরে কাছাকাছি ১৯৫৫ সালে মূলমন্দির নির্মাণ আরম্ভ হল—নির্মাণটা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রায় ২০ বছর লাগল (১৯৭৩ সালের পর্যন্ত)। ১৯৭৫ নাটমন্দিরের নির্মাণ আরম্ভ হল। সেটা হচ্ছে মঠের সংক্ষেপ ইতিহাস।

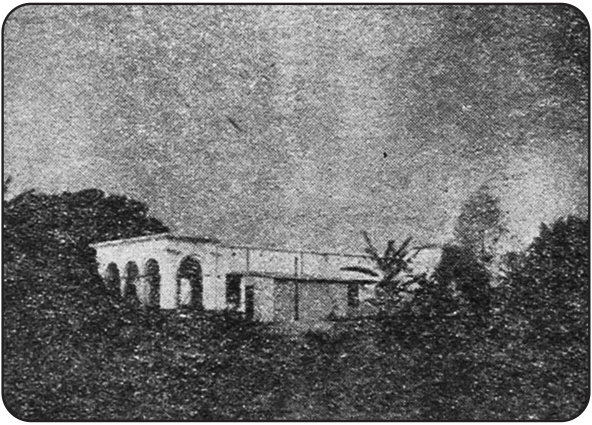

(শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, প্রায় ১৯৫৫ সালে)

এক দিন শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের গুণমহিমা-শ্লোক শুনে (‘শ্রীমচ্চৈতন্য-সারস্বত-মঠবর...’) শ্রীসখীচরণ প্রভু শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে বললেন, “আপনার একটি খড়ের ঘর ছাড়া কিছু নেই—আপনার বালিশ একটা ইট, আপনার বিছানা খড়—কিন্তু আপনি এত লম্বা বাঁশের খুঁটি পুঁতে দিয়ে এত বড় শ্লোক রচনা করেছেন !” শ্রীল শ্রীধর মহারাজ উত্তরে বললেন, “আপনি ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন এখানে কী হবে।” শ্রীমঠের নগরের মত অপূর্ব্ব রূপ আজকে দেখে সেটার আমরা এখন সহজভাবে অনুমান করতে পারি। সেটা শুধু দারুন অট্টালিকা নয় ! যখন মন্দিরের প্রথম তলা সম্পূর্ণ হয়েছিল, তখন শালগ্রাম-শিলা-রূপে কোলদ্বীপ-অধিপতি (লক্ষ্মী-বরাহদেব) নিজের ইচ্ছামত আশ্চর্যভাবে এখানে এসেছিলেন।

ওই শালগ্রাম-শিলা এক রাজার বাড়িতে বাস করতেন কিন্তু কিছু দিন পর ওখানে অনেক সমস্যা-ঝামেলা শুরু হল বলে রাজা শালগ্রাম-শিলাটি একজন বড় পণ্ডিতকে দিয়েছিলেন। কিছু দিন পর ওই পণ্ডিতের বাড়িতে অনেক ঝামেলা শুরু হয়েছিল। এক দিন ওই পণ্ডিতের সাথে শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের সাক্ষাৎ হল এবং তিনি শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে বললেন, “এই শালগ্রাম-শিলা সর্ব্বত্রই অশান্তি সৃষ্টি করছে,

আপনি কৃপা কর ওঁকে নিয়ে যান।” শ্রীল শ্রীধর মহারাজ রাজি হলেন এবং পণ্ডিতকে এ শিলা শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

প্রথম ওই পণ্ডিত শালগ্রাম-শিলা শ্রীল যাযাবর মহারাজের মঠে (মেদিনীপুরে) পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু দুসপ্তাহের মধ্যে শিলাটি আবার অনেক অশান্তি করেছিলেন—কেউ তাঁর মঠে থাকতে পারছিলেন না! তখন শ্রীল যাযাবর মহারাজ শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে চিঠি লিখে বললেন, “কৃপা করে আপনার শিলা নিয়ে যান!” মেদিনীপুর নবদ্বীপ থেকে কিছু দূর বলে শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীল যাযাবর মহারাজকে বললেন শিলাকে শ্রীল গোস্বামী মহারাজের মঠে (কলকাতায়) পাঠিয়ে দিতে—উনি সেখান থেকে পরে শিলাকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেবেন।

শ্রীল যাযাবর মহারাজ শিলাকে শ্রীল গোস্বামী মহারাজের মঠে পাঠিয়ে দিলেন আর শ্রীল গোস্বামী মহারাজ ভাবলেন, “আমি একটি শালগ্রাম-শিলা পেয়েছি! আমি শিলাকে মঠেই রাখব।” তিনি জানলেন যে, শ্রীল শ্রীধর মহারাজ আপত্তি করবেন না, তাই তিনি শিলাকে তাঁর মঠে রাখলেন। কিন্তু আবার ১৫ দিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছিল এবং শ্রীল গোস্বামী মহারাজ তখন ভাবলেন, “এই শিলা আমার মঠে অমঙ্গল করছে!” তখন তিনি শ্রীল শ্রীধর মহারাজের কাছে চিঠি লিখলেন, বললেন, “মহারাজ, আপনার শিলা আমার মঠে থেকে, যত দ্রুত সম্ভব নিয়ে যান।” শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীল গোবিন্দ মহারাজকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন ওই শালগ্রাম-শিলাকে নিয়ে আসার জন্য।

শেষ পর্যন্ত শালগ্রাম-শিলাকে পেয়ে শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীল গোবিন্দ মহারাজকে বললেন, “কী ব্যাপার? এই শিলা সর্ব্বত্র এত অশান্তি স্থষ্টি করছেন কেন? তুমি খুঁজে বার কর শালগ্রাম-শিলার নাম কী।” তখন হরিভক্তিবিলাস ও গরুড়-পুরণে শ্রীল গোবিন্দ মহারাজ অনেক শালগ্রামশিলার লক্ষণের বর্ণনায় দেখলেন, ওই শালগ্রাম-শিলার লক্ষণ হচ্ছে লক্ষ্মীবরাহদেবের লক্ষণ। শ্রীল শ্রীধর মহারাজও বললেন, “আমিও ভাবি যে, এটা লক্ষ্মীবরাহদেব—তিনি তাঁর নিজের কোলদ্বীপে আসতে চান। তিনি হচ্ছেন কোলদ্বীপ-অধিপতি। কিন্তু নিশ্চিত করবার জন্য তুমি ওই পণ্ডিতের কাছে চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা কর।” তখন ওই

পণ্ডিত বললেন যে, হ্যাঁ এটা আসলে লক্ষ্মীবরাহদেব। তখন শ্রীল শ্রীধর মহারাজ বললেন, "তাই ত ! সেই জন্য তিনি কোথাও থাকতে চান না। এখানে তাঁর নিজের স্থান, তারজন্য তিনি এখানে আসতে চেয়েছিলেন।"

লক্ষ্মীবরাহদেবের আরাধনা খুবই কঠিন। শ্রীল শ্রীধর মহারাজ বললেন যে, লক্ষ্মীবরাহদেবকে বিশেষ ভাবে প্রতি দিন ভালো পরমান্ন ভোগ লাগানো হতে হবে। ওই সময় থেকে শ্রীলক্ষ্মীবরাহদেব সুষ্ঠুভাবে মঠে বসবাস করেন এবং মঠে সমস্ত কিছু শীঘ্র ভাবে উন্নত হয়। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে ও সুন্দর ভাবে পরে শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডও প্রকাশিত হয়েছিল।

(শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, প্রায় ২০১৩ সালে)

সেটা হচ্ছে শ্রীকোলদ্বীপধাম এবং সেটা হচ্ছে আমাদের মূলমঠের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস। সেটা হচ্ছে খুবই মঙ্গলময় স্থান। "কুলিয়া গ্রামেতে আসি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। হেন নাহি যা'রে প্রভু না করিলা ধন্য॥" এখানে অপরাধ করলে কোন রেহাই নাই কিন্তু বাহির থেকে অপরাধ করে আসলে ক্ষমা চাইলে এখানে অপরাধ খণ্ডন হয়ে যায়।

শ্রীবুড়োরাজ (বৃদ্ধ) শিব

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা শ্রীকোলদ্বীপ অপরাধ-ভঞ্জনের পাটে বুড়ো-শিব তলায় এসেছি।

আপনি বৃন্দাবনে দেখেছিলেন গোপেশ্বর মহাদেব, চাকলেশ্বর মহাদেব গোবর্দ্ধনে, ভূতেশ্বর মহাদেব মথুরায়, আশেশ্বর মহাদেব নন্দগ্রামে—মায়াপুরে আছে ক্ষেত্রপাল আর এই কোলদ্বীপে আছে সদাশিব গঙ্গাধর (আমাদের নবদ্বীপ মঠে) এবং এই বুড়োরাজ বা বৃদ্ধ শিবজী। শিবের কাছে সব সময় প্রণাম করতে হয়। তিনি হচ্ছেন ধামেশ্বর—তিনি ধামের রক্ষক, তিনি সমস্ত নবদ্বীপধামকে রক্ষা করেন। সেইজন্য আমরা শিবজী মহারাজের কাছে এসে সব সময় প্রার্থনা করে থাকি যেন আমরা ধামে থাকতে ও সেবা করতে পারি, যেন আমরা ধামে আবার আসতে পারি।

একবার গোকুলে এসে আসেশ্বর মহাদেব মা যশোদার কাছে গোপালের দর্শন করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। মা যশোদা তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, “না, না, আমার গোপাল তোমাকে দেখলে ভয় পাবে! তোমার বিরাট বিরাট জটা, বিরাট বিরাট দাড়ি, গলায় সাপ নিয়ে এসেছ! এসব কী? আমি গোপালকে দেখাব না।” তখন মহাদেব সেখান থেকে কিছু দূরে গিয়ে বসে ধ্যান করতে লাগলেন, “কবে আমি ভগবান্ দর্শন পাব?” এদিকে গোপাল (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) সব বুঝতে পেরেছেন—তিনি খুব কান্নাকাটি শুরু করলেন—তাঁর ভক্ত, তাঁর পরম বন্ধু তাঁকে না দেখে চলে গিয়েছেন, তাঁর এত কষ্ট হয়েছে। তখন গোপাল মাকে বললেন, “মহাদেবকে নিয়ে এসো তাহলে আমি কাঁন্না থামাব!” আর কোন দিকে মহাদেব বসে ছিলেন, সেদিকে তিনি মাকে দেখালেন। তখন মা যশোদা ও নন্দ মহারাজ গোপালকে নিয়ে সেখানে গিয়ে রাসেশ্বর মহাদেবের কাছে এসেছিলেন। গোপালের কান্নাকাটি থেমে গেল—ভগবান তাঁর ভক্তের দেখা দিলে তাঁর শান্ত হয়ে যায়।

এক দিন পার্ব্বতীদেবী শিবজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, কার আরাধনা শ্রেষ্ঠ?” শিবজী মহারাজ তাঁকে বললেন, “সব আরাধনার শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বিষ্ণু আরাধনা।” শিবজী মহারাজের উত্তর শুনে পার্ব্বতীদেবীর মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, “কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর পূজা শ্রেষ্ঠ কিন্তু আমি শিবের পূজা করি। তাবে কী হয়?” পার্ব্বতীর ব্যাকুলিত মুখ দেখে শিবজী মহারাজ তখন বললেন,

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

“মন খারাপ হবে কেন? বিষ্ণু আরাধনাই শ্রেষ্ঠ কিন্তু তার চাইতে আর শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বিষ্ণুভক্তের আরাধনা।” সেইজন্য আমাদের বুঝতে হবে যে, শিবজী মহারাজকে সেবা করতে হলে শিবজী মহারাজের কথা শুনে চলতে হবে। ভক্তের আরাধনাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

আপনারা শুনেছিলেন যে, শিবজী মহারাজ রাসলীলায় গোপী

হয়ে প্রবেশ করেছিলেন—এমনকি লক্ষ্মীদেবী এখন পর্যন্ত রাসলীলায় ঢুকতে পারেন নি কিন্তু শিবজী মহারাজ সেখানে ঢুকেছিলেন। সেটা তাঁর গুণ মহিমা। শিবজী মহারাজ মহাবৈষ্ণব। শিবের পূজা করলে অসুবিধা কিছু নেই কিন্তু একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে—শিবজী মহারাজের পূজা করতে গিয়ে শিবজী মহারাজকে নকল করবেন না।

এই জগতে এমন ভক্তেরা আছে যারা শিবজী মহারাজের পূজা করার পরিবর্তে, শিবজী মহারাজকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে নিজেরা শিব(?) হয়ে যায়। আমি গায়ে যদি পুলিশের ড্রেস পরিয়ে দিই, মাথায় টুপি লাগিয়ে আর একটা বন্দুক ঝুলিয়ে দেই, তাহলে আমি কি পুলিশ হয়ে যাব? আমি নকল পুলিশ হব। সেইজন্য শিবের ড্রেস পরিয়ে, শিবের জটা মাথায় পরচুলা পরে চুলে রঙ করে দিয়ে—এরকম শিবজী মহারাজ সাজলে এটা কি শিব হবে? অনেক শিবের ভক্ত গাঁজা খায়, কিন্তু শিবজী মহারাজ সাপের বিষও খেয়েছেন—এমন ভক্তগণকে তখন বিষও খেতে হবে। শিব গাঁজা খেতে পারেন কিন্তু আপনি যদি গাঁজা খেতে শুরু করেন, সেটা খুব খারাপ হচ্ছে। এই ভাবে শিবের পূজা হয় না। শিবকে ভক্তি করতে হবে,—"হে শিবজী মহারাজ, তুমি ত কৃষ্ণের পরম বন্ধু! তোমার তো অনেক ক্ষমতা আছে । হে শিবজী মহারাজ, তুমি আমাকে কৃষ্ণভক্তি দাও। আমি তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যেন আমার তোমার চরণে ভক্তি থাকে।" এবং সেটা শুধু দুই-একদিন প্রার্থনা বা প্রণাম নয়—প্রতি দিন আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরকে প্রণাম করতে হবে, প্রতি দিন আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরকে নিবেদন করতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের নিত্যভক্তি।

সাধারণভাবে লোক শিবকে পূজা করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কিন্তু সেটা সত্যিকারের পূজা নয়। সেটা আপনারা করবেন না। নিজের স্বার্থের জন্য, কিছু পাওয়ার জন্য—এরকম আশায় শিবজী পূজা করিবার পরিবর্তে শিবকে আপনারা চাকর বানিয়ে ফেলবেন

না। লোকে বলে , "শিব, আমাকে এই দাও," "শিব, আমাকে সেই দাও"—শিবজী মহারাজ ওদের চাকর হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে শিবের **পূজা** করা। আমি পূজা করব—শিব পূজা নেবেন না নেবেন, কী দেবেন না দেবেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। সেটা আমাকে ভাল লাগবে না খারাপ লাগবে—উনি যদি আমাকে খারাপ রেখে শান্তি পান, সেভাবে রাখবেন আর যদি আমাকে ভালো রেখে শান্তি পান, উনি সেভাবে আমাকে রাখবেন। আমার সুখ-দুঃখের কোন রকম ব্যাপার নেই। সেটা সব সময় মনে রাখবেন।

শিবজী মহারাজের নাম আশুতোষ—তিনি অল্পেতে সন্তুষ্ট হয়ে যান। সেইজন্য আমাদের এখানে এসে শিবজী মহারাজের শ্রীচরণে হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করতে হবে, "হে প্রভু ! তুমি পরম বৈষ্ণব, ভগবান্ তোমার কথা শুনেন—তুমি আমাকে ভগবানের সেবা করার অধিকার দাও। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ বিশ্রাম করেন, তুমি কৃষ্ণ দিতে পার !"

জয় শ্রীবুড়োরাজ শিবজী মহারাজ কি জয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কি জয়। জয় শ্রীল গুরু মহারাজ।

(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া শোধহে আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

ছয় বেগ : (১) বাক্যবেগ (২) মনবেগ (৩) ক্রোধবেগ (৪) জিহ্বাবেগ (৫) উদরবেগ (৬) উপস্থবেগ।

ছয় দোষ : (১) অত্যাহার (২) প্রয়াস (৩) প্রজল্প (৪) নিয়মাগ্রহ (৫) জনসঙ্গ (৬) লৌল্য।

ছয় সৎসঙ্গ : (১) ভক্তকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করা (২) ভক্তের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করা (৩) নিজ গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা (৪) ভক্তের গুপ্তবিষয় জিজ্ঞাসা করা (৫) প্রসাদ গ্রহণ করা (৬) ভক্তকে প্রসাদ ভোজন করান।

ছয় গুণ : (১) উৎসাহ (২) নিশ্চয় (৩) ধৈর্য্য (৪) কৃষ্ণের জন্য নিজের ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করা (৫) অভক্তের সঙ্গত্যাগ (৬) সাধুগণের সদাচার অনুসরণ করা।

শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া

শ্রীবৃদ্ধশিবজী মহারাজের মন্দিরে প্রণাম করে আমরা ওখান থেকে পোড়ামাতলায় আসি—শ্রীপ্রৌঢ়মায়া বা যোগমায়ার মন্দিরে।

মায়া হচ্ছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং তাঁর দুই প্রকাশ আছে—যোগমায়া এং মহামায়া। যোগমায়া নিত্যধামে ভগবানের সেবা করেন এবং মহামায়া এই জড়জগতে ভগবানের সেবা করেন।

এই নবদ্বীপধামের যোগমায়ার মন্দিরে এসে প্রণাম করে আমাদের সীমন্তদ্বীপের কথা মনে রাখতে হবে :

এক দিন সত্যযুগে শিবজী মহারাজ গৌরাঙ্গের নাম করতে করতে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা দেখে পার্ব্বতী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি সব সময় 'হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ!' বলে ডাকছ কেন? সে গৌরাঙ্গ কে? তোমার নৃত্য দেখে এবং গৌরাঙ্গের নাম শুনে আমার মন গলে যায়। আমি মনে করি যে, যে সব মন্ত্রতন্ত্র আমি আগে শুনেছি, সে সব জীবের জঞ্জাল! তুমি এই গৌরাঙ্গের সম্বন্ধে আমাকে বলে দাও, আমি টের পাই যে, ওঁকে সেবা করলে আমি প্রাণ পাব।

পার্ব্বতীর কথা শুনে মহাদেব বললেন, "তুমি আদি শক্তি, শ্রীরাধার অংশ, তাই আমি তোমাকে সব খুলে বলে দেব। কলিযুগে রাধার কান্তি ও ভাব নিয়ে কৃষ্ণ মায়াপুর গ্রামে অবতীর্ণ হবেন। তিনি কীর্ত্তনরঙ্গে মত্ত হয়ে সবাইকে প্রেমরত্ন বিচার বিনা বিস্তার করবেন। প্রভুর প্রতিজ্ঞা মনে করে আমি প্রেমের দ্বারা বিভোর হয়ে পড়ি। মন ধরতে না পেরে আমি কাশী ছেড়ে দিয়ে মায়াপুর ধামে এসে গঙ্গার তীরে একটি ছোট কুটিরে গৌরাঙ্গের ভজন করতে স্থির করলাম।

শিবজী মহারাজের কথা শুনে পার্ব্বতী দেবী সীমন্তদ্বীপে এসেছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ ধ্যান করতে লাগলেন। গৌরাঙ্গের নাম করতে

করতে তাঁর হৃদয়ে প্রেম উৎপন্ন হল। তিনি মন আর স্থির রাখতে পারলেন না। অবশেষে গৌর তাঁর সাপর্ষদের সঙ্গে পার্ব্বতীর কাছে এসে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “পার্ব্বতী তুমি কী চাও? তুমি এখানে এসেছ কেন?” অধীর হয়ে প্রভুর শ্রীচরণে প্রণাম করে পার্ব্বতী দেবী উত্তরে বললেন, “প্রভু, তুমি জগতের জীবন, তুমি আমার প্রাণনাথ। তুমি সব জগতের প্রতি করুণা, স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদান কর কিন্তু আমার প্রতি তুমি এত নিষ্ঠুর! তুমি আমাকে এত নিষ্ঠুর সেবা দিয়েছ—আমি তোমার বহির্ম্মুখ জীবকে বন্ধন করি। আমি তাই করি কিন্তু আমি তোমার কৃপা থেকে বঞ্চিত! লোকে বলে যে, যথা কৃষ্ণ তথা মায়ার কোন স্থান নেই—আমি তোমার কাছ থেকে একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। কবে ও কী করে আমি তোমার লীলা দেখতে পাব? তুমি কোন উপায় না দিলে আমি নিরাশা হয়ে পড়ব।”—এই কথা বলে পার্ব্বতী দেবী তখন গৌরাঙ্গের পদধূলি নিজের সীমন্তে মাখিয়ে দিলেন। ওখান থেকে এই জায়গা শ্রীসীমন্ত্রদ্বীপের নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল , তবু জ্ঞানহীন লোক এখনও এই স্থানকে সিমুলিয়া-গ্রাম বলে থাকে।

পার্ব্বতীর কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন, “হে পার্ব্বতী, তুমি আমার ভিন্ন শক্তি নও। তুমি সর্ব্বেশ্বরী, তুমি আমার সহচরী। তোমার দুই রূপ আছে—স্বরূপ-শক্তিতে তুমি আমার রাধিকা, রাধা তোমাতে বহিরঙ্গা-রূপে বিস্তার করে। তোমার বিনা আমার লীলা অসম্ভব—যোগমায়ারূপে তুমি আমার লীলাতে সব সময় উপস্থিত হও। ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসীরূপে নিত্য লীলা কর, নবদ্বীপে তুমি প্রৌঢ়ামায়ারূপে ক্ষেত্রপাল শিবজী মহারাজের সঙ্গে থাক।”—এটা বলে মহাপ্রভু অদৃষ্ট হয়ে পড়লেন। এই কথা সব সময় হৃদয়ে রাখে গৌরের ভোগের জন্য পার্ব্বতী দেবী সিমন্তিনী-দেবী-রূপে সীমন্তদ্বীপে এবং প্রৌঢ়ামায়া-রূপে নবদ্বীপে থাকেন।

আমরা অধম বদ্ধজীব এই প্রৌঢ়ামায়ার কাছে এসে সাবধান হয়ে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করে প্রার্থনা নিবেদন করি যেন তিনি আমাদেরকে একবার কৃপা প্রদান করবেন এবং আমাদের সমস্ত বিষয় ময়লা, বিষয়

আসক্তি সরিয়ে দিয়ে ভগবানের ভক্তি রাজ্যে, ভগবানের ভক্তের সেবায় আমাদেরকে প্রবেশ করতে অধিকার দেবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"মায়াকে আমি সৃষ্টি করেছি, তুমি এই মায়া জয় করতে পারবে না। তবে পারবে কখন? যে আমার চরণে শরণাগত হযও, যে আমার চরণে এসে পড়ে যায়, আমি তাকে আস্তে আস্তে মায়া থেকে রেহাই দিই। যখন তুমি আমার ভক্ত ও আমার শরণাপন্ন হয়, তখন মায়া দেবী দেখতে পাবেন যে, 'আমার সৃষ্টিকর্তা চলে এসেছেন'—তখন তিনি তোমার কাছ থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাবে।"

মায়াকে জয় করবার জন্যই সাধু-সঙ্গ করতে হবে। মায়াকে সাধু-সঙ্গ ছাড়া জয় করা যায় না :

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায় ॥

একদিকে আমরা মায়ার কাছে এসে বিনীতভাবে কৃপা প্রার্থনা ভিক্ষা করে থাকি, অন্যদিকে আমাদের আর একটা কথা মনে রাখতে হবে—ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ মায়ার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সেইজন্য আমাদের সব সময় সাবধান থাকতে হবে এবং কোন সময় মায়ার সাথে আপোষ করলে হবে না।

এই জগতে আমরা তো আর বেশী দিন ঠিকই থাকব না, এটা বড় কথা নয়। যদি ১০০ বছরই বাঁচি কিন্তু তার মধ্যে কিছুই না করলাম, জীবের জন্য দয়া না করলাম, জীবের চিন্তা না করলাম, গুরুদেব-ভগবানের সেবা না করলাম, নিজে স্বার্থপরের মত ভাল খেলাম, ভাল পরলাম, ভাল ঘুমালাম—এটা যদি চিন্তা করে গেলাম, তাহলে সে জীবন ১০০ বছর থাকা আর না থাকা সমান কথা। সেটা অনর্থক, নিরর্থ—কোন অর্থ হয় না। ১০০ বছর বেঁচে থেকে যদি জীবের প্রতি দয়াই না হল, সত্যিকারের জীবে দয়া করা যদি না গেল, গুরু-সেবা,

ভগবানের সেবা করা না গেল, তাহলে সে ১০০ বছর বেঁচে থাকার আমাদের কোন দরকার নেই। কিন্তু আমি ৩০ বছরও বাঁচি, ৪০ বছরই বাঁচি, কিন্তু আমি এই ৪০ বছরের মধ্যে জীবের জন্য, ভগবানের জন্য, বৈষ্ণবের জন্য, ভক্তের জন্য কী করে গেলাম—সেই টা ভাবতে হবে, তাহলে সেই ৪০ বছর জীবের থাকা সার্থক জীবন...

আমরা অপরকে বিচার করতে পারি না। নিজের দোষ কী আগে দেখা উচিত কিন্তু আমরা তো নিজের দোষ দেখতে পাই না, সব সময় অপরের দোষ খোঁজার চেষ্টা করি আর নিজের মধ্যে কী কী দোষ আছে সেটা আমরা কখনও ভাবি না। এমন মায়াবদ্ধ জীব আমরা—মায়ার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আমরা নিজেদের দোষটা কখনই দেখতে পাই না, আমরা সব সময় অপরের দোষটা খোঁজার চেষ্টা করি। বৈষ্ণব হবে অদোষ-দরশি—অপরের দোষ দেখবেন না ; কিন্তু আমরা সব সময় অপরের দোষ দেখার চেষ্টা করি। নিজের দোষটা কী সেটা কখনই খোঁজার চেষ্টা করি না। তাই যত দিনই এই জগতে থাকি, তত দিন যদি আমরা একটু হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করতে পারি, ভগবানের সেবা করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে, অল্প দিন বাঁচলেও সেই তো জীবন সার্থক হয়ে যাবে। তাহলে আমরা প্রকৃত অর্থে ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারব।

আমরা সব সময় “শরণাগত, শরণাগত” করি কিন্তু কয়জন আমরা ভগবানের কাছে শরণাগত হয়েছি? কয়জন আমরা গুরুদেবের কাছে শরণাগত হয়েছি? গুরুসেবার করিবার পরিবর্তে গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নেওয়ার নাম করে দীক্ষা নেওয়ার অভিনয় করি। গুরুর সেবার পরিবর্তে গুরু-ভোগী, গুরু-ত্যাগী হয়ে পড়ি কিন্তু গুরু-সেবী হতে পারি নি, গুরু-সেবা করতে পারি নি। নিজের স্বার্থ, নিজের জন্য, নিজের ভাল-মন্দ, টাকার জন্য জীবনটা কাটিয়ে গেলাম কিন্তু আমরা কখনই অপরের চিন্তা করলাম না, জীবের জন্য চিন্তা করলাম না, জীবের যে কী করে মঙ্গল লাভ হবে, সে চিন্তা করলাম না। এই কথা সব সময় মনে রাখতে হবে !

একজন যদি আমার কাছে দীক্ষা নেয়, সেইটা আমাকে মনে রাখতে হবে যে, আমি তাকে দীক্ষা দিয়ে উপকার করলাম না ! আমার

কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সে আমারই উপকার করেছে। যখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে কোন শিষ্য এসে দণ্ডবৎ করতেন, তিনি বলতেন, "দাসো 'স্মি।" অর্থাৎ "আমি আপনার দাস।" কিন্তু আমরা সবাই 'মাস্টার' হয়ে যাই, সবাই 'প্রভু' হয়ে যাই—সবাই মহারাজ হয়ে যাই। আমাদের কেউ দণ্ডবৎ না করলে আমাদের মনে মনে রাগ হয়, মনে মনে অহঙ্কার এসে যায় : "আমি সন্ন্যাস নিয়েছি, আমাকে কেউ দণ্ডবৎ করছে না ! 'মহারাজ' বলছে না !" আমাদের মধ্যে এর মত অহঙ্কার ভাব এসে যায় কিন্তু এটা বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম নয়, ভাই। বৈষ্ণবের culture হচ্ছে এইরকম—

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন ॥

দৈন্যতা থাকতে হবে। দয়া থাকতে হবে। অপরের সম্মান করতে হবে। এইগুণটা সব সময় থাকতে হবে। আমাদের বড় হাওয়ার প্রয়োজন নেই। মহাপ্রভু কী বলেছেন ?

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

এই শ্লোকটা বর্ণনা করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্ত্তন করেছেন :

ধন জন আর কবিতা সুন্দরী
বলিব না চাহি দেহ-সুখকরী।
জন্মে জন্মে দাও ওহে গৌরহরি
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ॥

ধন, জন, কবিতা, সুন্দরী... কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, বহির জগতের লোক, যারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব, তারা ভগবানের কাছে এসে প্রার্থনা করে, "ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, রূপং দেহি, ভার্যাং দেহি, কবিতাং সুন্দরীং দেহি"—এটা সব সময় চায়। এটা পূজা করার সময় বামুনরাও বলে, লোকেরাও বলে—এটা সব সময় চিন্তা করে থাকে কিন্তু কপালে যেটা আছে, সেটাই হবে। আপনি দশ তলায় ঘুমিয়েও যে সুখ পাচ্ছেন, মাটিতে ঘুমিয়ে তার চাইতে আরও বেশী সুখ পাবে।

মহাপ্রভুর শিক্ষা দেখুন। যখন কৃষ্ণ দ্বারকায় ছিলেন, তখন মহিষীরা তাঁকে বাতাস করতেন, তিনি পালঙ্কে শুয়ে আরামভাবে বিশ্রাম করতেন, আবার সেই ভগবান্ এই কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভুর রূপে এসে সন্ন্যাস গ্রহণ করে মাটিতে কলার পাতার উপর শুয়েছিলেন। কত কষ্ট অবলম্বন করে তিনি এই জগতে প্রচার করতেন—আমাদের জন্য !

তাই, সব সময় ভগবানের কীর্ত্তন করতে হবে, ভগবানের নাম করতে হবে। সর্ব্বক্ষণ ভগবানের উপর নির্ভর করতে হবে, সর্ব্বক্ষণ ভগবানের চিন্তা করতে হবে—সব সময় ভগবানের জন্য নিজের ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করতে হবে, মায়ার কাছে সমর্পণ করলে হবে না। ভগবানের কাছে সমর্পণ করলে আপনার লাভ হবে। আমরা সবাই মায়ার জগতে থাকি, মায়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে মায়ার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে দিন রাত কেটে যায়।

আমাদের কথাই একটাই—"কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল ! এই মাত্র ভিক্ষা চাই।" আপনাদের কাছে প্রার্থনা যে, আপনারা যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, যত কিছু করুন না কেন, তার মধ্যে সব কিছু মনের পিছনে ভাগবত্-সেবা, হরি-সেবা, গুরু-সেবা, ভাগবত্-কীর্ত্তন, হরি-কীর্ত্তন, গুরু-বৈষ্ণবের গুণগণ কীর্ত্তন যদি করতে পারেন, তাহলে আপনাদের চরম কল্যাণ লাভ হবে আর তা না হলে বার বার গতাগত অনুসারে এই সংসারের মধ্যে আসতে হবে। নিতাই চরণ না ভজিল যাওয়া-আশা সার হইল।

সেই জন্য আমাদের সব সময় এই কথা মনে রাখতে হবে। যদি আমরা সত্যিকারের হরি-ভজন করতে চাই, তাহলে আমাদের সমস্ত মায়ার সংসার, সমস্ত বিষয়-আসক্তি ছেড়ে দিয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব উপদেশ হৃদয়ে গ্রহণ করে ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। এমনকি আমরা এই পরিক্রমা এখন করে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে—আমরা কি মায়ার পরিক্রমা করে যাচ্ছি না ধাম পরিক্রমা করে যাচ্ছি ? সাধু সাবধান।

জয় শ্রীল গুরুমহারাজ কী জয়।

জয় শচীনন্দন সুর-মুনিবন্দন
ভবভয়-খণ্ডন জয় হে।
জয় হরিকীর্ত্তন নর্ত্তনা বর্ত্তন
কলিমল-কর্ত্তন জয় হে ॥
নয়ন-পুরন্দর বিশ্বরূপ স্নেহধর
বিশ্বম্ভর বিশ্বের কল্যাণ।
জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর-প্রিয়হিয়া
জয় প্রিয় কিঙ্কর ঈশান ॥
শ্রীসীতা-অদ্বৈতরায় মালনী-শ্রীবাস জয়
জয় চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দরায় গদাধর জয় জয়
জয় হরিদাস নামাচার্য্য ॥
মুরারি মুকুন্দ জয় প্রেমনিধি মহাশয়
জয় যত প্রভু পারিষদ।
বন্দি সবাকার পায় অধমেরে কৃপা হয়
ভক্তি সপার্ষদ-প্রভুপাদ ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রয়াদেবীর বাড়ি : বিরহের ভবন

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে আমরা শ্রীবৃদ্ধশিব মন্দির ও শ্রীপ্রৌঢ়ামায়ার মন্দির থেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় এই মনোহর ও অত্যন্ত গূঢ় স্থানে এসেছি—এটা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বাড়ি (লোকে বলে 'মহাপ্রভুর বাড়ি')। এখানে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী (ভগবানের নিত্যশক্তি, নিত্যকলত্র বা পত্নী) আবির্ভূত হয়েছিলেন, এখানে তিনি তাঁর শেষ জীবনও কাটিয়েছিলেন।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দিপিকায় আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী দ্বারকা-লীলায় সত্যভামা—তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ-বৈভব।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বাবার নাম সনাতন মিশ্র। পরম বৈষ্ণব ও বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ হয়ে তিনি বহু ভাগ্যের ফলে এক দিন গুণময়ী পরমা সুন্দরী কন্যারত্ন পেয়েছিলেন—তিনি তাঁর নাম রাখলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। শিশুকাল থেকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রতি দিন তুলসী সেবা করতেন, অর্চ্চনা, পূজা, ঠাকুরের বিভিন্ন সেবা করতেন এবং প্রতি দিন তিনি গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। মাঝে মাঝে শচীমাকে দেখলে তিনি তাঁর চরণে সব সময় প্রণাম করতেন, শচীমাতাও তাঁকে স্নেহ করে আশীর্বাদ দিয়ে বলতেন, "কৃষ্ণ তোমাকে যোগ্য স্বামী প্রদান করুক" আর মনে তিনি ভাবতেন, "এই মেয়েটির আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হোক"।

মহাপ্রভুর প্রথম পত্নী ছিলেন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী কিন্তু যখন মহাপ্রভু বাংলাদেশে শিক্ষা দেওয়ার জন্য চলে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে বিরহের সর্পে দংশন করল—তিনি প্রভুর বিরহ সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করে মহাপ্রভুর কাছে চলে গিয়েছিলেন। কিছু দিন পর শ্রীশচীমাতা কাশীনাথ পণ্ডিতের কাছে গিয়ে তাঁকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাথে নিমাইয়ের বিবাহ ব্যবস্থা করবার অনুরোধ করেছিলেন। নিমাই মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য অপত্তি করলেন না, তাই সেই ভাবে তিনি

দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি দিলেন। সমস্ত ভক্তগণ ওই বিবাহের দিনে কত বড় আনন্দ করেছিলেন সেটা বর্ণনা করবার জন্য আমার ক্ষমতা নেই ! সমস্ত নবদ্বীপ ওই দিনে সুখময় হয়ে উঠল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনও আনন্দিত ছিল ; তিনি শিশুকাল থেকে প্রভুর প্রতি খুব বেশি আকৃষ্ট ছিলেন এবং এখন শেষ পর্যন্ত তাঁর নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল—তিনি প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় ও সেবা পেয়েছিলেন।

কিছু পর মহাপ্রভু গয়া-ধামে গিয়েছিলেন—সেখান থেকে ফিরে আসার পর তাঁর সব কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখেও দেখলেন না—প্রেমাবেশে হয়ে তিনি শুধু কৃষ্ণনাম করতেন। কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। সবাই বলতেন যে, নিমাই পাগল হয়ে গিয়েছেন। কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের তীব্র মায়ার প্রতি আসক্তি প্রবৃত্তি দেখে কিছু দিন পর মহাপ্রভু ঠিক করলেন যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার আগে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য শ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে প্রকাশ করলেন। তাঁরা উভয় কিছু বলতে পারলেন না—মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কেউ তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেন না।

যে দিন মহাপ্রভু চলে গিয়েছিলেন, সে দিনটা যখন এলেন, তখন মহাপ্রভু কালনিদ্রা দেবীকে ডেকেছিলেন। কালনিদ্রা মানে মৃত্যুরূপ ঘুম—যে ঘুম কখনো ভাঙে না। ওই কালনিদ্রাদেবী এসে বললেন, “প্রভু, এসেছি। আমার কাজ কী?” মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, “এখন তুমি তোমার কাজ কর।” তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এত গভীর নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়লেন যে তিনি আর উঠতে পারলেন না ওই রাতে। কালনিদ্রাদেবী তাঁর কাজ ঠিক মত করেছিলেন, তা না হলে মহাপ্রভু কখনও চলে যেতে পারতেন না—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কান্নাকাটি ও চিৎকার করতে লাগতেন। সেইরকম মহাপ্রভু বাড়ি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন। বাহিরে কেউ বলতে পারে যে, এটা বড় কাজ, বড় বিসর্জন নয়, কিন্তু যে ভক্তি, যে আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর হৃদয়ে ছিল, তার সাথে কিছু তুলনীয় এই জগতে নেই। জীবের দয়া করবার জন্য, জীবের উদ্ধার করবার জন্য, সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণকথা প্রচার করবার জন্য

মহাপ্রভুকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভালবাসার রাজসিংহাসনকে বিসর্জন করতে হল। সেটা সাধারণ কথা নয়। শুধু মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সী হয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও তাঁর প্রাণনাথকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এই জগতের জন্য। তাঁর অতুলনীয় বিসর্জন আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আগেও জানতেন যে, মহাপ্রভু বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন—তিনি জানলেন যে, প্রভু ঘরে থাকবেন না। মহাপ্রভুও তাঁকে সব খুলে বলে দিয়েছিলেন এবং এমনকি তাঁর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করছিলেন কিন্তু তাঁর চলে যাওয়ার পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরহ বেদনায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন। দিন রাত তিনি কান্নাকাটি করতেন, "প্রভু আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন !"

যে দিন মহাপ্রভু নবদ্বীপধাম থেকে চলে গিয়েছিলেন, সেই দিন সমস্ত শ্রীনবদ্বীপধাম একেবারে অন্ধকারময় হয়ে গেল। সমস্ত নবদ্বীপবাসী, এমনকি যারা পাষণ্ডীরা, যারা মহাপ্রভুর নিন্দা করতেন, তারাও সবাই কাঁদতে কাঁদতে কাতর হয়ে পড়লেন। আমাদের মঠে পরম গুরুমহারাজ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ ওই সময় তিন দিন ধরে খুব গভীর ভাবে কাটাতেন। ওই তিন দিন ধরে মঠে শুধু এক তরকারি রান্না হয়—ঠাকুরের ভোগ লাগানো হয় আর সব সবজি আতপ চালের সাথে মিশিয়ে দিয়ে প্রসাদ এই ভাবে পরিবেশন করা হয়। আর বিরহের দ্বারা অভিভূত হয়ে আমাদের পরম গুরু মহারাজও ঘর থেকে বেরতেন না। এই ভাবে তিনি ওই লীলা পালন করতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলেছিলেন শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গে :

আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোরবেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে ॥
যথায় চাঁচর কেশ ত্রিকচ্ছবসনে।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন সনে ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রথম সময় শচীমাতার সঙ্গে বাড়িতে থাকতেন, তার কোলে ক্রন্দন করতে করতে যে কোন ভাবে জীবন যাপন

করতেন। ঈশান ঠাকুর ও বংশীবদন ঠাকুর তাঁদেরকে দেখাশোনা করতেন। পরে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁর বাবার বাড়িতে চলে গিয়ে একবার দরজা বন্ধ করে সেখানে শেষ পর্যন্ত থাকতেন। এই বাড়িতেই আমরা আজকে বহু ভাগ্যের ফলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় এসেছি।

বাবার বাড়িতে এসে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নিজে মহাপ্রভুর বিগ্রহ তৈরি করেছিলেন—নিজে মূর্ত্তি ওয়ালার কাছে গিয়ে তিনি বার বার মূর্ত্তিটাকে দেখলে বলতেন, “এটা আমার প্রভু নয়”, “এটা আমার প্রভু নয়”। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি আবার এক দিন মূর্ত্তি ওয়ালার কাছে এসেছিলেন, তখন শ্রীবিগ্রহকে দেখলে তিনি একবার মাথা ঢেকেছেন। এই ভাবে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, সেই বিগ্রহটি খাঁটি বা সম্পূর্ণ হয়েছিল। তিনি সব সময় ওই বিগ্রহের সেবা করতেন। প্রত্যেক দিন একটা করে চাল নিয়ে তিনি হরিনাম করতেন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—আর চালটা রেখে দিতেন। দিনের মধ্যে যত বার তিনি হরিনাম করতেন, ততটা চাল জড় দিয়ে সিদ্ধ করে ঠাকুরকে (মহাপ্রভুকে) ভোগ নিবেদন করতেন। তারপর তিনি ওই প্রসাদ পেতেন। এরকম তিনি জীবন যাপন করতেন।

এখানে এসে আমাদের ধামেশ্বর মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবিত-বিগ্রহ দর্শন করতে সুযোগ পাই। যে বিসর্জন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী করেছিলেন, সে বিসর্জন আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। এই জীবন নিজের ভোগের জন্য নয়! এই জীবনের উদ্দেশ্য বিসর্জন করবার জন্য। আমাদের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কাছ থেকে শিক্ষা করা উচিত। শুধু মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সী মেয়ে হয়েও তিনি সব কিছু এই জীবনে ত্যাগ করেছিলেন—এমনকি পরম প্রভু স্বয়ং প্রাণনাথকে ছেড়ে দিলেন। আর আমরা তুচ্ছ জিনিসও ত্যাগ করতে পারি না (চাও ত্যাগ করতে পারি না!)। নিজের সুখ বিলিয়ে দিতে হবে। ভক্তগণ কখনও নিজের চিন্তা করেন না—তাঁরা সব সময় শুধু ভগবানের সেবা, ভগবানের সুখের চিন্তা করে চলছেন। ভক্ত সব সময় ভাবছেন, “আমি কি করে আমার প্রভুকে, আমার গুরুকে সন্তুষ্ট করতে

পারি ?” ব্রজগোপীগণও বলেন, “নরক প্রাপ্ত হলে আমাদের কোন অসুবিধা নেই—যদি ভগবান্ সুখী, সেটাই ভালো। যাহাতে উনি ভালো থাকেন, আমাদের এই ত একমাত্র আসল সুখ।”

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে আমরা আর একটা গুহ্য কথা শুনেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২/১৩/১৪৫) একটা কথা উল্লেখ আছে, সে কথাটা শ্রীরাধারাণীর মুখ থেকে এসেছিল :

না গণি আপন-দুঃখ, দেখি’ ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার’ ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি’,
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে ?

তিনি বলেন, “আমরা কোন নিজের মনের দুঃখ মানি না কিন্তু যখন আমরা মা যশোদা বা নন্দ মহারাজের অবস্থা দেখি, তখন আমাদের মন বারবার ভেঙ্গে যায়। আমরা এই বেদনা সহ্য করতে পারি না ! আমাদের নিজের ব্যথা আমরা যে কোন ভাবে সহ্য করতে পারি, কিন্তু মা যশোদার মুখ দেখে আমরা ওঁর ব্যথা সহ্য করতে পারি না !”

মহাপ্রভু-লীলায় আমরা সম্যকরূপের অবস্থা দেখতে পাই। সন্ন্যাস নেওয়ার আগে তিনি পাঁচ ভক্তগণকে তার সম্বন্ধে বলেছিলেন—তার মধ্যে ছিল শচীমাতা। সন্ন্যাস নেওয়ার কথা শুনলে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তাঁকে সব বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, “তুমি কে আর আমি কে? তুমি সব জান।” নিমাই মাকে কিছু সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কিন্তু সেটা ছিল সাময়িক। যখন মহাপ্রভু শেষপর্যন্ত চলে গেলেন, তখন শচীমাতা অচেতনাবস্থায় ছিলেন। তিনি বাড়ির বাহিরে বসে থাকলেন আর মহাপ্রভু তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে কেশব ভারতীর আশ্রমে চলে গিয়েছিলেন। শচীমাতা তখন কিছু বলতে পারলেন না, শুধুমাত্র পাথরের মত বসে থাকলেন। আমরা সব সময় রাধারাণী ও গোপীগণের ব্যথারে কথা স্মরণ করি কিন্তু আমরা ভুলে গিয়েছি কত দুঃখ, কত কষ্ট মা যশোদা, নন্দ মহারাজ ও শচীমাতা পেয়েছিলেন।

"না গণি আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ, ব্রজজনের হৃদয় বিদরে। কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি', কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে?"—এই প্রশ্ন করেছিলেন শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, "আমি প্রতি দিন ব্রজধামে আসি—তুমি ভাবছ সেটা মায়া বা স্বপ্ন কিন্তু সেটা সত্য নয়, আমি নিজেই আসি।" রাধারাণী তাঁকে বিশ্বাস করলেন। ভক্তের বিরহের জ্বালার কথা বর্ণনা করে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন (২/২/২৯-৩৫):

বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে-চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক্ তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে, শুন, মোর হত বিধিবল।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ হে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম॥
মৃগমদ-নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, যে যাইকে ছারখার,
সেই বপু লৌহ-সম জানি॥
করি' এত বিলাপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।

সেইজন্য এই বিরহের ভবনে এসে আমরা ভক্তের বিরহ লীলা স্মরণ করতে করতে আবার আমাদের পরিক্রমা চালিয়ে যাচ্ছি। কোন জন্মে আমরা সেটা বুঝতে পারব, কোন জন্মে আমরা সেবোন্মুখ হয়ে সে উচ্চতম ভক্তির রাজ্য প্রবেশ করতে পারব, সেটা আমরা জানি না কিন্তু সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা এই জীবনে এত নিচু ও অধম হয়েও এই রূপানুগ-ধারায় যোগদান করতে পেরেছিলাম।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তত্ত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়দর্শন পত্রিকায় আমরা একটি প্রবন্ধরত্ন পাই যে আমরা এখানে উদ্ধৃত করি ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব

(সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। তাঁহার কৃপা-ব্যতীত প্রেমভক্তিলাভ হয় না। শ্রীগৌরনারায়ণ-লীলায় তিনি গৌরনারায়ণের ভূশক্তি-স্বরূপিণী। গৌরনারায়ণ তাঁহার মর্য্যাদাবুদ্ধি, তথায় দাস্যভাবই প্রবল—অপ্রাকৃত বৈধপত্নীভাব। প্রাকৃত পতিপত্নীভাবের কোন স্থান সেখানে নাই। তিনি শ্রীগৌরগৃহের গৃহিণী। তাঁহার আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই জীবের প্রাকৃত স্ত্রীপুং বিচার জনিত জড়ীয় ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব-প্রধান সংসার বিদূরিত হইয়া শ্রীগৌরগৃহে প্রবেশাধিকার লাভ হয় এবং তথায় শ্রীনামহট্টের সংমার্জ্জনীস্বরূপে সেবাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়।

কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বহুবল্লভ দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী বাম্যস্বভাববিশিষ্টা শ্রীসত্যভামা বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহাতে বৈশিষ্ট্য এই যে, পুরমহিষী শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামার গর্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঔরসজাত সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছিল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্বন্ধে তাদৃশ কোন লীলার প্রাকট্য না থাকায় তিনি মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরনারায়ণের লীলার লক্ষ্মীস্বরূপেই বিচার্য্য হইয়া থাকেন। শ্রীগৌরনারায়ণের লীলায় পরের ন্যায় বহুবল্লভত্ব দৃষ্ট হয় না।

শ্রীগৌরবিশ্বম্ভর-লীলায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অংশাবতাররূপে মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তিস্বরূপিণী হইয়া শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে শ্রীরাধাভাব বিভাবিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভ লীলায় পুষ্টি বিধানকারিণী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলায় বাধা প্রদান-জনিত সম্ভোগময়ী কোন ধারণার লেশমাত্র তথায় নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া যাঁহারা তাঁহাকে নীলাচলে কাশীমিশ্র ভবনস্থ গম্ভীরা-মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—উভয়েরই শ্রীপাদপদ্মে মহা-অপরাধী—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী, রসাভাস-দোষদুষ্ট, অতীব

নিন্দনীয় প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীগৌরনারায়ণ ও শ্রীগৌরবিশ্বম্ভর বস্তুতঃ এক অদ্বয়জ্ঞান হইলেও উভয় প্রাকট্যের মধ্যে লীলাগত বৈশিষ্ট্য আছে, লীলার পৃথক্ প্রকোষ্ঠও আছে, তাঁহাদের সে লীলার বৈশিষ্ট্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অর্ব্বাচীনতা ও ধৃষ্টতা সম্পূর্ণরূপে গর্হণীয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি সকলেই আচার্য্য—শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ—স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরই। তবে বৈশিষ্ট্য এই—শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্য হইলেও আচার্য্যগণের প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাদির (প্রভুতত্ত্ব হইয়াও) 'দাস' অভিমান প্রবল।

শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বম্ভবরের প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কৃপার লেশমাত্র লাভ হইলেই জীব ধন্যাতিধন্য হন, তাঁহার শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে নামভজনে নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলায় নামভজনশিক্ষাদাত্রী আদর্শ আচার্য্য। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর যখন নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান লীলার অব্যবহিত পরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার আদেশে শ্রীধাম মায়াপুর আগমন করেন, তখন শ্রীল আচার্য্য ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীঈশান প্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর (৪র্থ তরঙ্গ) ও প্রেমবিলাস-গ্রন্থে এই সকল ঘটনা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তণ্ডুলে সংখ্যা রাখিয়া নাম গ্রহণ করিতেন (অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর উচ্চারণান্তে একটো তণ্ডুল রক্ষণ, দুইটি নূতন মৃৎপাত্রের একটি শূন্য, অপরটিতে তণ্ডুল থাকিত)। যে কয়টি তণ্ডুল হইত, তাহা রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া তাঁহার কিয়দংশ মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। প্রসাদ-গ্রহণকালেও বিপ্রলম্ভের সহিত নামগ্রহণ করিতেন। এইরূপ তাঁহার দিবারাত্রি নামভজনে অতিবাহিত হইত।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের খেতরীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় 'প্রিয়া' সহ ছয়বিগ্রহ (গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন-রাধাকান্ত রাধারমণ) স্থাপনের কথা ভক্তিরত্নাকর ১০ম ও ১২শ তরঙ্গে, প্রেমবিলাস ১৯শ বিলাসে শ্রীনরোত্তমবিলাস ৬ষ্ঠ বিলাসে বর্ণিত

আছে। শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীরঘুনন্দন-নন্দন শ্রীল ঠাকুর কানাই শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তির বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবা প্রকট করেন বলিয়াও শুনা যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র (ইং ১৮৯৪, ২১ মার্চ্চ) বুধবার ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকট করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার (চৈঃ ভাঃ আঃ ১০।৪৮) ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাকার (৪৩সংখ্যা) শ্রীবল্লভাচার্য্যকে জনক ও ভীষ্মক একাধারে এবং তাঁহার কন্য লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে জানকী ও রুক্মিণী একত্র স্বরূপে লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আঃ ১৫/৫৯) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে রুক্মিণীরূপেও বর্ণিত আছে যথা—

“যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীতে অন্যোহন্য উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত ॥”

শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীসনাতনমিশ্রকে কৃষ্ণলীলার সত্রাজিৎ নৃপরূপে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সেই সত্রাজিৎ নৃপদুহিতা জগন্মাতা ভূ-স্বরূপিণী সত্যভামাস্বরূপে বর্ণিত আছে। সত্যভামা ও রুক্মিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অবতার হওয়ায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও শ্রীবার্ষভানবীর অবতার বলা যাইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে অংশিনী রাধা বলিয়া শ্রীগৌর-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলিতে চাহেন, তাঁহারা উভয় লীলার বৈশিষ্ট্য-ধ্বংস-প্রয়াস হেতু উভয়স্থলেই ঘোরতর অপরাধী হন।

শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরসুন্দরের নাগরত্ব কোথাও নাই।

“অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর,—হেন স্তব নাহি বলে ॥”

—ইহাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্বমুখোক্তি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-প্রসঙ্গে যে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অন্যোন্যে সম্ভাষণ বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়, তাহাতেও শ্রীলক্ষ্মী-গৌরনারায়ণ-লীলা-বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইবার কোন কথা নাই।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে 'শ্রীরাধা' বলিয়াছেন বলিয়া একটি কথা গৌরনাগরী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শুদ্ধগৌড়ীয়গণ জানেন—তাঁহার দ্বারা কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা ও সন্ন্যাসলীলার বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইতে পারে না। অংশিনী শ্রীরাধারই বিষ্ণুপ্রিয়ারূপ অংশাবতার, ইহাতে তিনি শ্রীরাধাব্যতীত আর কে? কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার সহিত শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিপ্রলম্ভলীলা ও শ্রীগৌরনারায়ণ-লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া-লীলার চিন্ময় বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য নিত্য বিদ্যমান।

শ্রীল প্রভুপাদ বিগত ১১ই আষাঢ় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে শ্রীধাম মায়াপুরে বিষ্ণুপ্রিয়াপল্লীর কর্ত্তব্যতাবিষয়ক নিম্নলিখিত পত্রখানি কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন,—

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপল্লী শ্রীধাম মায়াপুরে হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য ছাড়িয়া যাহারা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের স্থান শ্রীমায়াপুরে হওয়া উচিত নহে। * * সতদিন পর্যন্ত স্ত্রীভক্তগণের পিতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর আয়োজন করিতেছিলেন, তৎকালাবধি গোলমাল উপস্থিত হয় নাই।

* * * বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত স্ত্রীভক্তগণ শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিবেন। তাঁহারা নিজের স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবেন না। * * *

গৃহমেধীয় ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও প্রভুপাদের অভীষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর অধিবাসী হওয়া যায় না। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কৃপার লেশমাত্র লাভ হইলেই গৃহমেধীয় ধর্ম্ম ছুটি হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজজনের সংসারকে বদ্ধজীবের আত্মেন্দ্রিয়তোষণের সংসারের সহিত তুলাজ্ঞানকারী গৃহি-বাউল-সম্প্রদায়ের সহিত শুদ্ধগৌড়ীয়গণের বিচার চিরকালই পৃথক্।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—শুদ্ধা সরস্বতী, তিনিই পরবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী—

শ্রীগৌরনৃসিংহের বদনবিলাসিনী বাগীশা। তিনিই শুদ্ধ বাক্ বা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মনামানুশীলনে স্ফূর্ত্তিপ্রদান করিয়া জীবসকলের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন। তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলেই জীব কৃষ্ণভজনের মূর্ত্তিমতী বাধাস্বরূপা জড়বিদ্যার উপাসক হইয়া বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার কবলে কবলিত হন, "ভক্তিবাধা" যাথা হইতে, সেই বিদ্যার "মস্তকেতে পদাঘাত কর অকৈতব"—এই মহাজন বাক্য কীর্ত্তন করিবার সাহস তাঁহার থাকে না।

শত্যুক্ত পরবিদ্যা ও অপরা বিদ্যার পার্থক্য পাঠ করিয়াও অনূচনিমানী ব্যক্তিসকল পরবিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের বিজয় গান করিতে না পারিয়া চির বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"প্রশ্ন—শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে হয়?

উত্তর—গৌরাঙ্গের যুগল দইপ্রকার—অর্চ্চনমার্গে একপ্রকার ও ভজনমার্গে অন্যপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন ; ভজনমার্গে শ্রীগৌর-গদাধর।

প্রশ্ন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কোন্ শক্তি?

উত্তর—সাধারণতঃ তাঁহাকে 'ভূশক্তি' বলিয়া ভক্তগণ বলেন ; তত্ত্বতঃ তিনি হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনামপ্রচারের সহায়স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ ধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ নয়টি দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ।

প্রশ্ন—তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বরূপশক্তি বলা যায়?

উত্তর—ইহাতে সন্দেহ কি? স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিচ্ছক্তি কি স্বরূপশক্তি নন?"

—জৈবধর্ম্ম ১৪শ অধ্যায়

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন :—

“শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণস্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়া জানিতে হইবে। গৌরগণোদ্দেশের ৪৩শ সংখ্যায় কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন যে,—যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য, সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী, এই দুই একত্রে মিলিয়া ‘লক্ষ্মী’ নাম্নী তাঁহার এক কন্যা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাকালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেম-ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌর-নারায়ণের সেবিকাস্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—ভূশক্তিস্বরূপিণী। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন যে,—পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনি গৌরাবতারে ‘রাজ-পণ্ডিত সনাতন’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ‘ভূ’ স্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। ‘শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে’ কবিকর্ণপুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণমিলিততনু সুতরাং ভক্তবাৎসল্যবিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একজন ভক্তা, সহচরী, পরমেশ্বরী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদি লীলায় অর্থাৎ গয়ায় গমনের পূর্ব্ব পর্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে ;—যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুর্ভুজ নৃসিংহরূপ ও মুরারিগুপ্তের

গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষলীলায় তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্য্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা-কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমণের পরে স্বয়ংরূপ বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া "গোপী" "গোপী" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। তিনি ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দকে জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।"

—'শ্রীসরস্বতীসংলাপ' ২৩ পৃঃ

সন্ন্যাসলীলা-প্রদর্শনের পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ডে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া সার্থক করহ ইহা
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোঁরে কহিলুঁ কথা দূর কর আন চিন্তা
মন দেহে কৃষ্ণের চরিতে॥"

সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বষণ-চেষ্টার যেরূপ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের ৪র্থ তরঙ্গে এইরূপ পাই—

"প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥
তারারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভজণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী-প্রদর্শিত ভজনাদর্শ অনুসরণের নির্ব্ব্যলীক দৃঢ়তার উদয় হইলেই আমরা শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌর-জন-সঙ্গে শ্রীগৌরস্মরণ মহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য বরণ করয়া শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলীর সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানপূর্ব্বক তৎসন্নিহিত প্রদেশে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-প্রকটিত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের সেবকানুসেবক হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাবসর লাভ করিব।

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা' লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসারনিধি তাহে ডুবাইল বিধি
কেশে ধরি মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান না শুনে ধরম জ্ঞান
সদাই করম-পাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ যত দেখি সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে তেঁই কান্দে॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন ফিরে যেন অন্ধজন
সুপথ বিপথ নাহি জানে॥
না লইনু সৎ মত অসতে মজিল চিত
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তম দাসে কয় দেখি শুনি লাগে ভয়
তরাইয়া লহ নিজ পাশ॥

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আজকের দিনের শেষে বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের কাছে এসেছি। এখানে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁর শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। আমাদের সব মন্দিরে শ্রীগুরুপরম্পরার মধ্যে বাবাজী মহারাজের ছবি শেষে দেখবেন।

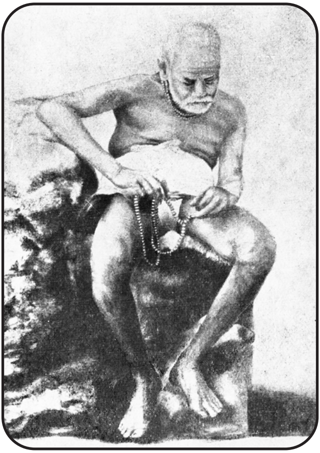

শ্রীল বাবাজী মহারাজ খুব নিষ্ঠ ভাবে ভজন করতেন। এক দিন কেউ তাঁকে বাতাবি লেবু নিয়ে এসে বললেন, “প্রভু, এইটা সেবায় লাগানোর জন্য নিন।” কিন্তু বাবাজী মহারাজ বললেন, “আপনি বলছেন যে, আপনি এটা সেবার জন্য নিয়েছেন কিন্তু আপনার ভিতরে অন্য বাসনা আছে। আমি জানি। আপনি ভাবছেন যে, আমাকে কিছু ফল দিয়ে গেলে তাহলে আপনার গাছে আরো বেশী ফল আসবে। এই বাসনা আপনার আছে।” তিনি ফলটা স্বীকার করলেন না। অন্য সময় তিনি বললেন, “নামাপরাধ করার চাইতে শুদ্ধ বৈষ্ণবের বেগুনগাছের জল দেওয়া অনেক ভালো।” আমি অনেকবার দেখেছি যে, অনেকেই পাঠের সময় বা পরিক্রমার সময় মালা নিজে নিজে জপছেন কিন্তু কীর্ত্তনের সময় তাঁদের মুখ বন্ধ আছে—হরে কৃষ্ণও বলতে পারেন না। আমাদের গুরুমহারাজ বললেন যে, সেটা finger exercise (আঙ্গুলের ব্যায়াম)। ওই রকম লোকগুলো কীর্ত্তন বুঝতে পারেন না। নামাপরাধ করছেন।

এখানে এসে আমাদের শ্রীল বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তন করতে হবে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কৃষ্ণকথার ছাড়া অন্য কথা একদম পছন্দ করতেন না। তিনি হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব, সিদ্ধ মহাপুরুষ বাবাজী।

আমাদের পরম গুরুমহারাজ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের প্রণাম মন্ত্রে তাঁর প্রধান গুণ-মহিমা বর্ণনা করেছিলেন :

গৌরব্রজাশ্রিতাশেষৈর্বৈষ্ণবৈর্বন্দ্যবিগ্রহম্।
জগন্নাথপ্রভুং বন্দে প্রেমাব্ধিং বৃদ্ধবৈষ্ণবম্॥

গৌর-ব্রজ-আশ্রিত অশেষৈর্ বৈষ্ণবৈর্ বন্দ্য বিগ্রহ। যে সমস্ত বৈষ্ণবগণ ব্রজের কৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁরা সবাই শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে বন্দনা করে থাকেন। তিনি হচ্ছেন পরম পূজনীয় বিগ্রহ, আশ্রয়স্বরূপ।

জগন্নাথপ্রভুং বন্দে প্রেমাব্ধিং বৃদ্ধবৈষ্ণবম্। আমরা সব সময় এই প্রেম-সাগরে ভাসিয়া পরমপূজ্যপাদ প্রবীণ বৃদ্ধ বৈষ্ণব ঠাকুরের শ্রীচরপে প্রণাম করে থাকি।

আপনারা জানেন যে, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ সিদ্ধ মহাপরুষ বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে যে, রাধাকুণ্ড আর বৃন্দাবনের কৃষ্ণের লীলা সব শ্রীনবদ্বীপধামে এখন বিরাজ করে—এই টানে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বৃদ্ধ বয়সে হয়েও এখানে এসে একটা ছোট্ট কুটিরে বসবাস করতে লাগলেন।

আপনারা শুনেছেন যে, যখন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ১৩৭ বছর বয়স ছিলেন, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এখানে এসে তাঁকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান অনুমোদন করবার জন্য মায়াপুরে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। পরমধাম যোগপীঠে এসে বাবাজী মহারাজ ঝুড়ি থেকে লাফ দিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে বললেন, "হরিবল ! পেয়েছি ! সেটা প্রভুর জন্মস্থান ! সেটা যোগপীঠ !"

আমরা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অপূর্ব্ব চরিত্রের সম্বন্ধে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের মুখে কিছু কথা শুনেছি। এই কথা শুনে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

অনেকেই গুরুদেবের জন্য রান্না করে এসে বলেন, "গুরুদেব আমাকে একটু প্রসাদ দিন।" এটা সব সহাজিয়ারা করেন আর যে সত্যিকারের গুরু হন, তিনি ওই রকম কথা শুনে বিরক্ত হন, তিনি কখনও নিজের প্রসাদ দিতে চান না। আপনার যদি গুরু-প্রসাদ পাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে লুকিয়ে থাকতে হবে। যখন গুরুদেবের প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল আর যদি তিনি কিছু প্রসাদ থালায় রাখলেন, তাহলে আপনি পরে সেখান থেকে হাতে করে লুকিয়ে কিছু নিতে পারেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে যে নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। আর অনেকেই ভাবেন, "আমি তাঁর প্রসাদ পেতে চাই বলে গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ করে আমার বাড়িতে নিয়ে আসব।"—আর তারা গুরুদেবকে জোর করে খাওয়ান। সেটা বৈষ্ণবের আচরণ নয়।

একবার শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে কালনার কাছে ধাত্রিগ্রামে একজন বয়স্ক মহিলা নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাবাজী মহারাজের সেবক ছিলেন বিহারীদাস। ওই মহিলা বিহারীদাসের কাছে এসে বললেন, "আমি আপনার গুরুদেবকে একবার নিমন্ত্রণ করে আমার বাড়িতে একটু রান্না করে প্রসাদ দিতে চাই।" বিহারীদাস বললেন, "ঠিক আছে। আমি বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করব। তিনি যদি রাজি হন, তাহলে ডেট দিয়ে দেব আর সেই ডেট অনুসারে করবেন।"

বাবাজী মহারাজের কাছে গিয়ে বিহারীদাস বললেন, "বাবাজী মহারাজ, একজন ভদ্র মহিলা (বয়স্ক বিধবা) এসেছেন, উনি বলছেন তাঁর বাড়িতে আপনি একটু যাবেন, উনি রান্না করে আপনাকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ দেবেন। আপনি কি যাবেন ?"

বাবাজী মহারাজ বললেন, "ঠিক আছে।"

"বলতে পারবেন কোন দিন ?"

"তুমি যে ডেট দিয়ে দেবে, আমি সেই দিন যাব।"

তখন বিহারীদাস ডেট দিয়ে দিলেন। সেই দিন হেঁটে হেঁটে গিয়ে (আগের কালে তো কোন ট্রেন ছিল না) তাঁরা ভদ্র মহিলার বাড়িতে উঠলেন। ভদ্র মহিলা বিহারীদাসকে বললেন, "আমার রান্না হয়েছে।

আপনি ভোগটা লাগিয়ে দিন।” বিহারীদাস ভোগ লাগিয়ে দিলেন এবং মহিলাটি বললেন, “আপনারা বসুন, আমি প্রসাদ আপনাদের দুজনকে দেব।”

উনি কলাপাতায় প্রসাদ দিলেন আর যা দিয়েছেন বাবাজী মহারাজ সব পাতা চুষে খেয়ে গিয়েছিলেন। মহিলাটি ভাবলেন, “বাবাজী মহারাজকে এত কষ্ট করে নিমন্ত্রণ করলাম... আমার ইচ্ছা ছিল ওঁর একটু প্রসাদ নেব কিন্তু আমি তো দেখছি বাবাজী মহারাজ কিছুই রাখলেন নি। ঠিক আছে, আমি আরও কিছু ওঁকে দেব !” ওই রকম মনে মনে ইচ্ছা করে উনি আর একটু জোর করে দিতে গেলেন কিন্তু বাবাজী মহারাজ বললেন, “না, না, না ! কিছু লাগবে না ! আমি শেষ করে দিচ্ছি, আর লাগবে না। আমার প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে, আর পাব না।” কথা না শুনে মহিলা জোর করে বললেন, “না, একটু নিন, একটু নিন।” শেষে জোর করে আবার কিছু প্রসাদ দিয়ে দিলেন—সবজি, তরকারি, অন্ন, প্রভৃতি। তখন বাবাজী মহারাজ সব বুঝতে পেরে মনে অসন্তুষ্ট হলেন, “তুমি আমাকে জোর করে খাওয়াচ্ছ কারণ তুমি নিজেই প্রসাদ পেতে চাও ! তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি।” বাবাজী মহারাজ কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ রইলেন আর তারপর কী করলেন? পুনরায় ওই মহিলা তাঁকে যা দিলেন তিনি আবার সব খেয়ে নিলেন আর সব খেয়ে নিয়ে একবার কলাপাতাও খেয়ে নিলেন ! মহিলাটি এটা দেখে ভাবলেন, “হায় কপাল !” বিহারীদাসও বললেন, “হায় কপাল ! প্রভুর এত কষ্ট হল ! আমি আর কোন দিন এইরকম নিমন্ত্রণ নেব না।” কিন্তু বাবাজী মহারাজ কিছু বলেন নি।

এইরকম ছিলেন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ। আর একটা কথা আছে। যখন বাবাজী মহারাজ ও বিহারীদাস ওই মহিলার বাড়ির দিকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন একটি ধনী লোক তাঁদের দেখে ভাবলেন, “উঃ, সাধুটি খুব গরিব—খালি পায়ে চলে যাচ্ছে, কাপড় সব ছেঁড়া... আমি তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে দেই, তাহলে তিনি অন্ততঃপক্ষে একটা ভাল কাপড় কিনতে পারবেন।” আসলে ধনী লোকটির অহঙ্কার,

অভিমান ছিল—তাঁর বেশী টাকার গরম ছিল। তাই এটা মনে করে তিনি বাবাজী মহারাজকে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন। বাবাজী মহারাজ সে টাকা নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। কিছু দূর, তিন কিলোমিটারের মত, গিয়ে তিনি বিহারীদাসকে বললেন, "বিহারীদাস, ফিরে চল ! যে দিক থেকে এসেছ সে দিকে চলবে।" "কেন রে ?" "চল, তুমি সেখানে চল।"

সেই ধনীর লোকের বাড়িতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, লোকটি ছাদে বসে ছিলেন। বিহারীদাস তাঁকে ডাকলেন (বাবাজী মহারাজের বয়স হয়ে আস্তে আস্তে কথা বলতেন আর জোরে ডাকতে পারতেন না)।

"বাবু, বাড়িতে আছেন আপনি ?"

লোকটা ছাদ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ, আছি। কেন ?"

"আপনি একটু নিচে আসুন।"

"কেন ? কী হল ?"

"বাবাজী মহারাজ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান",—বললেন বিহারীদাস।

লোকটা নিচে গিয়ে ভাবছিলেন, "আমার মনে হয়, তিনি আর কিছু চাইতে এসেছেন। এইরকম অনেকই করে—ওদের কিছু একবার দিলে ওরা আবার মাসে-মাসে আসবে !" কিন্তু বাবাজী মহারাজ কী করলেন ? তিনি ওইটাকাটা লোককে ফেরৎ দিয়ে দিলেন।

"এটা কী ?" লোকটা অবাক হয়ে গেলেন—"প্রথমে নিলেন, আবার ফেরৎ দিচ্ছেন ?"

বাবাজী মহারাজ তখন বুঝিয়ে দিলেন, "বাবা, দেখ, এতগুলোর টাকার ভার আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি যখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন আমার মনে মনে হচ্ছিল যে, আমি এই টাকা দিয়ে কী কিনব, কী করব, কী হবে—সব সময় এই টাকার চিন্তা করছিলাম বলে আর হরিনাম করতে পারছিলাম না। বাবা, এই ঝামেলা আমার মাথায় আসছে, তুমি টাকাটা নিয়ে নাও।"

লোকটা বুঝতে না পেরে বললেন, "আমি লক্ষ লক্ষ টাকার ভার সহ্য করতে পারি, আমার কোন ব্যাপার নেই আর আপনি কী বলছেন ?"

“তোমার মাথা খুব বড়, তুমি সব নিতে পার কিন্তু আমার মাথা ছোট, আমি এত ঝামেলা সহ্য করতে পারি না। বাবা, তুমি আমাকে রেহাই দাও, টাকাটা নিয়ে নাও। আসছি।” টাকা ফেরৎ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

এইটা বৈষ্ণবতা আর এইভাবে আমাদেরও বৈষ্ণবতা আসতে হবে। “আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি না হব আমি।”

বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপাময়। আমাদের অনেক সময় বিষয়ের অভিমান, কারও টাকার অভিমান, ঘরের অভিমান, আমি যে বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছি, আমি যে আচার্য্য হয়ে গিয়েছি—এই রকম অভিমান থাকে। এই অভিমানটা আমার কবে যাবে? সেই অভিমানকে আমাদের ছাড়তে হবে। বৈষ্ণব ঠাকুরের কাছে এসে তাঁকে একটাকা ছুঁড়ে দিলে বৈষ্ণবসেবা হয় না। নিজে বৈষ্ণব না হয়ে বৈষ্ণব সেবা হবে না।

আমি দেখেছি যে অনেকেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মন্দিরের ভিতরে গিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সামনে যান—কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে পণ্ডু মহাপ্রভুর পায়ের পাদুকা সবাইকে মাথায় ঠেকছেন আর বলছেন যে, একবার মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে গেল! আসল কৃপা লাভ করা এত সহজ নয়। আর অনেকেই মন্দিরে এসে শীঘ্র করে ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কা দিয়ে ঠাকুরের সামনে যান—ভিড়ের মধ্যে অনেক সিনিয়ার বৈষ্ণবগণ আছে কিন্তু অনেকেই তাঁদের সামনে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করেন। আপনারা কি ভাবছেন যে, ভগবানকে পিছন থেকে প্রণাম করলে তিনি আপনাদেরকে দেখতে পাবেন না? সমস্ত বৈষ্ণবগণের মাথার উপরে সামনে গিয়ে প্রণাম করা দরকার নেই। বৈষ্ণব হতে হলে দৈন্য আসতে হবে, সহিষ্ণুতা আসতে হবে এবং অপরকে সম্মান দিতে শিখতে হবে।

তাই বৈষ্ণব ঠাকুরের কাছে এসে আমাদের অকপটভাবে হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করতে হবে : “হে বৈষ্ণব ঠাকুর! তুমি আমাকে কৃপা কর আমি যেন তোমার সেবা করতে পারি, যেন আমি সমস্ত অভিমান ছেড়ে দিয়ে কোন দিন তোমার সেবা অধিকার লাভ করব।”

জয় শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কি জয়

শ্রীসমুদ্রগড়

শ্রীকোলদ্বীপধাম পরিক্রমার দ্বিতীয় ভাগ (পশ্চিম দিকে) আমরা সাধারণভাবে পরিক্রমার চতুর্থ দিনে করি। প্রতি বছরের মত এই বছরেও আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কপায় আমাদের পরিক্রমার শেষ দিনে শ্রীকোলদ্বীপে আবার প্রবেশ করে এখন শ্রীসমুদ্রগড়ে এসেছি। এখানে দ্বারকা ধাম ও গঙ্গাসগর নিত্যকাল বিরাজ করেন।

পূর্ব্ব যুগে এই স্থানে এক রাজা বসবাস করতেন, তাঁর নাম ছিল রাজা শ্রীসমুদ্রসেন। বড় রাজা হয়েও তিনি বড় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং সব সময় কৃষ্ণের চিন্তা করতেন, তার ছাড়া তিনি কিছু জানতেন না। এক দিন রাজ্য বিজয় করবার জন্য ভীমসেন এখানে এসেছিলেন। এসে ভীমসেন ও তাঁর সৈন্যগণ সমুদ্রগড় ঘিরিলেন তবু রাজা সমুদ্রসেন বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি জানলেন যে, কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রভু ও পরম বন্ধু, তাই পাণ্ডবগণ যদি বিপদে পড়বেন, তাহলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁদেরকে উদ্ধার করবার জন্য আসবেন। সেইজন্য রাজা ভাবলেন, "যদি আমি ভীমে ভয় দেখাব, তাহলে ভীমের প্রার্থনা শুনে ভগবান্ আমার দেশে আসবেন। তখন এই দীন-অধম দাস তাঁর দর্শন পেতে পারবে।" সুতরাং ভগবানের চিন্তা করতে করতে রাজা তাঁর হাতি, ঘোড়া, সৈন্য নিয়ে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। যুদ্ধ করতে করতে শেষ পর্যন্ত রাজার উদ্দেশ্য সফল হয়ে গিয়েছিল—ভীম বড় ভয় পেয়েছিলেন। কোন উপায় না দেখে ভীম কৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "প্রভু তুমি আমাকে রক্ষা কর ! আমি এই যুদ্ধ জয় করতে পারছি না, হারাতেও পারছি না ! যদি আমি হেরে যাব, এত লজ্জা আমি সহ্য করতে পারব না।"

পাণ্ডবের নাথ শ্রীকৃষ্ণ ভীমের কান্নাকাটি শুনে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। তখন একটা অপূর্ব্ব ঘটনা হয়েছিল—রাজা শ্রীসমুদ্রসেন

তখন শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর সুশোভিত রূপ দেখতে পেলেন, তিনি ছাড়া ভগবানকে আর কেউ দেখতে পারলেন না। কৃষ্ণের রূপ দেখলে প্রেমাবেশে প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে রাজা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে প্রভু, তুমি কৃষ্ণ জগন্নাথ পতিতপাবন পতিত দেখিয়া মোরে তব আগমন ! সর্ব্ব জগৎ তোমার গুণ কীর্ত্তন করে এবং তোমাকে স্বচক্ষে দেখলে আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু প্রভু আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যত পর্যন্ত তুমি এই নবদ্বীপধামে না আসবে, তত পর্যন্ত আমি অন্যত্র কোন দেশে যাব না । হে দয়াময় ! তুমি কি আমার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ করেছ কিন্তু আমার গূঢ় ইচ্ছা যে, তুমি গৌরাঙ্গ রূপ আমাকে দর্শন দেবে।" এই কথা বলে রাজাকে হঠাৎ করে তাঁর সামনে প্রথম বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণ-লীলা দেখালেন আবার তারপর 'রসরাজ-মহাভাব' গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিগূঢ় রূপ দেখেছেন। নিমাই বিশ্বম্ভর ভক্তগণের সঙ্গে নেচে নেচে মহাসঙ্কীরতন করছিলেন। কিছু ক্ষণ পরে ভগবান্ অদৃশ্য হয়েছিলেন এবং সব কিছু আবার স্থির হয়ে গেল। রাজা ক্রন্দন করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ভীমসেন রাজার কান্নাকাটি দেখলে (এবং তার কারণ বুঝতে না পেরে কেননা তিনি ভাগবানকে দেখেছিলেন না) অবাক হয়ে ভাবলেন, রাজা ভয় পেয়ে গিয়েছেন। ভীম যুদ্ধ আবার আরম্ভ করলেন, এবার রাজা অনায়াসে ভীমকে যুদ্ধ জয় করতে দিলেন আর রাজার কর (খাজনা) পেয়ে ভীম খুশি হয়ে এখান থেকে চলে গেলেন। ওই সময় থেকে সমস্ত জগৎ ভীমের গুন মহিমা করেন তাঁকে দিগ্বিজয় নামে বলে ডাকে।

এই সমুদ্রগড় শ্রীনবদ্বীপধামের সীমায় উপস্থিত আছে, এই স্থানের মহিমা স্বয়ং ব্রহ্মাও জানেন না। এক সময় সমুদ্র এখানে এসে গঙ্গদেবীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করলে ভক্তগণের সেবা করতে লাগলেন। গঙ্গদেবী সমুদ্রকে বললেন, "প্রভু, অতি শীঘ্রই আমার প্রভু এসে তোমার তীরে থাকবেন।" সমুদ্র উত্তরে বললেন, "হে দেবী ! আমি কিছু বলব? শচীনন্দন গৌর হরি কখনও নবদ্বীপ ছেড়ে দেন না। যদিও প্রভু কিছু

দিন ধরে আমার তীরে থাকবেন, তিনি আসলে নদীয়ায় অপ্রকটভাবে সব সময় থাকেন। সর্ব্ব বেদে বলে যে, মহাপ্রভুর নিত্যলীলা শ্রীনবদ্বীপধামে নিত্যকাল ধরে চলছে। হে দেবী, আমি তোমার আশ্রয় লয়ে এখানে থাকব।” সেটা বলে সমুদ্র নবদ্বীপধামে থাকলেন এবং এখন পর্যন্ত এখানে এই সমুদ্রগড়ে বসে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্যলীলার ধ্যান করছেন।

এই গুণ-মহিমা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে বলে দিয়েছিলেন এবং আমরা এসব কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায় শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে দেখতে পাই। সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য।

জয় শ্রীসমুদ্রগড় কি জয়
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কি জয়
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা পালনকারী ভক্তবৃন্দ কি জয়

শ্রীচাঁপাহাটি

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা শ্রীসমুদ্রগড় থেকে এগিয়ে গিয়ে এই অতি মনোরম স্থানে এসেছি—এটা হচ্ছে শ্রীদ্বিজ-বাণিনাথ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মন্দির। মহাপ্রভুর সময় শুধু তিন জায়গায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ছিল—চাঁপাহাটিতে শ্রীদ্বিজ-বাণিনাথ প্রভুর শ্রীগৌরগদাধর সেবিত বিগ্রহ, কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সেবিত বিগ্রহ এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ধামেশ্বর মহাপ্রভু সেবিত বিগ্রহ। পাঁচশ বছরের উপরে এই তিনটা বিগ্রহ শ্রীনবদ্বীপধামে বিরাজ করে।

যখন শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে এখানে এসে তিনি তাঁকে এই স্থানের মহিমা বর্ণনা করেছিলেন :

আগের যুগে এই স্থানে খদিরবন ছিল। এই সুন্দর চম্পক-বনে চম্পকলতা সখী চম্পক ফল তুলে নিয়ে মালা করতেন। এই মালা দিয়ে রাধা-কৃষ্ণের নিত্য সেবা করতেন। যখন কলি যুগ এল, তখন মালিগণ এই চম্পক-বনে এসে ফুল সংগ্রহ করতে লাগলেন—একটু পাশে হট্ট স্থাপন করলে তারা চম্পক ফুল সেখানে বিক্রি করতেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম হয়েছিল শ্রীচম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটি।

প্রচুর বছর আগে যে সময় শ্রীলক্ষ্মণসেন শ্রীনবদ্বীপধামে (নদিয়ায়) রাজা ছিলেন, সে সময় তাঁর প্রজার মধ্যে একজন জয়দেব গোস্বামী নামে এখানে বাস করতেন। জয়দেব গোস্বামীর কুটির ছিল বল্লালদীর্ঘিকাকূলে (গঙ্গানগরে, মায়াপুরে), তিনি সেখানে তাঁর সহধর্মিণী পদ্মাবতীর সঙ্গে বাস করতেন। বড় কবি হয়ে তিনি এই শ্রীনবদ্বীপধামে অনের কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর মধ্যে তাঁর রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ ও দশ-অবতার স্তোত্র কবিতা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

অনেকেই এই চাঁপাহাটিতে এসে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর কথা স্মরণ করতে তাঁর গীতগোবিন্দ কীর্ত্তন করেন কিন্তু আমরা সেটা কখনও করি না। আমরা গীতগোবিন্দের "দেহি পদপল্লবমুদারম্" শ্লোক ও জয়দেব-পদ্মাবতীর কথা বলি কিন্তু ওই জয়দেবের বিরহের কথা কাকে বলব, কাকে শুনাব? কে সেটা বুঝতে পারবে, বলুন?

আসলে জয়দেব গোস্বামী গীতগোবিন্দ রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন অন্য জায়গায় নবদ্বীপে কিন্তু ওখানে তিনি তাকে শেষ করতে পারলেন না। পরে তিনি এই চাঁপাহাটিতে এসে গীতগোবিন্দকে শেষ করেছিলেন।

এক দিন চাঁপাহাটিতে বসে গীতগোবিন্দ রচনা করতে গিয়ে তিনি ভুলে গিয়েছেন পরের লাইনটা কী হবে। মনে কিছু রাখল না। শ্লোকটা লিখতে না পেরে তিনি পদ্মাবতীদেবীকে বললেন, "আমি গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছি, আমার জন্য প্রসাদ ব্যবস্থা করে রাখ।"

কিছু ক্ষণ পর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে জয়দেব গোস্বামী সেজে চলে এসে বললেন, "পদ্মাবতী, প্রসাদ হয়েছে?"

"হ্যাঁ, তুমি বলেছ স্নান করলে এসে প্রসাদ পাবে—প্রসাদটা পেয়ে নাও।"

প্রসাদ পেলে তখন তিনি কী করলেন? জয়দেব গোস্বামী যেখানে বসে গীতগোবিন্দ রচনা করছিলেন, ভগবান্ সেই ঘরে ঢুকে গিয়ে গীতগোবিন্দের শ্লোকটা শেষ করলেন আর তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

একটু পরে আসল জয়দেব গোস্বামী বাড়ি এসে বললেন, "পদ্মাবতী, আমার প্রসাদ কোথায়?"

পদ্মাবতী দেবী অবাক হয়ে বললেন, "কী বলছ? তুমি তো এই মাত্র প্রসাদ পেয়ে আবার ঘরে ঢুকলে। ঢুকে তুমি কী লেখা লিখি করেছ?"

জয়দেব গোস্বামী কিছু বুঝতে পারলেন না, বললেন, "সে কী? আমি ত আসি নি এখনই!"

তখন ঘরের মধ্যে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, ওই লেখা "দেহি পদপল্লবমুদারম্" ("তোমার শ্রীচরণকমল আমার মস্তকে বিন্যস্ত

কর”) সেখানে পড়ে আছে। এই কথা ভগবান্ নিজে এসে লিখে দিয়ে চলে গেলেন। রাধারাণীর সম্বন্ধে কি লিখতে হবে—কৃষ্ণ নিজেই সেইটা লিখে দিয়েছেন ! যে জয়দেবেরও লিখতে সাহস ছিল না, সেটা কৃষ্ণ নিজে এসে লিখে দিয়েছেন।

আবার যখন তিনি দশ-অবতার স্তোত্র রচনা করেছিলেন, তখন ত রাজা শ্রীলক্ষ্মণসেন পড়ে খুব আনন্দিত হয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এই কবিতা কার ? কে এটা লিখেছেন ?” লোকটি রাজাকে বললেন যে, কবিতাটা জয়দেব গোস্বামী রচনা করেছিলেন। উত্তেজিত হয়ে রাজা জয়দেব গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করলেন।

এক রাত্রে রাজা গোপনে জয়দেব গোস্বামীর কুটির খুঁজে বের করে ভিক্ষুক বৈষ্ণবের পোশাক পরে সেখানে এসে হাজির হলেন। জয়দেব গোস্বামী বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি রাজা ছিলেন কিন্তু তাঁকে কিছু প্রথম বললেন না। কিছু ক্ষণ পর রাজা তাঁর পরিচয় দিয়ে জয়দেব গোস্বামীকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। বিরক্ত হয়ে জয়দেব তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন না।

জয়দেব গোস্বামী বললেন, “আমি বিষয়ীর গৃহে যেতে চাই না ! যদি তুমি ভাবছ আমি তোমার প্রজা, তাই তুমি আমাকে আজ্ঞা দিতে পার, তাহলে আমি তোমার দেশ ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় যাব। বিষয়ীর সঙ্গ কখনও মঙ্গল আনবে না। বরং আমি নীলাচলে যাব।”

তাঁর কথা শুনে রাজা আকুল হয়ে বললেন, “দয়া কর নবদ্বীপ ছেড়ে যাও না ! প্রভু, তুমি যদি এখানে আর থাকতে চাও না, তাহলে গঙ্গার অপর তীরে একটা ছোট্ট কুটির চাঁপাহাটি গ্রামে আছে—কৃপা কর তুমি সেখানে বাস করতে পার। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি তোমার আদেশ ছাড়া সেখানে যাব না। যত পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে না, তত পর্যন্ত আমি তোমার চরণের দর্শন পাব না।”

রাজার দৈন্য দেখে তাঁর কোমল কথা শুনে জয়দেব গোস্বামী বললেন, “তাই হবে। বিষয়ী রাজা হয়েও তুমি তবু কৃষ্ণভক্ত। তোমার কোন সংসারের প্রতি আসক্তি নেই। আমি তোমাকে বিষয়ী বলে

ডেকেছি পরীক্ষা করবার জন্য কিন্তু তোমার অহংকার নেই—তুমি এটা শুনে আমার কথা চুপ করে সহ্য করেছ। সেইজন্য আমি বুঝতে পারি যে, তুমি কৃষ্ণ ভক্ত। আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছি—চাঁপাহাটিতে গিয়ে থাকব আর তুমি সমস্ত বাদশাহী ঐশ্বর্য ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে গোপনে আসতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই।”

তখন রাজা চাঁপাহাটিতে ছোট্ট কুটির নির্মাণ করে দিলেন এবং জয়দেব গোস্বামী সেখানে বসে ভজন করতেন।

প্রতি দিন পদ্মাবতীদেবী অনেক চম্পক ফুল তুলে জয়দেব গোস্বামীকে দিতেন। তিনি ওই ফুল দিয়ে ভগবানের পূজা করতেন। এক দিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দয়া করে জয়দেব গোস্বামী ও পদ্মাবতীদেবীর সম্মুখে এসে নিজের জ্যোতির্ময় চম্পকবর্ণ রূপে দর্শন প্রদান করলেন। এই অপূর্ব্ব রূপ দেখে কাঁদতে কাঁদতে জয়দেব গোস্বামী ও পদ্মাবতীদেবী একবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। দুজন ভক্তকে কোলে নিয়ে ভগবান্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বললেন, “তোমরা উভয় আমার প্রিয় ভক্ত। অতি শীঘ্রই আমি এই নবদ্বীপে শচীগর্ভে অবতীর্ণ হব। আমি হরিনাম বিতরণ করে সর্ব্ব পৃথিবী নিস্তার করব আর চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে বাস করব। সেখানে গিয়ে ভক্তের ঐকান্তিক ভাব আস্বাদন করে আমি বিশেষভাবে তোমার রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ ভক্তগণের সঙ্গে রসাস্বাদন করব। তোমরা আমার খুব প্রিয় ভক্ত হয়ে দেহ ত্যাগ করবার পর এই চিন্ময় শ্রীনবদ্বীপধামে আসবে। কিন্তু এখন তোমরা কাজ কর—তোমরা দুজন নীলাচলে যাও, সেখানে গিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করলে তোমরা প্রেম লাভ করবে।”

এটা বলে মহাপ্রভু অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। ভগবানকে আর দেখতে না পেরে জয়দেব ও পদ্মাবতী ক্রন্দন করতে লাগলেন। বিরহের জ্বালায় পীড়িত হয়ে পড়ে তাঁরা বিলাপ করলেন, “হায় হায় ! আমাদের এখন কী হবে ? প্রভুকে দেখতে না পেরে কি করে আমরা বেঁচে থাকব ? তদুপরি কি করে আমরা এই নবদ্বীপ ছেড়ে দিয়ে নীলাচলে চলে যাব ? আমাদের নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হয়েছে ! আমরা যদি পাখি বা

পশুর মত জন্ম গ্রহণ করব, সেটাই এর চাইতে ভালো হবে ! আমরা প্রাণ ছাড়তে পারি কিন্তু নবদ্বীপধাম কখনও ছাড়তে পারব না ! হে ভগবান্ ! দয়া কর তুমি আমাদেরকে এখানে তোমার শ্রীচরণে রাখ !”

এভাবে কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা হঠাৎ করে আকাশ থেকে দিব্যবাণী শুনতে পেলেন, “তোমরা দুঃখ কর না। নীলাচলে গিয়ে আমার কথা মনে রাখ। তোমরা আগে নীলাচলে যেতে মনে করলে, তাই জগন্নাথ তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদের সাক্ষাৎ করতে চান, তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে খুশি কর। আর যখন তোমরা যথাসময়ে দেহ ত্যাগ করবে, তখন তোমরা আবার এই নবদ্বীপে ফিরে এসে এখানে নিত্যকাল থাকবে।”

এই দিব্যবাণী শুনে এবং ভগবানের আদেশ উপেক্ষা করতে না পেরে জয়দেব গোস্বামী ও পদ্মাবতীদেবী দেরি না করে চলে গেলেন নীলাচলে। হাঁটতে শুরু করলে তাঁরা মাঝে মাঝে পিছনে ফিরে নবদ্বীপের দিকে তাকিয়ে আবার ক্রন্দন শুরু করলেন। দূর থেকে তাঁরা নবদ্বীপবাসীগণকে দুঃখ করে বললেন, “তোমরা আমাদের দুজনের প্রতি কৃপা কর ! আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।” হেঁটে হেঁটে তাঁরা সব সময় পিছনে ফিরে প্রিয় নবদ্বীপধামের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। যখন তাঁরা নবদ্বীপ আর দেখতে পারলেন না, তখন তাঁরা ক্রন্দন করতে করতে গৌড়দেশ পার করে কিছু দিন পরে নীলাচলে এসেছিলেন। জগন্নাথদেবের দর্শন পেয়ে তাঁরা আবার প্রাণ পেয়েছেন।

সেটা হচ্ছে জয়দেব গোস্বামীর কথা। এই চাঁপাহাটি গ্রাম একটা উঁচু জায়গায় আছে—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে বললেন যে, এই স্থানে জয়দেব গোস্বামীর কুটির উপস্থিত আছে।

আর একটা কথা হচ্ছে দ্বিজ-বাণীনাথের সম্বন্ধে। দ্বাপরযুগে (কৃষ্ণলীলায়) দ্বিজ-বাণিনাথ প্রভু কৃষ্ণের সাথে লীলা করতেন—তিনি কামলেখা নামক একজন গোপী ছিলেন।

তার আগে সত্যযুগে একজন ব্রাহ্মণ এখানে বাস করতেন। ওই ব্রাহ্মণ প্রতি দিন এই চাঁপা বাগানে আসতেন এবং চাঁপা ফুল তুলে

দিয়ে রাধাগোবিন্দের সেবা করতেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন কী করেছেন? আসলে ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ভালো দামী খাবারের দরকার নেই—ভগবান্ বলেন, "আমাকে কেউ যদি এক ফোঁটা গঙ্গা-জল আর তুলসী-পাতা দিয়ে আমার পূজা করে আমি খুব খুশি হয়ে যাই।" তাই সেই ব্রাহ্মণ যে ফুল দিয়ে সেবা করতেন, তাতে ভগবান্ খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এক দিন যখন ওই ব্রাহ্মণ অর্চ্চন-ধ্যান করছিলেন, তখন কৃষ্ণের ইচ্ছা ছিল তাঁর সামনে নিজের রূপ প্রকাশ করতে, তিনি ভাবলেন "এই ব্রাহ্মণ আমার এত সেবা করেছেন, আমি তাঁকে একটু দর্শন দেব।" যখন ব্রাহ্মণ ইষ্টদেবের শ্যামসুন্দরদেবের ধ্যান করছিলেন তখন কৃষ্ণ তাঁকে চাঁপা-দ্যুতির রূপে (গৌরসুন্দরের রূপে) দর্শন দিয়েছিলেন।

ভগবান্ বললেন, "তুমি যে রূপে আমাকে এখন দেখছ, সেই রূপে আমি কলিযুগে অবতীর্ণ হইব।" এই কথা বলে মহাপ্রভু অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণ তখন সব সময় দুঃখ করে ভাবতে থাকলেন, "প্রভু, আমি কত দিন বাঁচব? আমি কলিযুগ পর্যন্ত থাকব কি না?"

তাঁর মনের কথা শুনে ভগবান্ অন্য দিন এবার স্বপ্নে তাঁর কাছে এসে বললেন, "তুমি বেঘোর হয়ে যাও না, ক্রন্দন কর না! আমি কলি যুগে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে আসব। তখন তুমিও এই চাঁপাহাটি-গ্রামে আবির্ভূত হইবে।"

তারপর ওই ব্রাহ্মণ এই কলিযুগে দ্বিজ-বাণিনাথরূপে আবির্ভূত হলেন। এই দ্বিজ-বাণীনাথ প্রভু শ্রীগৌরগদাধরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিছু দিন পর ওর সেবা আস্তে আস্তে বন্ধন হয়ে গিয়েছিল—প্রায় একশ বছর আগে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই বিগ্রহের সেবা ভার নিয়েছিলেন এবং ওই সময় থেকে এই মন্দিরে সেবা যথাযথভাবে চলছে। এই মন্দিরের প্রকাশের ইতিহাস আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'সরস্বতী-জয়শ্রী' গ্রন্থে দেখতে পাই। নিম্নে আমরা জগতের মঙ্গলের জন্য সেই প্রবন্ধটা উদ্ধৃতি করি।

জয় শ্রীচাঁপাহাটি কি জয়। জয় শ্রীশ্রীগৌরগদাধর কি জয়

শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাধরের লুপ্ত-সেবা-উদ্ধার

বর্ত্তমান সময় হইতে ন্যূনাধিক চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীমৎ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য দ্বিজ-বাণীনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সমুদ্রগড় ডাকঘরের নিকটবর্ত্তী চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটি-গ্রামে শ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে বৎসর (ফাল্গুন, ১৩২৬ ; মার্চ্চ, ১৯২০) শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার প্রথম পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন, সেই বৎসর চারিদিন মাত্র পরিক্রমা হইয়াছিল ; কিন্তু যাহাতে পর বৎসরে সকলে নবদ্বীপের সমস্ত স্থান পরিক্রমা করিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে শ্রীল প্রভুপাদ পরিক্রমার পথ-সমূহ আবিষ্কারের জন্য ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত চম্পহট্টে কএকজন ভক্তের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন দ্বিজ-বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন চারিশত বৎসরের সেবা ও মন্দিরের দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হয়।

প্রমাণাকার শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমূর্ত্তি পরিত্যক্ত ও অনাবৃতভাবে সেবাবিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকে সর্প, শিবা, ব্যঘ্র, কুক্কুর প্রভৃতি জন্তুর সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সাধ্য কি যে, দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভেদ করিয়া কেহ সেখানে প্রবেশ করে ! জনৈক মৎস্য-মাংসাশী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সেবাইত হয় ত' কোন দিন তাঁহার অবসর ও ইচ্ছা হইলে দিবালোকের সময় শ্রীবিগ্রহকে কিছু মুড়ি বা চিড়া ভোগ দিয়ে যাইতেন ! যে-স্থানে একদিন শ্রীজয়দেব "মধুর কোমলকান্ত পদাবলী" গান করিয়াছিলেন—যে-স্থানে একদিন ব্রহ্মা-শিবাদির আকাঙ্ক্ষিত শ্রীগৌরপদাঙ্ক রজোভিষেক করিয়াছেন—যে-স্থানে একদিন দ্বিজ-বাণীনাথ শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর গুণ গান করিতে করিতে ভুবন-মঙ্গল বিধান করিতেন, সেই স্থানের এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়ে প্রভুপাদ অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ চম্পহট্ট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পর কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াই

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রমুখ কএকজন প্রচারককে চাঁপাহাটিতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সমুদ্রগড়-ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পদব্রজে গমন করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরে চাঁপাহাটিতে পৌঁছেন এবং লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে জঙ্গলের ভিতর দিয়া অনেক কষ্টে দ্বিজ-বাণীনাথের প্রাচীন সেবার স্থানে উপনীত হন। তাঁহারা বহুকালের পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ দুইটি পূর্ব্বাভিমুখী ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ এবং উহার উত্তরের ঘরে প্রমাণাকার শ্রীমূর্ত্তি-দ্বয় দর্শন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কিছুদিন পূর্ব্বে এই শ্রীমূর্ত্তিযুগল দর্শন করিয়াই “শ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীমূর্ত্তি” বলিয়া জানাইয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের গৃহটি পোকা-মাকড়ের রাজত্বে পরিণত ও ‘ঝুলে’র দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আর পার্শ্বের গৃহে কতগুলি পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ড এবং বারান্দায় মৎস্যের বহুকাল-সঞ্চিত শল্করাশি (আঁইশ-সমূহ) স্তূপাকৃত হইয়া রহিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া গেল, মাম্‌গাছি-গ্রামের জনৈক অধিবাসী সেবাইত সপ্তাহে দুই একদিন কিছু চিড়া, মুড়ি লইয়া তথায় আসেন এবং ঠাকুরের নাম-মাত্র ভোগ লাগান। যে-দিন তিনি এই উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকেন, সে-দিন পার্শ্বের গৃহে মৎস্যাদি রন্ধন করিয়া বন-ভোজন করিয়া যান !

শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ এবং তাঁহার সঙ্গী অতুল বাবু চাঁপাহাটি ও সমুদ্রগড়ের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দ্বিজ-বাণীনাথের সেই প্রাচীন সেবা উদ্ধারের কথা জানাইলে ঐ দিবস সন্ধ্যায় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীগৌর-গদাধরের স্থানের সংলগ্ন জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের মুখে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা ঐ সেবা-উদ্ধারের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং সেই সভায় আগত পূর্ব্ব সেবাইত ও গ্রামবাসী সকলেই শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের সেবাভার এবং সেবার যাবতীয় উপকরণ রেজিষ্ট্রি-দলিল-যোগে শ্রীচৈতন্যমঠের অধিকারে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পরদিন শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বহুকাল অনাদৃতভাবে পরিত্যক্ত শ্রীগৌর-গদাধর-

শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের শ্রীঅঙ্গ স্বহস্তে মার্জ্জন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নূতন বস্ত্র পরাইয়া নানাবিধ উত্তম নৈবেদ্য ভোগ দিলেন। তখন হইতেই শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের দ্বারা যথাশাস্ত্র শ্রীগৌর-গদাধরের সেবা চলিতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ও ইচ্ছাক্রমে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পুনরায় দুইজন ব্রহ্মচারীর সহিত চাঁপাহাটিতে অবস্থান-পূর্ব্বক গ্রামের বালক ও কৃষাণগণের দ্বারা এই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়াছিলেন এবং ঠাকুর-বাড়ীর সীমানায় অবস্থিত মাটির দেওয়ালযুক্ত ছাউনী-বিহীন খড়ের ঘরটি সংস্কার করিয়া তথায় পাঠ, কীর্ত্তন ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে এই সেবার উন্নতি হইতে থাকিল। সেবার আরও ঔজ্জ্বল্যের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুকে তথায় নিযুক্ত করিলেন। প্রভুপাদের আদেশে শ্রীচৈতন্যমঠের বিশিষ্ট সেবকরূপে শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু চাঁপাহাটির সেবার বিশেষ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তনয়নমনোভিরাম শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমূর্ত্তি ও সেবাপারিপাট্য-দর্শনে কেবল যে গ্রামবাসী সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন, তাহা নহে, বিশ্ববাসী পরিক্রমাকারী ভক্তগণও সেই সেবার ঔজ্জ্বল্য দর্শন করিয়া এবং উক্ত সেবায় যোগদান করিয়া পারিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিলেন।

তৃতীয়বার নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে (বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ২৫শে ফাল্গুন, একাদশী তিথি দিবস) ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন প্রভুপাদের আদেশে পরিক্রমাকারীগণের থাকিবার অনেকগুলি সাময়িক বিশ্রামাগার নির্ম্মিত হয়। এখানে প্রচারকগণ দুই দিন অবস্থান করিয়া অনর্গল হরিকীর্ত্তন ও পাঠ, বক্তৃতাদি দ্বারা হরিকথার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

দশাবতারস্তোত্রম্ (শ্রীজয়দেবপ্রভু বিরচিত)

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং বিহিত-বহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১॥
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে ধরণিধরণকিনচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥২॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৩॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৪॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন পদনখনীরজনিতজনপাবন ।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৫॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং ।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৬॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং দশমুখমৌলিবলিং রমনীয়ম্ ।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৭॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং ।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৮॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৯॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১০॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥১১॥
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে ।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥১২॥

শ্রীঋতুদ্বীপ

— অর্চ্চনম্ —

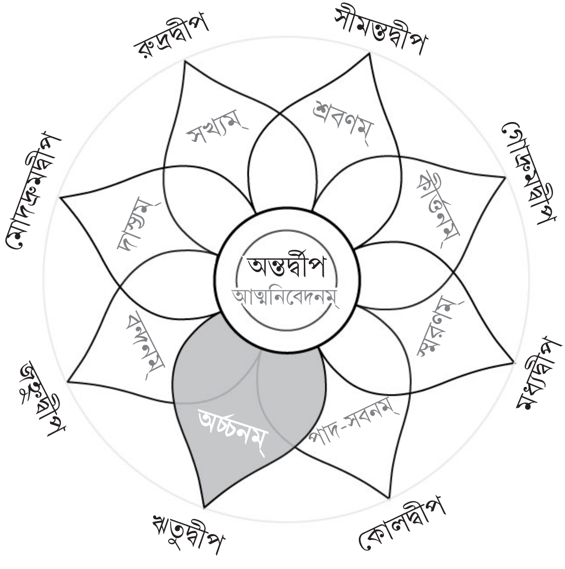
রুদ্রদ্বীপ
সীমন্তদ্বীপ
মোদদ্রুমদ্বীপ
গোদ্রুমদ্বীপ
সখ্যম্
শ্রবণম্
দাস্যম্
কীর্ত্তনম্
অন্তর্দ্বীপ
আত্মনিবেদনম্
বন্দনম্
স্মরণম্
জহ্নুদ্বীপ
মধ্যদ্বীপ
অর্চ্চনম্
পাদ-সবনম্
ঋতুদ্বীপ
কোলদ্বীপ

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন ।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন ।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন ॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ-কানন ।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ॥
শ্রীনন্দ যশোদা জয়, জয় গোপগণ ।
শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনুবৎসগণ ॥
জয় বৃষভানু, জয় কীর্ত্তিদা সুন্দরী ।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীর নাগরী ॥
জয় জয় গোপেশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ ॥
জয় রাম ঘাট, জয় রোহিনীনন্দন ।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন ॥
জয় দ্বিজপত্নী, জয় নাগকন্যাগণ ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দ চরণ ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম ।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্ব মনোরম ॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরসসার ।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার ॥
শ্রীজাহ্নবা পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম সংকীর্ত্তন ॥

শ্রীঋতুদ্বীপ

শ্রীচাঁপাহাটি গ্রাম কোলদ্বীপ ও ঋতুদ্বীপের মাঝখানেতে উপস্থিত আছে, তাই আমরা শ্রীদ্বিজ-বাণীনাথ মন্দির থেকে পরিক্রমার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীঋতুদ্বীপ প্রবেশ করেছি। যে ছয় ঋতু আছে (বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত), সব ঋতু একসঙ্গে এখানে বিরাজ করে, সেইজন্য এই দ্বীপের নাম হচ্ছে শ্রীঋতুদ্বীপ। এই দ্বীপের ভক্তির প্রকার হচ্ছে অর্চন।

যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এখানে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু এবং আর কয়েকজন ভক্তগণের সঙ্গে এসেছিলেন, তখন তিনি এই মনোরম দ্বীপ দেখে একবার মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এখানে পরিবেশ ব্রজধাম থেকে অভিন্নরূপে খুব সুন্দর ও মধুর—বৃক্ষ, বাতাস, ফুল, ভৃঙ্গ, ইত্যাদি। এই জায়গায় এসে আমাদের শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভুর বিরচিত একটি শ্লোক মনে পড়ে যে আমরা শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীমুখে শুনেছি :

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে,
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে,
নৃত্যতি যুবতীজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

“সখি গো! বসন্ত সমাগমে মলয়ানিল-সম্পর্কে কোমল লবঙ্গলতিকার কেমন মনোরম দৃশ্য হইয়াছে ; মধুকর-নিকরের মধুর গুঞ্জনে ও কোকিলকুলের কুহুরকে নিকুঞ্জ কুটীরে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে ; এইরূপ সরস বসন্তে শ্রীহরি যুবতীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ; হায়! দুরন্ত বসন্ত ঋতু বিরহিণীগণের কি যাতনাপ্রদ!”

এই ভাবের প্রভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এই মনোরম ঋতুদ্বীপে এসে একবার বিরহ জ্বালায় বলতে লাগলেন : “এস! এস! আমার

শৃঙ্গ শীঘ্র করে নিয়ে এস ! বৎসগণ দূরে গিয়েছে আর কানাই এখন শিশুর মত ঘুমিয়ে আছে ! কোথায় সুবল ? কোথায় শ্রীদাম ?” তাঁর দিব্য অবস্থা দেখে ভক্তগণ তখন তাঁকে বললেন, “হে নিতাই, তোমার ভাই গৌরচাঁদ এখানে নেই ! আমাদেরকে কাঙ্গাল করে তিনি সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচল চলে গিয়েছে !” তাঁদের কথা শুনে নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দ সব চলে গেল—ভূমিতে পড়ে গিয়ে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন, “হায় হায় ! কানাই আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে নীলাচলে গিয়েছে ! আমি জীবন আর রাখতে পারি না—আমি যমুনায় ঝাঁপ দেব !” বিরহের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নিত্যানন্দ প্রভু অজ্ঞাত হয়ে পড়লেন। অনেক সময় হয়ে গিয়েছিল, নিতাই উঠছেন না—যখন অবশেষে ভক্তগণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করলেন, তখন নিতাই একবার উঠে সবাইকে বললেন, “এটা রাধাকুণ্ড আর ওখানে দেখ শ্যামকুণ্ড। এখানে আমার গৌর ভক্তগণের সঙ্গে কীর্ত্তন করতেন। এই স্থান-সম ত্রিভুবনে নেই। যে ভক্ত এখানে বাস করে, তাঁরা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন এবং তাঁদের মন-প্রাণ সুশীতল হয়।”

করাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত, যামুনতীর ॥
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা ॥
বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর।
বৃন্দাবনতরু-লতিকা-বানীর ॥
খগমৃগকুল, মলয়-বাতাস।
ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী-বিলাস ॥
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা।
বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা ॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি ॥
এ সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাউঁ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাউঁ ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান !
তুয়া উদ্দীপক হামার পরাণ ॥

শ্রীবিদ্যানগর

আমাদের শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করতে করতে আমরা এখন শ্রীঋতুদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত শ্রীবিদ্যানগরে এসেছি। এই প্রাচীন নগরের মহিমা আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থে দেখতে পাই। এখানে এসে শ্রীমন্ননিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে বললেন :

প্রলয়ের (সৃষ্টিনাশের) সময় নিত্যধাম শ্রীনবদ্বীপ পদ্মরূপে থেকে কখনও বিনষ্ট হয় না—ওই সময় সমস্ত অবতার এবং ভাগ্যবান্ জীব এই নবদ্বীপধামে থাকেন। এই ঋতুদ্বীপের মধ্যে এই পরম পবিত্র স্থান শ্রীবিদ্যানগর নামে বিরাজ করে। এখানে ভগবান্ মৎস্যরূপে সমস্ত বেদ ধারণ করেন এবং সমস্ত ঋষি, মুনি, সমস্ত বিদ্যা এখানে থেকে বেদের আশ্রয় গ্রহণ করে এই স্থানে নাম দিয়েছেন বিদ্যানগর।

এক দিন যখন ব্রহ্মা আবার জগতকে সৃষ্টি মনে করলেন, তখন তিনি পূর্ব্ব বিশ্বের বিনাশ (প্রলয়) দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন আর ভগবান্ তাঁর প্রতি সদয়া হয়ে তাঁকে কৃপা প্রদান করেছিলেন। যখন প্রার্থনা করবার জন্য ব্রহ্মা মুখ খুলে দিলেন, তখন সরস্বতীদেবী তাঁর জিহ্বায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সরস্বতীদেবীর শক্তির প্রভাবে প্রার্থনা করতে করতে ব্রহ্মা বড় সুখ পেয়েছিলেন—ভগবানের কৃপায় জগতের সৃষ্টির সময় বিরজা-নদী-তীরে থেকে মায়া সর্ব্বদিক ঘেরিয়ে তাঁর তিনটি গুণের দ্বারা সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদন করেন। তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। তারপর অনেক ঋষিগণ জগতে এসে বিদ্যা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন— অর্থাৎ সরস্বতীদেবীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁরা অবিদ্যা জয় করে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যা শিখতে আরম্ভ করেন। ওই ঋষিগণের বাসস্থান এই শ্রীঋতুদ্বীপের মধ্যে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে। এইভাবে বাল্মীকি এখানে

কাব্য শেখেছেন, ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ, বিশ্বামিত্র ধনুর্ব্বিদ্যা, সনক, সনাতন, সনৎ, সনন্দ, ইত্যাদি এখানে বেদের মন্ত্রগুলো শিখেছেন। মহাদেবও এখানে তন্ত্রের শিক্ষা পেয়েছিলেন। এখানেও ব্রহ্মার শ্রীমুখে চতুর্বেদ প্রকাশিত হয়েছিলেন। কপিল মুনিও এখানে বাস করে ন্যায়-তর্ক শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পাতঞ্জলি, কণাদ ঋষি, জৈমিনি এখানে ও তাঁর যোগ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। বেদব্যাসও এখানে পুরাণাদি অনেক শাস্ত্র লিখেছিলেন। নারদ মুনিও এখানে পঞ্চরাত্র রচনা করেছিলেন। সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

এক দিন এই মনোরম স্থানে উপনিষদ্গণ গৌরভজন করতে করতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দিব্যবাণী আকাশে শুনেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁদেরকে বললেন, "ভুলসিদ্ধান্তের ধূলিকণা তোমাদের হৃদয় মলিন করেছে—শ্রুতিরূপে তোমরা আমাকে পাবে না কিন্তু যদি তোমরা আমার পার্ষদরূপ ধারণ করে জন্ম গ্রহণ করবে যখন আমি এই জগতে আমার লীলা প্রকাশ করব, তাহলে তোমরা নেচে নেচে আমার গুণ কীর্ত্তন করে আমার দর্শন পাবে।" এই কথা শুনে উপনিষদ্গণ এখানে বসে এই ধন্য কলিযুগের জন্য অপেক্ষা করে থাকলেন।

সেটা হচ্ছে এই শ্রীবিদ্যানগতের মহিমা। জয় শ্রীলগুরুমহারাজ কি জয়।

SREE MAHAPRABHU MANDIR

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জন্মভূমি

শ্রীবিদ্যানগরের অন্তর্গত আর একটা পূজনীয় তীর্থ আছে—শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহ। এখানে যাঁর মহিমা আপনারা সবাই প্রতি বছর শ্রীপুরীধামে শুনেন, সেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই ছোট মন্দির ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ এখানে মার্চ্চ ১৯৩৬ সালে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেইজন্য এখানে এসে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গুণমহিমা আনন্দ করে স্মরণ করতে সুযোগ পাই।

যখন দেবগুরু বৃহস্পতি শুনেছিলেন যে, ভগবান্ কলিযুগে মহাবদান্য গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়ে বিদ্যা-বিলাস করবেন (বিদ্যার

লীলা প্রকাশ করবেন), তখন ইন্দ্রদেবের সভা ছেড়ে দিয়ে বহু যত্ন করে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট বিধান করতে চেষ্টা করতে করতে তিনিও তাঁর শিষ্যগণের সঙ্গে এই জগতে বিভিন্ন স্থানে এসে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে। এই জগতে এসে বিরাট দেবগুরু বৃহস্পতির নাম হয়েছিল বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

এই বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্ব্বভৌম (বৃহস্পতি) বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেই জন্য তাঁর নাম হয়েছিল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। এক দিন তিনি ভাবলেন, "আমি এখন স্মরণশক্তি হারিয়ে গেলাম না কিন্তু কিছু দিন পরে বিদ্যাজালে ডুবে গিয়ে আমি সব ভুলে যাব।" তখন তাঁর মনে চতুর বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি ভাবলেন, "যদি আমি সত্যিকারের গৌরদাস, তাহলে আমার প্রভু আমাকে তাঁর কাছে অবশ্যই নিয়ে আসবেন।"সেইজন্য তিনি সমস্ত শিষ্যগণ বিদ্যানগরে রেখে দিয়ে নীলাচলে চলে গেলেন, তত্‌পর সেখানে গিয়ে তিনি মায়াবাদ শাস্ত্র প্রচার করতে লাগলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও একবার সেটা করেছিলেন। মহাপ্রভু (নিমাই বিশ্বম্ভর) শিশুকাল থেকে সব সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে অনেক সম্মান দিতেন, সব সময় তাঁকে প্রণাম করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন, ইত্যাদি। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর এটা একদম ভালো লাগত না। তিনি ভাবলেন, "আমি তাঁকে শিক্ষা দেব ! কি রকম তোমার চালাকি, সেটা আমি দেখব !"

এক দিন তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে দিয়ে শান্তিপুরে গিয়ে ভক্তির বিরুদ্ধে প্রচার করতে শুরু করলেন। যখন নিমাই ওই খবর পেলেন, তখন রেগে গিয়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে শাস্তি দিতে মনে করলে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে তখন শান্তিপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে দৌড়ে এসে নিমাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে অভিযুক্ত করলেন, "তুমি কী করছ, অদ্বৈত?! তুমি আমাকে গঙ্গা জল তুলসী-পাতা নিয়ে আহ্বান করলে এখন আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? কী ব্যাপার তোমার?" এটা বলে নিমাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে চড় মারতে

লাগলেন ! সীতা ঠাকুরাণী (অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর পত্নী) এটা দেখলে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বাবা, কী করছ তুমি? ওকে মেরে ফেল না ! ওকে মেরে ফেল না !"

এই ঘটনা দেখে নিত্যানন্দ প্রভু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু বললেন না কিন্তু হরিদাস ঠাকুর অবাক হয়ে কিছু বুঝতে পারলেন না। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বললেন, "তাই না কি ! আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি ! তুমি হেরে গিয়েছ ! আমি জয় লাভ করেছি ! আজকে তুমি আমাকে শাস্তি দিতে এসেছ ! যে সম্মান তুমি আমায় সব সময় দিচ্ছ, কোথায় তোমার ওই সব সম্মান?" এটা বলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তারপর আনন্দ করে মহাপ্রভুকে তাঁর প্রিয় শাক প্রসাদ দিলেন।

তাই শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুও নীলাচলে গিয়ে সেখানে ভক্তির বিরুদ্ধে প্রচার করতে লাগলেন আর তাঁর সব শিষ্যগণ এখানে শ্রীবিদ্যানগরে থাকতেন। নিমাই পণ্ডিত তাঁদের সঙ্গে এত বড় মজা করতেন—তিনি সবাইকে একদম জয় করতেন। কেউ তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারতেন না। মাঝে মাঝে নিমাই বিদ্যানগরে এসে এমন কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতেন যে সবই (শিষ্যগণও, অধ্যাপকগণও) তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে না পেরে পালিয়ে যেতেন ! সেইভাবে বিদ্যলীলা প্রকাশ করে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর স্থাপন করেছিলেন যে, বিদ্যার সম্মুখে সব অবিদ্যা পালিয়ে যায়।

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর দণ্ড (যা তিনি সন্ন্যাস গুরুর কাছ থেকে পেয়ে গিয়েছিলেন) নিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু মুকুন্দাদি ভক্তগণের সঙ্গে পুরীতে গিয়েছিলেন। বলরাম থেকে অভিন্ন রূপ হয়ে নিত্যানন্দ প্রভু হেঁটে হেঁটে চিন্তা করলেন, "প্রভু দণ্ড নিয়ে চলে যাচ্ছে—ও আমাকে কেন বহন করবে?" তখন তিনি কী করলেন? তিনি দণ্ডটাকে তিন খণ্ড করে ভেঙ্গে দিয়ে ভার্গী নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত হয়ে মহাপ্রভু কিছু লক্ষ্য করলেন না, তিনি শুধু আগে হেঁটে হেঁটে যেতে থাকলেন। তখন পুরীর

পাশে আঠারনালা সেতুর নিকটে এসে মহাপ্রভুর দণ্ডের কথা মনে পড়ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "নিত্যানন্দ, আমার দণ্ডটা দাও !"

নিত্যানন্দ প্রভু তখন মিথ্যা কথা বললেন, "তোমার যখন কীর্ত্তনে ভাব এসেছে আর অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার হয়েছে, তখন তুমি দণ্ডের উপর পড়ে গিয়েছিলে, দণ্ডটা তিন খণ্ড হয়ে গেছে বলে আমি তাকে ভার্গীতে ভাসিয়ে দিলাম।"

মহাপ্রভু রাগ করে বললেন, "নিতাই, তুমি কি আমার সঙ্গে চালাকি করছ? আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নবদ্বীপ থেকে এই সবে মাত্রা ধন নিয়ে এসেছি আর তুমি কি করেছ ! তুমি এটাও নষ্ট করেছ ! আমি কীজন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছি, তুমি তো সব জান। আমি আর কিছুই নিয়ে আসিনি, সবে ধন নীলমণি একটা দণ্ড—লাঠি !—নিয়ে এসেছি, সেটাও তুমি ফেলে দিলে? যাও ! আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। হয় আমি আগে যাব, তোমরা পিছনে আসবে ; তা না হয় তোমরা আগে যাও, আমি পিছনে আসব। কোনটা করবে? তাড়াতাড়ি বল।"

বুদ্ধি করে সবাই ভাবলেন, "আমরা যদি আগে চলে যাই, প্রভু পিছন দিয়ে কোন দিকে যাবে? আমরা ওকে কখনও খুঁজে পাব না। আর যদি প্রভু সামনে যায় ওকে দূর থেকে দেখা যাবে।" তাই নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "তুমি এগিয়ে যাও আর আমরা পিছনে যাব।"

শুনে মহাপ্রভু ওখান থেকে এমন দ্রুত ভাবে হাঁটতে শুরু করলেন—মত্তহস্তীর ন্যায় !—যে ওরা সব দৌড়িয়েও তাঁর পাশে যেতে পারলেন না ! হেঁটে হেঁটে মহাপ্রভু একবারে জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

জগন্নাথ মন্দিরে ঠাকুরের সামনে একটা বাধা আছে—মহাপ্রভু মন্দিরে দৌড়িয়ে ঢুকে সেই বাধায় আটকে পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়ে মুখ দিয়ে ফেনা বেরতে শুরু করল, তিনি 'জগন্নাথ'ও বলতে পারলেন না—শুধু "জ-জ-গ-গ, জ-জ-গ-গ" বলতে থাকলেন। তাঁর চেহারাও বিকট হয়ে গেল—মানুষের আকৃতির মত মোটেই দেখতে নয়।

যে পাগলের মত মানুষ মন্দিরের মধ্যে দৌড়িয়ে যাচ্ছিলেন দেখে মন্দিরের পাহারাদাররা তাঁকে মারতে যাচ্ছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রভাবে ওরা আর মারতে পারল না—মহাপ্রভুর চেহারা, তাঁর উজ্জ্বল্য, তাঁর ঐশ্বর্য দেখে কেউ সাহস পেল না। একজন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে গিয়ে খবর দিলেন, " প্রভু, এই দিকে আসুন, মন্দিরে কিরকম লোক এসেছে ! একবারে জ-জ-গ-গ বলে মুখ দিয়ে ফেনা বেরচ্ছে ! ও চিৎ হয়ে পড়েছে ।" জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে আর মহাপ্রভুর অবস্থা দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বললেন, "যে হউক আর সে হউক, আমার বাড়িতে একে নিয়ে চল।"

শ্রীনীলাচল পুরীধামে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছিলেন জগন্নাথ মন্দিরের পরিচালক। তাঁর বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্য বাস করতেন। গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে দেখে তাঁকে চিনতে পারলেন আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বললেন, "তুমি কি এঁকে চিনতে পারছ না ?"

"মানে ?"

"তুমি বিদ্যানগরে (নবদ্বীপে) থাকতেও—তুমি এঁকে চিনতে পারছ না ? ইনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর নাতি, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। শচীমাতার গর্ভে আবির্ভূত হয়ে ইনি জগৎপিতা স্বয়ং ভগবান ! এখন ইনি কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন, এঁর নাম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বললেন, "না, আমার তো ওকে ভগবান বলে মনে হচ্ছে না।"

"তোমার কৃপা নাই, তাই তোমার মনে হচ্ছে না। আমার কৃপা আছে, তাই আমার মনে হচ্ছে।"

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ (চৈঃ চঃ ২/৬/৮৩)

ঈশ্বর যদি আপনাকে কৃপা করেন, তাহলে আপনি ঈশ্বরকে জানতে পারবেন। গুরুকে জানা সহজ নয়—যদি গুরু আপনাকে কৃপা করেন, তাহলে গুরুকে জানা যায়। গুরু কৃপা না করলে গুরুকে কখনও জানা যায় না।

তাই গোপীনাথ আচার্য্য বললেন, "আমার কৃপা আছে বলে আমি এঁকে চিনতে পারছি।"

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরক্ত হয়ে বললেন, "যাই হোক, তুমি এখন যাও, প্রসাদ নাও, পরে কথা বলব।"

পরের দিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ আচার্য্যকে বললেন, "এই ছেলে-সন্ন্যাসীর বিনীত-প্রকৃতি দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি ভাবছি, এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস নিলে ও কি করে সন্ন্যাস ধর্ম্ম রাখবে ? ঠিক আছে, আমি ওকে বেদান্ত ও বৈরাগ্যেরমর্ম ভালভাবে শিখাব, তখন ও উত্তম সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারবে !"

এটা শুনে গোপীনাথ আচার্য্যের মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তুমি কি জান না, ও কে ? ও স্বয়ং ভগবান্, আমি তোমাকে আগেই বলে দিলাম। তুমি কি করে ওকে শিক্ষা দিতে যাচ্ছ ?"

"কী বলছ তুমি ? আমি দেখছি তুমি সব জান, কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে যে, কলিযুগে কোন অবতার নেই, সেইজন্যই ভগবানের নামও হচ্ছে 'ত্রিযুগ'।"

"তুমি সব শাস্ত্র পড়েছ, কিন্তু তুমি কি ভাগবতম্ বা মহাভারত পড়েছ ? সেখানেই লেখা আছে যে, কলিযুগে অবতার আছেই—লীলা অবতার নেই, তবে ভগবান্ সাক্ষাৎ এসে যুগ-অবতাররূপে। তুমি এত বড় পণ্ডিত কিন্তু তোমার কৃপা-লেশই নেই কারণ ভগবান্ তোমার বাড়িতেও আছেন, কিন্তু তুমি ওঁকে চিনতে পারছ না। আমি বুঝি, এটা আসলে তোমার দোষ নয়, শাস্ত্রে লেখা আছে যে, কেউ জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে বুঝতে পারে না।"

"তার মানে আমার কৃপা নেই আর তোমার আছে ? তার প্রমাণ কী ?"

"আমি ওঁকে চিনতে পারছি আর তুমি পারছ না, সেইটা হচ্ছে কৃপার প্রমাণ। আমি শাস্ত্র থেকে অনেক প্রমাণ দিতে পারি কিন্তু তোমার হৃদয় মায়াবাদী-ভাষ্য ভর্তি, তাই তোমাকে কিছু বলা যেমন ঊষরভূমিতে বীজের রোপন। ভগবান্ যখন তোমাকে কৃপা করবেন, তখন তুমি এটা বুঝতে পারবে।"

রেগে গিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বললেন, “তাই না? যাও, প্রসাদ নিয়ে ওকে নিয়ে এস। আমি নিজে দেখব ! পরে তুমি আমাকে ভাল করে শিখাতে পারবে !”

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আদেশ অনুসারে গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুর ঘরে এসে বললেন যে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁকে ডাকছেন। মুকুন্দ দত্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথা শুনেছিলেন আর মহাপ্রভুকে সব বলে দিয়েছেন, কিন্তু মহাপ্রভু বললেন, “মনে কিছু কর না, উনি এটা আমারই মঙ্গলের জন্য বলেছেন। তার কোন অপরাধ নেই।”

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে গিয়ে বললেন, “প্রভু, আপনি আমাকে ডেকেছেন?”

“হ্যাঁ, বস। এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে কী পড়াশোনা করেছ? বেদ-বেদান্ত পড়েছ?”

“এমন কিছু পড়িনি, ব্যাকরণ-ট্যাকরণ পড়েছি—”

“ব্যাকরণ পড়ে কী হবে? তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ আর তুমি বেদান্তই পড়নি !”

“ভগবান্ নাহি কহে মুই ভগবান” : ভগবান কখনও বলেন না যে, “আমি ভগবান্ হয়ে গিয়েছি।” তিনি নিজেকে কখনও ভগবান্ বলে বিচার করেন না। সত্যিকারের যারা বৈষ্ণব হয়, তারা কখনও বলেন না যে, “আমি বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছি।” তখন কী হল?

মহাপ্রভু হাত জোড় করে বললেন, “প্রভু, আমাকে কৃপা করুন। মায়ের সেবা ছেড়ে দিয়ে আমি বাতুল হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছি। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমার সন্ন্যাসটা থাকে।”

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বললেন, “হ্যাঁ, তোমায় বেদান্ত পড়তে হবে ! ঠিক আছে, আমি তোমাকে বেদান্ত শিখাব।”

তারপর সাত দিন ধরে মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে বেদান্ত শ্রবণ করেছিলেন—বাধ্য ছাত্রের মত চুপচাপ বসে শুনতেন।

সাত দিন পর আর নিজেকে সংযত করতে না পেরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, “কী, নবীন সন্ন্যাসী? তুমি বেদান্ত শুনছ কিন্তু তুমি তো কিছু বুঝতে পারছ কি না? যেহেতু তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন

করছ না, সেহেতু আমি কি করে বুঝব, তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ কি না ?”

মহাপ্রভু বিনীতভাবে বললেন, “প্রভু, যখন আপনি বেদান্ত-পাঠ করছেন, তখন আমি দিব্যি বুঝতে পারছি, কিন্তু যখন আপনি অর্থ ব্যাখ্যা করছেন, তখন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য অবাক হয়ে ভাবলেন, “কী বলছে এই ছেলেটি ? আমি সাত দিন ধরে ওকে অনেক চেষ্টা করে ভালমনে শিক্ষা দিয়েছি আর ওর বলছে যে, আমি সব আজেবাজে কথা বলছি ?”

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য “আত্মারামাশ্চ মুনয়ো” শ্লোক বলে দিলেন। মহাপ্রভু বললেন, “প্রভু, এই শ্লোকের ভিতরে কিবা দোষ, কিবা গুণ একটু ব্যাখ্যা করুন।”

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য রেগে গিয়ে ভাবলেন, “দোষ !” কিন্তু শ্লোকটার ব্যাখ্যা করলেন—তিনি নয় প্রকার ব্যাখ্যা করে মহাপ্রভুকে বলতে অনুরোধ করলেন। তখন মহাপ্রভু সেই শ্লোকটার আরও আঠারে প্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন—সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নয় প্রকার ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে (তাঁর সব মায়াবাদী ভাষ্য বন্ধ করে দিয়ে) নতুন ভক্তিমর্গের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

মায়াবাদীর ভাষ্যটা হচ্ছে ব্রহ্ম-জ্ঞান : ব্রহ্মা সব স্থষ্টি করেছেন। আমরা গুরু-পরম্পরার কীর্ত্তনে গাই, “কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হন কৃষ্ণসেবোন্মুখ, ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি।” ব্রহ্মা কৃষ্ণ থেকে বল পেয়েছেন আর মায়াবাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মা থেকে সব এসেছে। সেটা হচ্ছে ব্রহ্ম-জ্ঞান। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ মিশন, সারদা আশ্রম, ভারত সেবা আশ্রম—ওরা মায়াবাদী, কৃষ্ণবাদে ওরা বিশ্বাস করেন না।

মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তখন বিস্মিত হয়ে পড়লেন—চোখগুলো বেরিয়ে গেল : লাল হয়ে টগবগ করে তিনি ভাবলেন, “আমি সাত দিন ধরে কাকে বসে বসে বেদান্ত পড়িয়েছি ? এ কে ?!” কিন্তু ওইসময়ও তাঁর বিশ্বাস হল না।

তখন মহাপ্রভু তাঁর ষড়্ভুজরূপ দেখিয়ে দিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য আর মহাপ্রভুকে দেখতে পারলেন না—এই ষড়্ভুজরূপটা দেখে তিনি

সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবতে ভগবানের চরণের সামনে পড়লেন। শুধুমাত্র যখন তিনি শরণাগত হয়ে মহাপ্রভু চরণে পড়লেন, তখনই তিনি শেষপর্যন্ত বিশ্বাস পেলেন। সেইক্ষণ মহাপ্রভু ষড়ভুজরূপটা লুকিয়ে রেখে আবার তাঁর সাধারণ মানুষের মত সন্ন্যাসীরূপ প্রকাশ করলেন আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য সাষ্টাঙ্গ-প্রণামে পড়ে আর উঠলেন না। মহাপ্রভু ওকে ডেকে বললেন, "সার্বভৌম, উঠে পড় ! এবার উঠো ! হয়েছে !"

আস্তে আস্তে তিনি উঠলেন। চারদিকে ঘুরে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এ কী, প্রভু ? আপনার কী রূপ দেখলাম ? আপনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবার কী রূপ দেখছি ?"

নিজের স্বরূপ লুকিয়ে মহাপ্রভু বললেন, "ওইসব আপনি ভুল দেখেছেন, আপনার কৃষ্ণের প্রতি একটু প্রীতি জন্মিয়াছে, এইজন্য আপনি ওইসব শঙ্খ-চক্র দেখছেন।"

তারপর সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর ভক্ত ও বড় বৈষ্ণব হলেন। সব মায়াবাদী ভাষ্য ছেড়ে দিয়ে তিনি শুদ্ধসিদ্ধান্ত প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর প্রারম্ভিক পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল—প্রভু তাঁকে নিজের কাছে নিজেই টেনে নিয়েছিলেন।

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও বিদ্যানগরের কথা শুনে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আমার মনে একটা সন্দেহ আছে। সমস্ত সাঙ্খ্য-বিদ্যা, তর্ক-বিদ্যা অমঙ্গল। কি করে এ সব নিত্যধামে বিরাজ করতে পারেন ?"

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু উত্তরে বললেন, "হরিবল ! হরিবল ! শুন জীব, নিত্যধামে কিছু অমঙ্গল হতে পারে না। এখানে তর্ক-বিদ্যার কোন শক্তি নেই। এখানে সব কিছু ভক্তির অধীন হয়। নিজের কর্ম্মদোষে দুষ্টলোক সেটা বুঝতে পারেন না। এই ধামে ভক্তিদেবী বিরাজ করেন, অন্য সব কিছু তাঁর দাস-দাসী হয়। নবদ্বীপ নব-বিধা ভক্তির অধিস্তান, এখানে জ্ঞান ও কর্ম্ম সব সময় ভক্তির সেবা করেন। যাঁরা কৃষ্ণবহির্মুখ জীব, তাঁদের শাস্ত্র দুষ্টমতি ও ভুলসিদ্ধান্ত দেন আর যাঁরা কৃষ্ণভক্ত,

যাঁরা শিষ্টলোক, তাঁদের শাস্ত্র কৃষ্ণরতি দেন। প্রৌঢ় মায়া এখানে নিত্যকাল বাস করে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবা করেন, তিনি অবৈষ্ণবগণ, অভক্তগণকে অন্ধ করে বিভিন্ন ক্লেশ দেন। সমস্ত পাপ, সমস্ত কর্ম্ম এখানে নষ্ট হয়ে যায়—মায়া এখানে বিদ্যা প্রদান করেন। কিন্তু যাঁরা বৈষ্ণবের কাছে অপরাধ করেন, মায়া তাঁদেরকে দূর করে কর্ম্মের বন্ধনের মধ্যে ছেড়ে দেয়। যদিও ওইরকম পাপিষ্ঠ লোক এখানে থাকতে পারেন কিন্তু তাঁরা কখনও কৃষ্ণপ্রেম বা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করবেন না—ওরা শুধু বিদ্যার অবিদ্যা লাভ করেন। সেইজন্য বিদ্যা অমঙ্গল নয়, বিদ্যার অবিদ্যা-ছায়া হচ্ছে অমঙ্গল।”

সেটা হচ্ছে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথা। তাঁর জন্মস্থানে এসে আমরা তাঁর চরণে প্রার্থনা করি যে, তাঁর কৃপায় আমরা জ্ঞান থেকে দূরে থেকে শুদ্ধ ভাবে ভক্তি অনুশীলন করতে পারি—যেন আমাদের হৃদয়ে এক দিন গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবার রতি-মতি হতে পারে।

জয় শ্রীবিদ্যানগর কি জয়। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভু কি জয়।

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল,
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু,
এখন শরণ তুমি ॥১॥
পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি’।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল,
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি ॥২॥
জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ॥৩॥
সেই গাধা হ’য়ে সংসারের বোঝা
বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন, শক্তির অভাবে,
কিছু নাহি লাগে ভাল ॥৪॥
জীবন যাতনা, হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল ॥৫॥
তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর।
ভকতিবিনোদ, জড়বিদ্যা ছাড়ি’
তুয়া পদ করে সার ॥৬॥

শ্রীজহ্নুদ্বীপ

— বন্দনম্ —

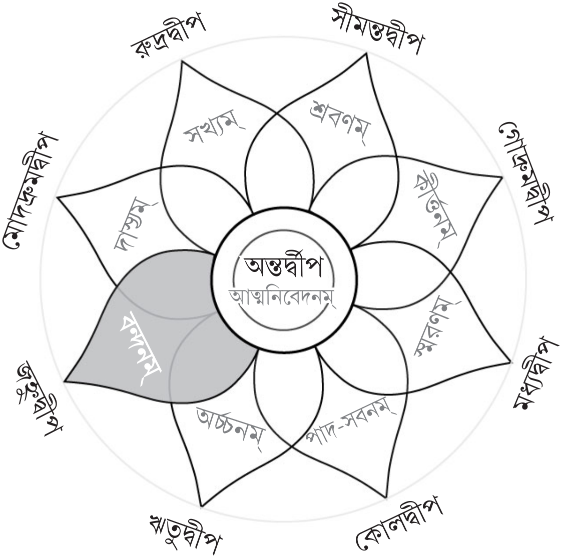
রুদ্রদ্বীপ
সীমন্তদ্বীপ
মোদদ্রুমদ্বীপ
গোদ্রুমদ্বীপ
সখ্যম্
শ্রবণম্
দাস্যম্
কীর্ত্তনম্
অন্তর্দ্বীপ
আত্মনিবেদনম্
বন্দনম্
স্মরণম্
জহ্নুদ্বীপ
মধ্যদ্বীপ
অর্চ্চনম্
পাদ-সবনম্
ঋতুদ্বীপ
কোলদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে আমরা শ্রীঋতুদ্বীপ পার করে এখন শ্রীজহ্নুদ্বীপে এসেছি। এখানে কোন মন্দির নেই কিন্তু রাস্তায় মাঝখানেতে আমরা শ্রীজহ্নুদ্বীপের একটী বনে বসি এই দ্বীপের গুণমহিমা বলবার জন্য।

এই মনোহর বন হচ্ছে বৃন্দাবন ধামের ভদ্রবন। প্রাচীন কালে একটি বিরাট মুনি জহ্নু নামে এখানে বসে তপ করতে করতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শন পেয়েছিলেন।

যখন আমরা গঙ্গানগরে গেলাম, তখন গঙ্গার কথা বললাম—ভগীরথ মহারাজ তাঁর পিতৃগণ উদ্ধার করবার জন্য গঙ্গা দেবীকে সগরে চলে নিয়েছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় জহ্নুমুনি এখানে বসে ছিলেন আর হঠাৎ করে তাঁর কোশাকুশি (পূজার জন্য ব্যবহৃত পাত্র) ভাগীরথী-গঙ্গার দ্রুত স্রোতের মধ্যে পড়ে গিয়ে ভেসে চলে গেল। সেটা দেখে জহ্নুমুনি রেগে গিয়ে সমস্ত গঙ্গাজল পান করেছিলেন। ইতিমধ্যে ভগীরথ মহারাজ অবার লক্ষ্য করলেন যে, গঙ্গা কোথায় নেই। খুঁজতে খুঁজতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি হয়েছিল। জহ্নুমুনির কাছে এসে তিনি বিনীতভাবে তাঁকে সব বুঝিয়ে দিলেন, কিন্তু জহ্নুমুনি কিছু বললেন না। তখন ভগীরথ মহারাজ মুনির কৃপা লাভ করবার জন্য এখানে বসে মুনির ধ্যান ও পূজা করতে লাগলেন। অনেক দিন পর সদয় হয়ে জহ্নুমুনি তাঁর জানু বিদারণ করে গঙ্গাদেবীকে সেখান থেকে বাহির করলেন। ওই সময় থেকে গঙ্গাদেবীর নাম হয়েছিল জাহ্নবী।

অনেক দিন পরে, দ্বাপরযুগে, গঙ্গাদেবীর পুত্র ভীষ্মদেব এখানে এসেছিলেন তাঁর মায়ের দর্শন পাওয়ার জন্য। তাঁর প্রিয় পুত্রকে দেখে জাহ্নবী দেবী অনেক স্নেহ করে তাঁকে বাবার বাড়িতে নিয়েছিলেন। জহ্নুমুনির আশ্রমে অনেক দিন থেকে ভীষ্মদেব মুনির কাছ থেকে ধর্ম্ম শিক্ষা পেয়েছিলেন (পরে তিনি ওই শিক্ষা যুধিষ্ঠির মহারাজকে দিয়েছিলেন)। এই নবদ্বীপধামের অন্তর্গত শ্রীজহ্নুদ্বীপে থেকে এবং ভক্তিধন লাভ করে ভীষ্মদেব পরম বৈষ্ণব হয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে এই জহ্নুদ্বীপপের মাহাত্ম্য।

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ

— দাস্যম্ —

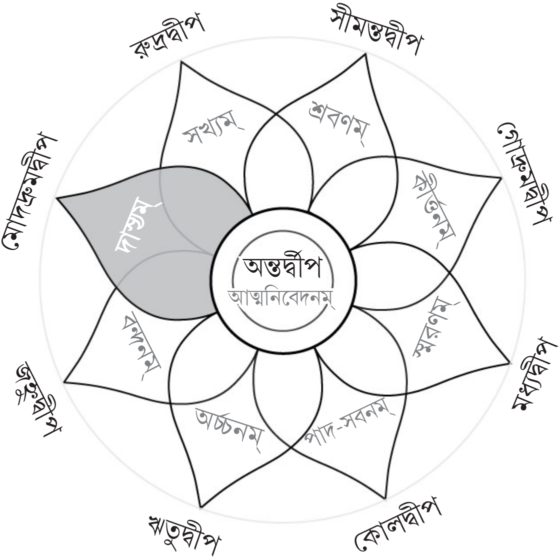
রুদ্রদ্বীপ
সীমন্তদ্বীপ
মোদদ্রুমদ্বীপ
গোদ্রুমদ্বীপ
সখ্যম্
শ্রবণম্
দাস্যম্
কীর্ত্তনম্
অন্তর্দ্বীপ
আত্মনিবেদনম্
বন্দনম্
স্মরণম্
জহ্নুদ্বীপ
মধ্যদ্বীপ
অর্চ্চনম্
পাদ-সেবনম্
ঋতুদ্বীপ
কোলদ্বীপ

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ

শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করতে করতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা এখন শ্রীজহ্নুদ্বীপ পার করে শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে এসেছি। এই দ্বীপ আধুনিক মামগাছি গ্রামে অবস্থিত হয়। শাস্ত্রে বলা হয়, এই পবিত্র স্থান হচ্ছে অভিন্ন অযোধ্যা ধাম।

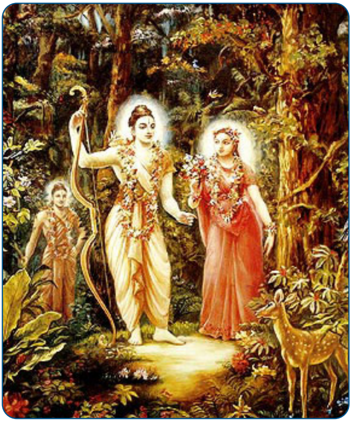

যখন ভগবান্ রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সঙ্গে বনে বাস করতেন, তখন তাঁরা এখানে এসে এক বট গাছের তলায় কুটীর নির্ম্মাণ করে কিছু কাল ধরে থাকলেন। নবদ্বীপধামের প্রভা দেখে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রী মুখে হাস্য উঠল। তাঁর হাস্যমুখ দেখে সীতাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, তুমি হাসছ কেন?" শ্রীরামচন্দ্র বললেন, "হে দেবী, এটা খুব গূঢ় কথা। যখন কলিযুগে আসবে, তখন সমস্ত জীবগণ এই নদীয়ায় আমার স্বুবর্ণবর্ণরূপ দেখতে পাবেন। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহে আবির্ভূত হয়ে আমি গৌরাঙ্গরূপে সর্ব্ব জগৎ নিস্তার করব। ভাগ্যবান জীব আমার বল্যলীলা দেখলে পরম প্রেম লাভ করবেন। আমি বিদ্যা লীলা বিলাস করে শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য এই জগতে প্রকাশ করব। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করলে আমি এখান থেকে নীলাচলে চলে যাব। আমার বধু (স্ত্রী) মায়ের কোলে ক্রন্দন করবেন।"

এই কথা শুনে সীতাদেবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন রে তুমি জননী ক্রন্দন করাবে? কেন রে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তোমার স্ত্রীকে দুঃখ দেবে? সেটা করলে কি সুখ তোমার? আমি এটা বুঝতে পারছি না।"

শ্রীরামচন্দ্র বললেন, "প্রিয়, তুমি আসলে সব জান। জীবের শিক্ষা করবার জন্য তুমি অজ্ঞাত অভিনয় করে আমাকে এই প্রশ্ন করছ। যাঁদের আমার প্রতি প্রেমভক্তি আছে, তাঁরা প্রেমভক্তি দুই ভাবে আস্বাদন করেন—সংযোগে এবং বিয়োগে। সংযোগের সুখ হচ্ছে সম্ভোগ আর বিয়োগের সুখ হচ্ছে বিপ্রলম্ভ। আমার কৃপায় যে নিত্যভক্ত আমার সঙ্গে সম্ভোগ করতে চান, তাঁরা আমার বিরহ জ্বালে বিপ্রলম্ভের সুখ পান। আমার বিরহের দুঃখে পরমানন্দ হয়। যাঁরা ভক্ত তাঁরা সেটা বুঝতে পারেন। যখন বিরহের পর মিলন হয়, তখন সুখ কোটিগুণ বেশী—তার কারণ হচ্ছে বিপ্রলম্ভ। আমার মা (কৌশল্যাদেবী) কলিযুগে শচীদেবীরূপে অবতীর্ণ হবেন আর তুমি আমার বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সেবা করবে। এই ত্রেতাযুগে আমি তোমার বিরহের জ্বালে তোমার সোনাবিগ্রহ করলে অযোধ্যায় তোমার পূজা করব। আর তার বিনিময়ে তুমিও আমার বিরহ জ্বালে আমার সোনা-বিগ্রহ নদীয়ায় করলে আমার নিত্যসেবা পূজা করবে। প্রিয়, সেটা সব গোপনীয় কথা, তুমি সেটা কাউকে বলবে না। এই নবদ্বীপ ধাম আমার সব চেয়ে প্রিয় স্থান—আর কোন স্থান, এমন কি অযোধ্যা আমার এত প্রিয় নয়। আমাদের রামবট (কুটির) কলিযুগে থাকবে না, কিন্তু অপ্রকাশ ভাবে নিত্যকাল থাকবে।"

এই শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ও বন্ধু গুহক নামে প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনবদ্বীপ ধামে একটি ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হয়েছিল সদানন্দ বিপ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি এই জগতে রাম বিনা কিছু জানতেন না।

যখন মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ওই কাল সদানন্দ বিপ্র জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে ছিলেন—সমস্ত দেবতাগণকে দেখে তিনি চিনতে পারলেন যে, ওই দিন স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আনন্দিত হয়ে তিনি নিজের ঘরে ফিরে এসে তাঁর ইষ্টদেবের ধ্যান করতে লাগলেন। হঠাৎ করে তিনি গৌরসুন্দররূপ দেখতে পেলেন—শ্রীগৌরাঙ্গরায় সিংহাসনে বসে ছিলেন, তাঁর পাশে ব্রহ্মাদি দেবগণ চামর দিয়ে বাতাস করছেন।

তারপর মহাপ্রভুর কাছে তিনি রামচন্দ্র, তাঁর ডানদিকে লক্ষ্মণ, বামদিকে সীতাদেবী এবং সম্মুখে হনুমানকে দেখলেন। এই দৃশ্য দেখলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রামচন্দ্র এই কলিযুগে গৌররূপে এসেছিলেন। "ধন্য আমি ধন্য আমি !"—তিনি বারবার বলতে লাগলেন। পরে, যখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনলীলা প্রকাশ করেছিলেন, সদানন্দ বিপ্র প্রভু তাঁর সঙ্গে নাচতে নাচতে গৌরনাম করতেন।

এই সব অপূর্ব্ব কথা শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে প্রকাশ করে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে শ্রীভাণ্ডীরবন দেখিয়ে দিলেন এবং এগিয়ে গিয়ে মামগাছি গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন।

জয় শ্রীল গুরুমহারাজ কি জয়
জয় শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ কি জয়। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কি জয়
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা পালনকারী ভক্তবৃন্দ কি জয়

বিভাবরী শেষ আলোক প্রবেশ
নিদ্রা ছাড়ি উঠ জীব।
বল হরি হরি মুকুন্দ মুরারি
রামকৃষ্ণ হয়গ্রীব ॥
নৃসিংহ বামন শ্রীমধুসূদন
ব্রজেন্দনন্দন শ্যাম।
পুতনাঘাতন কৈটভশাতন
জয় দাশরথি রাম ॥
যশোদাতুলাল গোবিন্দ গোপাল
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়জন রাধিকারমণ
ভুবন সুন্দরবর ॥
রাবণান্তকর মাখনতস্কর
গোপীজন বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল গোপবৃন্দপাল
চিত্তহারী বংশীধারী ॥
যোগীন্দ্রবন্দন শ্রীনন্দনন্দন
ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ রূপ মনোহর
মোহন বংশীবিহারী ॥
যশোদানন্দন কংস নিসূদন
নিকুঞ্জ রাসবিলাসী।
কদম্ব কানন রাসপরায়ণ
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী ॥
আনন্দ-বর্দ্ধন প্রেমনিকেতন
ফুলশরযোজক কাম।
গোপাঙ্গনাগণ চিত্তবিনোদন
সমস্ত গুণগণধাম ॥
যামুন জীবন কেলিপরায়ণ
মানস-চন্দ্র-চকোর।
(হরি) নাম-সুধারস গাও কৃষ্ণ-যশ
রাখ বচন মন মোর ॥

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়বাসনানলে,   মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া,   হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া
বরিষয় সুধা অনুপম ॥১॥
হৃদয় হইতে বলে,   জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোরে ভঙ্গে স্বর,   অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ ॥২॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম,   পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন,   প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব-দেহ জর জর ॥৩॥
করি’ এত উপদ্রব,   চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল,   মোরে ত’ বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে ॥৪॥
লইনু আশ্রয় যা’র,   হেন ব্যবহার তা’র,
বলিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়,   যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥৫॥
প্রেমের কলিকা নাম,   অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি’ পুনঃ   দেখায় নিজ রূপগুণ,
চিত্ত হরি’ লয় কৃষ্ণপাশ ॥৬॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা,   ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া   কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ॥৭॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি,   অখিল-রসের খনি,
নিত্য-মুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত,   সব ল’য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ॥৮॥

শ্রীসারঙ্গ মুরারির কথা

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় এই খুব সুন্দর স্থান পৌঁছে গিয়েছি—সেটা হচ্ছে শ্রীসারঙ্গ মুরারির মঠ। আগে এখানে শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর নামে একজন ভক্তের বাসস্থান ছিল—পরে এই মঠটা শ্রীসারঙ্গ মুরারির মঠ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। সেটা কি করে হল?

আগের যুগে এই ঝোপ-জঙ্গলের গ্রামে খুব সাপ থকত। সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে অনেক লোক মরে যেত। বর্ষাকালে লোকে এখনও কখনো কখনো বৈদ্যের কাছে যায় বা কোন ওঝার কাছে গিয়ে সাপের বিষ তুলে দিতে যায়। তাই এক দিন এই গ্রামে একটা বাচ্চাকে সাপে কামড় দিয়েছিল। ছেলেকে বাঁচাতে না পেরে বাবা-মা ওর মৃত দেহ ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

এদিকে শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর এখানে বসবাস করতেন এবং খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়ে তিনি এক দিন তাঁর বাড়িতে ঠাকুরের কাছে (শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের কাছে—এই বিগ্রহটি এখনও এখানে আছে) প্রার্থনা করলেন, “হে ঠাকুর! এখন কী হবে? আমি এত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, আমি আর তোমার সেবা ঠিক মত করতে পারছি না—ভোগ লাগাতে পারছি না, সমস্ত সেবা-কার্য করতে পারছি না। প্রভু তুমি আমাকে একজনকে দাও যে তোমার সেবা কর্তব্য করতে পারবে। আমি আর পারছি না...” ঠাকুর তাঁর কথা শুনেছেন এবং রাতের বেলায় যখন সরাঙ্গ ঠাকুর ঘুমিয়েছেন, তখন ঠাকুর স্বপ্নে তাঁর কাছে এসে হাজির হয়ে বললেন, “সারঙ্গ, আমি তোমার কাছে এমন একজনকে পাঠাব, তুমি ওকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যরূপে গ্রহণ করবে।”

“হ্যাঁ, প্রভু, ঠিক আছে। আমি কি করে বুঝব এই লোকটা কে?”

“ঘুম থেকে উঠে গঙ্গায় যওয়ার সময় প্রথম যাকে দেখবে, তাকে তুমি দীক্ষা দিয়ে দেবে।” তখন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

উঠে শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। গঙ্গায় এসে তিনি দেখলেন, জলে কলার ভেলা ভাসতে ভাসতে আসছে, তার

মধ্যে একটা মৃত ছেলের দেহ। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর গোপীনাথের কথা মনে পড়ল এবং তিনি ভগবানের আদেশ অনুসারে ছেলেটির কানের মধ্যে মন্ত্র বললেন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। যখন এই মন্ত্র তাঁর কানে প্রবেশ করল, তখন ছেলেটা চোখ খুললেন। উঠে তিনি চারদিকে তাকাছেন—শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর দেখলে তিনি তাঁকে প্রণাম করে গুরুরূপে স্বীকার করলেন।

তারপর গঙ্গায় স্নান করে শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর ছেলেটাকে মঠে নিয়ে এলেন, ওই সময় থেকে তিনি ঐকান্তিক ভাবে তাঁর গুরু ও ঠাকুরের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন।

এদিকে ছেলের বাবা-মা শুনতে পেলেন, তাঁদের ছেলে বেঁচে গিয়েছেন এবং পাশের গ্রামে আশ্রমে থাকেন। তখন বাবা-মা এখানে এসে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বাবা, তুমি মর নি ! সোনা, আয়, আয়, বাড়ি চল আয়।" কিন্তু ছেলেটি বললেন, "না, যাব না। তোমরা আমাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছ কাজেই আমি এখন তোমাদের নয়। আমি তোমাদের মুরারি নই, আমি সারঙ্গের মুরারি। আমি আমার গুরুদেবের এখন।"

ওর পর শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর চলে গেলেন আর সারঙ্গ মুরারি এখানে থাকলেন, সেবা করতেন। এটা খুব সুন্দর স্থান, এখানে মহাপ্রভুর পার্ষদগণ থাকতেন। এখানে এসে আমরা স্মরণ করি, কৃষ্ণ-হরিনাম কত বল ধরে—যদি সত্যিকারের নাম হয়, তার ফল অপূর্ব্ব।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বাল্যলীলাভূমি

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতে করতে আমাদের শেষ জায়গা হচ্ছে এই শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ মামগাছি গ্রামে অবস্থিত সুন্দর মন্দির। এখানে পরম পূজনীয় 'শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস' শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আবির্ভূত হয়েছিলেন—সেটা তাঁর জন্মস্থান। আমাদের শ্রীলগুরু মহারাজ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর প্রণাম মন্ত্র লিখেছেন :

দাসবৃন্দাবনং বন্দে কৃষ্ণদাস-প্রভুং তথা।
ছন্নাবতার-চৈতন্যলীলা-বিস্তারকরিণৌ॥
দ্বৌ নিত্যানন্দ পাদাব্জ-করুণারেণু-ভূষিতৌ।
ব্যক্ত-চ্ছন্নৌ বুধাচিন্ত্যৌ বাবন্দে ব্যাস-রূপিণৌ॥
শ্রীগুরু-গৌর-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দাশ্চ গণৈঃ সহ।
জয়ন্তি পাঠকশ্চাত্র সর্ব্বেষাং করুণার্থিনঃ॥

যখন আমরা শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে গিয়াছিলাম, তখন আমরা নারায়ণীদেবীর কথা বলেছিলাম :

এক দিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন। হঠাৎ মহাপ্রভুর সামনে এগিয়ে গিয়ে নারায়ণী হাত পাতলেন। উনি তখন ৩-৪ বছর বয়স ছিলেন। মহাপ্রভু ওঁকে কিছু প্রসাদ দিয়ে বললেন, "এখন কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণ নাম কর !" মহাপ্রভুর আজ্ঞার প্রভাবে নারায়ণী তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদতে শুরু করলেন।

আর এক সময় শ্রীবাস পণ্ডিত ও ভক্তগণের রাত্রি কীর্ত্তন শুনে আশেপাশের লোকগুলো হিংসা করে ও বিরক্ত হয়ে নালিশ করতে লাগলেন—ওরা বললেন, "এটার জ্বালায় রাত্রে ঘুমোতে পারি না ! ওরা সারা দিন সারা রাত কীর্ত্তন করছে ! এই কীর্ত্তনটা বন্ধ করতে হবে,

নাহলে নিমাইকে মারতে হবে আর শ্রীবাসের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে !" এসব কথা শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত কীর্ত্তন বন্ধ করে দিলেন। ওই দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আরে শ্রীবাস, কী হয়েছে ? তোমাদের কীর্ত্তনটা বন্ধ হল কেন ?"

শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন, "তুমি আগে বস। চিন্তা কর না, বসো।"

"বসব কেন ? কীর্ত্তন কেন বন্ধ হল ? বলে দাও।"

"মাথা গরম করবে না, বসো। পাড়ার ছেলেগুলো বলছে যে, আমার ঘরবাড়ি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে, আমার এটায় আপত্তি নেই, কিন্তু ওরা বলছে যে, ওরা তোমার গায়ে হাত দেবে—তোমার গায়ে হাত দিলে কী করে হবে ?"

মহাপ্রভু বললেন, "তাই না কি ?" তখন উনি নিজের সিদ্ধি দেখিয়ে দিলেন—উনি নারায়ণীর মাথায় একটু হাত দিয়ে আশীর্বাদ দিলেন, "তোমার কৃষ্ণভক্তি হোক !" আর নারায়ণী তখন একবারে 'হা কৃষ্ণ ! হা গৌর !" বলে মেঝেতে গড়াগড়ি যেতে লাগলেন । তখন মহাপ্রভু সব ভক্তগণকে বললেন, "তোমাদের কি এখন বিশ্বাস হয় ? তোমাদের ঘরবাড়ি কি কেউ ভেঙ্গে দিতে পারবে ?"

সবাই সেটা স্বীকার করলেন এবং আর কীর্ত্তন বন্ধ করলেন না।

এই সব হিসাবে নারায়ণী 'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'র নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন আর কিছু বছর পরে শ্রীবাস পণ্ডিতের সহধর্ম্মিণী মালিনী দেবীর বাবার বাড়ী মামগাছিতে ঘটকালী দ্বারা নারায়ণীকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ওঁর গর্ভে পরমবৈষ্ণব শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেই রকম ছিল ওঁর ভাগ্য।

যখন শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বড় হয়েছেন, তিনি সব সময় নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে প্রচার ও সেবা করতেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, "তুমি রাঢ়দেশ গিয়ে প্রচার কর !" সেই আদেশ অনুসারে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন ভাবে প্রচার করতেন এবং বছরের মধ্যে একবার সমস্ত নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে শ্রীপুরীধামে নিয়ে যেতেন।

এক দিন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণকে নিয়ে নবদ্বীপ থেকে যাত্রা শুরু করলে হেঁটে হেঁটে দেনুড় গ্রামে এসেছিলেন। সেখানে একটি আম বাগানে তাঁরা থেমে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ওই দেনুড় গ্রামের জমিদার ছিলেন রামহরি চক্রবর্ত্তী। তিনি একজন ব্রাহ্মণ এবং নিত্যানন্দ প্রভুর বড় ভক্ত হয়ে সব সময় ভাবতেন, "কবে আমি নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পাব? কবে নিত্যানন্দ প্রভু আসবেন?" তাই ওই দিন রামহরি চক্রবর্ত্তী হঠাৎ করে কিছু দূরে বিরাট রঙিন ভিড় দেখতে পেলেন—কেউ হলুদ কাপড় পরছেন, কেউ নীল, কেউ লাল, কেউ সাদা, ইত্যাদি। অবাক হয়ে তিনি ভাবলেন, "সে কী? আমি ওখানে গিয়ে একবার দেখব।" ওই আম বাগানে এসে তিনি দেখলেন যে, ওখানে স্বয়ং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এসে দাঁড়িয়ে আছেন! তাঁর গুরুদেবকে দেখে রামহরি চক্রবর্ত্তী একবার মাটিতে পড়ে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে বললেন, "প্রভু, আমি সব সময় আপনার চিন্তা করি। কৃপ করে, আমার বাড়িতে চলুন। আমি সবাইকে প্রসাদ দিয়ে দেব।"

নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "সেটা কী করে হবে? আমাদের এত বেশী লোক এখানে আছে, আমরা সবাই কি করে তোমার বাড়িতে যাব? তুমি কাজ কর—বরং চাল, ডাল, যা আছে, সব নিয়ে এস, আমরা এখানে পিকনিক করতে পারি।"

উত্তেজিত হয়ে রামহরি চক্রবর্ত্তী সব কিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি সব ভক্তগণকে সুন্দর ভাবে প্রসাদ পরিবেশন করেছিলেন।

প্রসাদ নেওয়ার পর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সেবককে (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে) বললেন, "আমার জিনিস কোথায়?" বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তখন বুঝতে পেরেছিলেন, কী প্রভু চাইছেন—ওই জিনিসটা কী বলতে দরকার ছিল না। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুকে হরিতকি ফল দিলেন (খাওয়ার পর তিনি হরিতকি মুখশুদ্ধির মত খেতেন)। ওই হরিতকি দেখলে অক্রোধ-পরমানন্দ নিত্যানন্দরায় একবার ক্রোধ অভিনয় করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা হঠাৎ করে তুই কোত্থেকে পেয়েছিস?" বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বললেন, "প্রভু,

আপনি সকাল বেলায় প্রসাদ পেলেন আর একজন ভক্ত কয়েকটি হরিতকি ফল দিলেন, তিনি জানেন যে, আপনি হরিতকি প্রতি দিন পান। আমি আপনাকে কিছু সকাল বেলায় দিলাম আর কিছু আমার কাছে পরের দিনের জন্য রাখলাম।" তিনি সত্য কথা বললেন কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু সেটা শুনে রেগে গেলেন, "তোমার সঞ্চয় বুদ্ধি একদম গৃহস্থের মত ! তুই কালকের জন্য জিনিস সঞ্চয় করেছিস !"

গৃহস্থলোক সব সময় পরের দিনের জন্য সব কিছু রাখেন, "আমি কালকে কী খাব? কালকে কী পরব?" তারা সব সময় চিন্তা করেন, "আমি যখন বৃদ্ধ হব, তখন আমার কে দেখবে?" আর নিত্যানন্দ প্রভু তখন কী বললেন? "তোমার যদি এইরকম বুদ্ধি, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে না ! তুমি এই রামহরির বাড়িতে থাক, এখানে প্রচার কর।"

সেটা খুব সহজ জিনিস—কেন নিত্যানন্দ প্রভু এত রেগে গিয়েছিলেন? বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অন্যায্য করেন নি। তিনি তাঁর গুরুর জন্য ফল রেখেছিলেন, তাঁর দোষ কী? কিন্তু এখানে মূল কথা হচ্ছে যে, নিত্যানন্দ প্রভু একাই সর্ব্বত্র প্রচার করতে পারেন না, তাই ওই অজুহাতের সুবিধা নিয়ে তিনি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে ওখানে রেখেছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা মাথায় রেখে অনুসরণ করলেন এবং তাঁর নিজের সুখ-দুঃখ বিলিয়ে দিয়ে দেনুড় গ্রামে বাস করতে লাগলেন। ওখানে তিনি তাঁর বিখ্যাত শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখেছেন, ওখানে তাঁর সেবিত নিত্যানন্দ প্রভু ও মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ আছেন, ওখানে তাঁর শ্রীসমাধিমন্দিরও আছে। সেই রকম ছিল তাঁর জীবন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেছেন আর সবাই দেখে বলছেন, গ্রন্থের নামটা ভুল হয়ে গিয়েছে—তার নাম দেওয়া উচিত ছিল 'শ্রীনিত্যানন্দ-ভাগবত্' কারণ তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর কথা ওখানে বেশী লিখেছেন। এইরকম ছিল তাঁর নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণের প্রতি আসক্তি।

এই তীর্থ একশো বছর আগে একদম পরিত্যক্ত হয়েছিল। যখন পূজ্যপাদ ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ

শ্রীনবদ্বীপধামে পরিক্রমা প্রথম স্থাপন করেছিলেন, তখন তিনি এক এক করে প্রায় সমস্ত তীর্থ পুনরায় আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মস্থানে জমি সংগ্রহ করে একটি ছত্র নির্ম্মাণ করেছিলেন আর কয়েক বছর পর, ১৯৩৪ সালে, তিনি এখানে এই সুন্দর মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পাদপদ্মের কৃপায় আমরা এখানে আজকে আসতে পারি এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লীলা ও মহিমা স্মরণ করতে সুযোগ পাই।

১৯৬৭ সালে আমাদের পরম গুরু মহারাজ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা ওই প্রবন্ধ এখানে নিম্নে উপস্থাপন করলাম :

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর

“আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর” উপদেশ করিলেন “তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা আমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” ; আর “শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস” মহাশয় বলিলেন—“এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে, তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে !” ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? মনে করিয়াছিলাম ভক্ত আবেগভরে মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন—ইহা এমন ধর্ত্তব্য নয়। কিন্তু একি ! বৈষ্ণবাচার্য্য বলিলেন—ইহাতে ঠাকুরের জীবের প্রতি অত্যধিক করুণারই কথা প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। এ আবার কি? অবাক বিস্ময়ে উৎকর্ণ হইলাম। আচার্য্য বলিয়া চলিলেন—শ্রীভগবান্ বা অন্যান্য আচার্য্যগণও যে মহাপরাধিগণকে উপেক্ষা করিয়াছেন—ঠাকুর বৃন্দাবন সেই সব অতি পাতকী পাষণ্ডকুলকেও উপেক্ষা না করিয়া নিজ দায়িত্বে দণ্ডদান করিয়াছেন। ইহাতে “অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য” দলের সঙ্গে যাহা হয় একটী ভাল মন্দ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া

শ্রীভগবানের দরবারে তাহাদিগকে টানিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁর ভক্তের মর্য্যাদা লড়াইএ আপাত মধুর করিতে গিয়া বিক্ষোভকারী সম্প্রদায়কে কিছু কন্সেসান (বিশেষ অধিকার সুবিধা) দিলেন, তা ছাড়া বুঝাইলেন তাঁদের অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বেই একটী গ্রাণ্ট্ (অনুদান) হইয়া যাওয়া— তাদের চির দারিদ্রের অবসানের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে—"ভক্তপদ ধূলি আর ভক্তপদ জল, ভক্ত ভুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল"—এই ফরমূলাটীর অনুধ্যান করিতে পারিলেই তাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। যে কোনরূপে "লাঠি-চার্জ" বা "লাথি চার্জ" যখন হয়েছে তখন কর্তৃপক্ষ কিছু না দিয়া যান্ কোথায় ! 'নাস্তি যুদ্ধং নিরামিষম' কর্তৃপক্ষের নিকট পুলিশের বিরুদ্ধে একটী ভাল মন্দ অভিযোগ খাড়া করিতে পারিলেই (নাড়া দিলেই গুঁড়া পড়ে—ন্যায়ে) লাভের সম্ভাবনা—ইহা কি আজকালকার কালে আবার নূতন করিয়া শিখাইতে হইবে? সুতরাং শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর তোমাদের একটী হুজ্জুত বাধাইবার যে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন—তাতে তাঁর কাছে তোমরা কত ঋণী মন দিয়ে বুঝ ত ! সর্দ্দার বলিলেন—ঠিক বলিয়াছেন ; আমরা—শ্রীবৃন্দাবনের সম্পত্তি লুট করিয়া আরও জোড়দার বিক্ষোভ করিব। আচার্য্য কহিলেন— সেখানে তারা লুটের মালে এত মহামূল্য সম্পদ পাইল যে আর কর্ত্তৃপক্ষকে না জানাইয়াই চুপি চুপি ভরপুর হৃদয়ে নৃত্য কীর্ত্তন মহোৎসব আরম্ভ করিয়া দিল। শ্লোগান হইল "আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়"। ভক্তপদ ধূলি আর ভক্তপদ জল, ভক্ত-ভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল।

* * * * * * * * *

আর একটি অমূল্য প্রবন্ধ আমরা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছ থেকে পাই :

—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জীবনী—

(প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিলিখিত)

বর্দ্ধমান-জেলার পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বস্থলী-থানার অন্তর্গত মামগাছী-নামে একটী প্রাচীন পল্লী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই মামগাছী-

গ্রামকে প্রাচীনগণ ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র লেখক নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুম-দ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মামগাছী-গ্রামের প্রান্তদেশেই ভাগীরথী প্রবহমান। এই গ্রামে এখনও ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাসের সেবা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তির নিত্যপূজা সাধিত হইতেছে। কথিত হয় যে, ঠাকুর বৃন্দাবন এইগ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। আজও বৃন্দাবনদাসের বাল্যকালের বিচরণভূমি বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীটি নির্দ্দিষ্ট হয়।

শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবীর মামগাছী-গ্রামে পিত্রালয় ছিল। শ্রীনবদ্বীপ-নগরের শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী দেবীর মামগাছী-গ্রামে বিবাহ হয়। মালিনী শেষ বয়সে স্বীয়-পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশের কাহারও সহিত নারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভেই শ্রীবৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুকালেই ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীভগবান্ চৈতন্যচন্দ্রের সেবানিরত হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করায় তাঁহার কথা বিশেষভাবে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে হরিপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় পিতৃবংশের পরিচয়ে শ্রীবৃন্দাবনদাসের পরিচয় হয় নাই।

আজও শ্রীবাসপত্নী মালিনীর ভিটাস্থিত শ্রীবৃন্দাবনদাস-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়া যথাবিধি সেবিত হইলেও সেবাটী তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও উজ্জ্বল নাই।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় অনেক সময় দেনুড়েই ছিলেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সংসার-পরিগ্রহের কোন কথা আমরা শুনিতে পাই নাই। তিনি চারিটী শিষ্যের মধ্যে শ্রীরামহরি-নামক একটী উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে স্বীয় দেনুড়াস্থিত সম্পত্তিসমূহের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তাঁহার বংশধরগণই এখনও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দেনুড়পাট বাটীতে অবস্থান করিয়া সেবা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। রামহরি স্বয়ং সংস্কারসম্পন্ন হইয়া দীক্ষিত হইলেও কালপ্রভাবে অবৈষ্ণব স্মার্ত্তাচারের প্রাবল্যে তদীয় অধস্তনগণ কয়েক

পুরুষ হইতে স্মার্ত্তশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া সামাজিক সদাচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পিতৃকুলের অধিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত ছিলেন, জানা যায়। মাতৃকুল শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত আশ্রিত এবং সর্ব্বপ্রধান গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলিয়া, সেই পরিচয়েই তিনি বৈষ্ণবজগতে ও গৌড়ীয় সাহিত্যিক-সমাজে পরিচিত।

শ্রীনারায়ণীর গর্ভজাত ঠাকুর মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং বৈষ্ণবাচারে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-গুরুবর্গের মহিমা প্রচার করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টাবিশিষ্ট ছিলেন।

বৈষ্ণববিদ্বেষী স্মার্ত্তসমাজ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষপরবশ হইয়া শ্রীনিত্যানন্দদাস শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞাপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তসমাজের উন্নত চূড়ায় স্থান দেন নাই। ছলনামূলে তাঁহার কুলগত কুৎসা-প্রচারাদি-মুখে নানা অসৎকথার অবতারণা পর্যন্তও করিতে ক্রটি করেন নাই।

শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ পরিহারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের মাতা নারায়ণী চারি বৎসর বয়সের বালিকা মাত্র। সেই সময় তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের স্নেহ-দৃষ্টিতে সম্বর্দ্ধিতা ছিলেন। পরবর্ত্তীসময়ে তিনি শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয়ে পতিগৃহ লাভ করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাসের পৌগণ্ডকাল পর্যন্ত পুত্ররত্নের পালনাদি করিয়াছিলেন। সাময়িক স্মার্ত্তগণের কুহকে পড়িয়া কোন কোন রাঢ়দেশীয় অনভিজ্ঞ প্রাকৃতসাহজিক বৈষ্ণবব্রুবগণ তাঁহাকে তাৎকালিক ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, তিনি প্রকৃত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া পারমার্থবিরোধী স্মার্ত্তসমাজের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এই মহাত্মার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-প্রকটিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারে ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বোত্তম দিক্পাল। যে সময়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্র বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ শান্তিপুরে বাস করিয়া

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রচারিত পারমার্থিকধর্ম্মের উৎসাদন-মানসে বন্দ্যঘটীয় শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য-পুত্রের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং যে সময়ে শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর পুত্রপ্রতিম শিষ্যত্রয় স্মার্ত্তশাসনের করাল কবলে নিগৃহীত হইয়া পঞ্চোপাস্তের অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহের সম-সিংহাসনে রাখিতে বাধ্য হন এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ সামাজিক বিধি-অনুসারে বারেন্দ্রের সহিত গঙ্গাঠাকুরাণীর যৌনসম্বন্ধকে রাঢ়ীয় শ্রেণীতে গঙ্গোপধ্যায়-কুলে পরিণত করিবার কথা আলোচিত হয়, সেই সময় শ্রীউদ্ধারণঠাকুর প্রভৃতিকে দীক্ষা-বিধান-দ্বারা দৈক্ষ্যসাবিত্র্যব্রাহ্মণকুলে গ্রহণ-প্রভৃতি বিচারের প্রতিকূল চেষ্টাসমূহ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের বৈষ্ণব-সমাজের প্রতিষ্ঠা-সংবর্দ্ধনে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল। তথাপি গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-সূর্য্য শ্রীনিত্যানন্দৈকপ্রাণ গৌরভক্তাগ্রণী ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীচৈতন্যভাগবতে সত্যকথা লিপিবদ্ধ করিতে নিরস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কথিত নিরস্তকুহক সত্য হইতে বিপথগামী হইতে পারেন না।

শ্রীল ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিভিন্ন স্থানে ভক্তি-সিদ্ধান্তের অপূর্ব্ব সামাজিক মীমাংসা স্বর্ণাক্ষরে খচিত আছে। শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দে তাঁহার-সেবাপ্রবৃত্তি অতুলনীয়া। সমগ্র জগৎ, ভারতবর্ষ, গৌড়দেশ, শ্রীনবদ্বীপধাম প্রভৃতির কোন বিদ্বন্মণ্ডলী বা তাৎকালিক সমাজ তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিবার প্রবল চেষ্টাকল্পে তাঁহার ব্যক্তিগত কুল ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রসন্নচিত্তত্বের প্রতি কটাক্ষ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সর্ব্বসদ্‌গুণাবলীকে আক্রমণ করিবার জন্য কদর্য্যস্বভাব লোকের অভাব নাই। এই বৈষ্ণব-বিদ্বেষিভাব পোষণ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার নিত্যদাসগণ অবৈষ্ণবের প্রতি নিতান্ত বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরপ্রচারিত সহিষ্ণুতা ধর্ম্মের আদর্শে ও 'তৃণাদপি সুনীচ' ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে অনভিজ্ঞ লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাসগণ তদুত্তরে বললেন যে, এইরূপ সমালোচনা করিতে গিয়া তাদৃশ কদর্যস্বভাব ভক্তিবিরোধি-জনগণ সাহিত্যিকের বেশে নৈতিকের পীঠে আরোহণপূর্ব্বক যে লোকপ্রতারণাকার্য্যে বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন, তাহা তাহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয়মাত্র। সুকৃতির অভাব হইলেই এই প্রকার গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার দুঃসাহসে প্রবৃত্তি হয়। বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক প্রেমধর্ম্মের সহিত অপ্রীতিকর বিরোধ-ধর্ম্মের সমন্বয়-প্রয়াস হইতেই সৎসাম্প্রদায়িকের প্রতি অবিবেচক সমন্বয়বাদী যে কুতর্ক উপস্থাপিত করেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও মৎসরতামূলে উদ্ভূত। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কায়মনোবাক্যে গুরুনিত্যানন্দ-সেবায় সম্পূর্ণভাবে বিভাবিত, সুতরাং তাঁহার অনুষ্ঠানাবলীতে দোষারোপ করিবার সামর্থ্যভার সাহিত্যিককে বা অনভিজ্ঞ নীতিবাদীকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ন্যস্ত করেন নাই। এই সকল সমালোচক যে কালে জাগতিক ষড়্রিপুর আধারে যথেচ্ছাচার নৃত্য হইতে বিরত হইবেন, সেই সময়ই তাঁহারা শ্রীঠাকুর মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়গণের একমাত্র গুরুদেব বলিয়া জানিতে পারিবেন এবং স্ব-স্ব-গুর্ব্বপরাধ-জন্য অনুতপ্ত হইবেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের লিখন-প্রণালী প্রাঞ্জল ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র-বর্ণনে ; শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকটকালীয় সামাজিক অবস্থা-বর্ণনে ; ভোগিপাল, যোগিপাল ও মহীপাল প্রভৃতির গীতাদির সাহিত্যিক স্থান-নির্দ্দেশে ; তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের ‘কালে ভদ্রে পুণ্ডরীকাক্ষ’ প্রভৃতি নামগ্রহণ-বর্ণনে ; শ্রীগৌরসুন্দরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা প্রভৃতি অঙ্কনে শ্রীঠাকুর মহাশয় যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌড়ীয়সাহিত্যের সৌন্দর্য্যদ্রষ্টৃগণ সাহিত্যমন্দিরে প্রবেশার্থিগণও গৌড়মণ্ডলের অধিবাসিগণের মায়িক ভোগবৃত্তি ব্যতীত বৈকুণ্ঠের সাহিত্যগত বিচিত্রতা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইবেন। গৌড়ীয়গণ কেবল গৌড়দেশবাসী নহেন, তাঁহারা গৌড়ীয়ভাষার সাহায্যে নিত্য গোলোকে অবস্থিত মুক্ত পরিকরগণের ভাষায়ও নৈপুণ্য লাভ করিয়া আপনাদিগকে সেশ্বর গৌড়ীয় বলিয়া জানিতে পারিবেন।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কথা আমাদিগের পূর্ব্বগুরুদেব শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য শেষ করিলাম :—

“ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যা’তে জানিয়ে মহিমা।
যা’তে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন জানি’ করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন।
সেই মহা-বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি’ তিঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁ’র গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তাঁ’র কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥
সূত্র করি’ সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি’ ধ্যান।
তাঁ’র আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস।
তাঁ’র কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥”

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৮ম পঃ)

“বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিল রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥

(ঐ আদি ১১শ পঃ)

চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দবান।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন॥

(ঐ আদি ১৩শ পঃ)

চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
তাঁ’র আজ্ঞায় করোঁ তাঁ’র উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥
ভক্তি করি’ শিরে ধরি’ তাঁহার চরণ।
শেষ-লীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন॥

(ঐ মধ্য ১ম পঃ)

সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার॥
এ সকল লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি’ বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।

দম্ভ করি' বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি ॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥
তাঁ'র সূত্রে আছে তিঁহ না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন ॥
অতএব তাঁ'র পায়ে করি নমস্কার।
তাঁ'র পায় অপরাধ না হইক আমার ॥

(ঐ মধ্য ৪র্থ পঃ)

বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥
তাঁ'র ত্যক্ত 'অবশেষ' সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়ে আদিব্যাস ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥
যে কিছু বর্ণিলুঁ, সেহ সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারেন তবু রাখিয়াছেন লিখিয়া ॥
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন সেই রূপম-প্রমাণে ॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিলা বর্ণনে ॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহেন আগে ব্যাস করিলা বর্ণনে ॥
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু—দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তিঁহো কৈলা পান ॥
তাঁ'র ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা ॥"

(ঐ অন্ত্য ২০শ পঃ)

আরে ভাই ! নিতাই আমার দয়ার অবধি !
জীবেরে করুণা করি' দেশে দেশে ফিরি' ফিরি'
প্রেম-ধন যাচে নিরবধি ॥
অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ ধরণে না যায় অঙ্গ
গোরা-প্রেমে গড়া তনুখানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে, বাহু তুলি' হরি বলে,
দু-নয়নে বহে নিতাইয়ের পানি ॥
কপালে তিলক শোভে, কুটিল-কুন্তল-লোলে,
গুঞ্জার আঁটুনি চুড়া তায়।
কেশরী জিনিয়া কটি, কটিতটে নীলধটি,
বাজন নূপুর রাঙ্গা পায় ॥
কে কহু নিতাইর গুণ জীবে দেখি সকরুণ
হরিনামে জগত তারিল।
মদন মদেতে অন্ধ বিষয়ে রহল ধন্ধ
হেন নিতাই ভজিত না পাইল ॥
ভুবনমোহন বেশ ! মজাইল সব দেশ !
রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস !
প্রভু মোর নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ-কন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

বিমল হেমজিনি তনু অনুপম রে !
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটী পুলক রে !
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥
জিনি' মদমত্ত হাতি গমন মন্থর অতি
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ-বসন ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গৌরা-অঙ্গে লহরী খেলায় ॥

চলিতে না পারে গোরা- চাঁদ গোঁসাঞি রে
বলিতে না পারে আধ-বোল।
ভাবেতে আবেশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি' দেয় কোল ॥
এ সুখ-সম্পদ-কালে গোরা না ভজিনু হেলে
হেন পদে না করিনু আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

উপসংহার

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি',
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পে'য়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥

আমার শোচনা

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপায়, গৌরহরির কৃপায় আপনারা সুষ্ঠু ভাবে, সুন্দর ভাবে, কোন বিঘ্ন ছাড়াই ধামপরিক্রমা সমাপ্ত করেছেন। প্রতি বৎসরের মত এই বছরও ধামপরিক্রমা আজকে সমাপ্ত করেছেন। গুরু, ধামের কৃপা ছাড়া, ধামবাসী-বৈষ্ণবগণের কৃপা ছাড়া, ধামেশ্বর মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া, নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ছাড়া, সবাই এই ধামপরিক্রমা সমাপ্ত করতে পারেন না। সবাইয়ের দ্বারা ধামপ্রিক্রমা হয় না। এইটা সব সময় মনে রাখবেন।

আজকে গৌরাবির্ভাব তিথির অধিবাস, আমাদের খুবই আনন্দের দিন কিন্তু মাঝখানে আবার নিরানন্দ হয়ে যায়। কেন না ? আপনারা এই পরিক্রমা করেন ব্যাসদেব গোস্বামী, শুকদেব গোস্বামী, ব্রহ্মা, শিবাদি, সমস্ত ভক্তগণের সঙ্গে, গৌরহরির সঙ্গে, নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে, গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে, বৈষ্ণবগণের সঙ্গে, কত দেব-দেবতার সঙ্গে—আপনারা কেউই সেটা বুঝতে পারছেন না, আমরাও বুঝতে পারছি না। পরিক্রমার সময় কত দেব-দেবী এই ধামপরিক্রমা করতে স্বর্গলোক থেকে এখানে চলে আসে—ব্রহ্মালোক থেকে ব্রহ্মা চলে আসেন, শিবলোক থেকে শিব চলে আসেন, ব্যাসদেব গোস্বামী, শুকদেব গোস্বামী ইত্যাদি—এঁরা সবাই এই ধামপরিক্রমা করতে আসেন। স্বয়ং ভগবানের লীলা-ভূমি, এই লীলা-ক্ষেত্র তারাই পরিক্রমা করতে আসেন কিন্তু আমরা এই সাধারণ চক্ষু দ্বারা সেটা বুঝতে পারি না, সেটা জানতেও পারি না। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এটাই যে, আপনারা এই ধামপরিক্রমা করে ভাবছেন, “কখন চলে যাব ?” অনেকে মধ্যম পরিক্রমা করে বিকালেই বেরিয়ে গিয়েছেন—পরিক্রমা শেষ না করে তিন দিন করে আজকে বলেন,

"তিন দিন থাকলাম, এখন বাড়ি চলে যাই।" অনেকে চলে যাচ্ছেন কিন্তু পরিক্রমাটা সম্পূর্ণ হয় না, সেটা তাঁদের দুর্ভাগ্য…

এই দিনটাকে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সব সময় বলতেন, "নবদ্বীপ ধামপরিক্রমার পরে, জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ-মহোৎসবের পরে অনেকেই গঙ্গা পেরিয়ে আবার তারা মায়ার জগতে চলে যায় !"

এক বছর যে দিন সবাই চলে যাবেন—সেই দিন সবাই প্রভুপাদকে দেখা করে, একটু প্রণাম করে চলে যাবেন কিন্তু ওই বার প্রভুপাদ দেখা দিচ্ছেন না। প্রভুপাদ খুব কষ্ট পাচ্ছেন—দরজার আড়ালে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলছেন ! প্রভুপাদ বলতেন, "আপনারা ধামপরিক্রমা করলেন, আপনাদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা আপনারা ভুলে যাবেন না তো !"

এই জগতের পিতা, মাতা, ভাই, বোন, এইসব সম্বন্ধ দুদিনের সম্বন্ধ কিন্তু গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধটা হয়েছে, সেটা জন্ম-জন্ম-অন্তরের সম্বন্ধ। সেইটা যে বুঝতে না পারে, সে সত্যিকারের গুরু হতে পারে না, সে সত্যিকারের শিষ্য হতে পারে না। এটা সব সময় আপনাদের মনে রাখতে হবে। সম্বন্ধ-জ্ঞানটা বুঝতে হয়, সম্বন্ধ-জ্ঞানটা জানতে হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানটা সাধারণ এই বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে হয় না, বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝতে পারা যায় না।

সেইভাবে, ওই দিন সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন, "প্রভুপাদ কোথায় গেলেন ?" ঘরে তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না । শেষে কেউ দেখলেন বাথরুমের দরজা খুলে ছিল—সেখানে ঢুকে দেখতে পেলেন, বাথরুমের দরজার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রভুপাদ কাঁদছেন। সবাই তাঁকে ধরে নিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তখন প্রভুপাদ বললেন, "আপনারা এতদিন পরিক্রমা করলেন, কৃষ্ণের সংসারের সদস্য হয়ে থাকলেন আবার এখন এই মায়ার জগতে চলে যাচ্ছেন, মায়ার বন্ধনে পড়ে যাচ্ছেন ! সেই মায়ার জগৎ থেকে আমরা দ্বারে দ্বারে ভক্তগণকে পাঠিয়ে আপনাকে কৃষ্ণের পরিবারে সদস্য করলাম, আবার আপনারা সেই মায়ার জগতে চলে গিয়ে ভগবানকে ভুলে

যাবেন না ত ! আমাকে ভুলে যাবেন না ত ! আমার সঙ্গে যে সম্বন্ধটা হয়েছে, সে সম্বন্ধটা ভুলবেন না ত !”

শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজও বলতেন, “লোকে পরিক্রমা করতে আসল, যার যার ঘরে চলে যাচ্ছে এটা আবার প্রভুপাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়া আর কষ্ট কী আছে ?” আপনারা অনুভব করতে পারলেন যে, প্রভুপাদ কত গুহ্যের কথা বলেছেন, কত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের কথা বলেছেন। এটা সাধারণ ব্যক্তিরা কখনও বুঝতে পারেন না। এটাকে বলা হয় *বিরহ*।

যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা এবং দ্বারকায় চলে গেলেন, ব্রজগোপীরা তখন চোখের জলে, নাকের জলে সব কিছু একাকার করেই কৃষ্ণের জন্য শুধু হাহাকার করছেন । যাঁকে দেখতে পারছেন, তাঁরা কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। বৃক্ষকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাঁরা বললেন, “এই পথ দিয়ে গিয়েছে ! এই যে পায়ের নূপুরগুলো পড়ে আছে ! প্রভু কি আমাদের ভুলে গেল ? এত নিষ্ঠুর ! ও কি আমাকে মরে রাখতে পারল না ! ও কি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল ! ও এত নিষ্ঠুর ! ওকে আমরা এত ভালবাসি, ওকে ছাড়া কিছু জানি না, ওকে ছাড়া কিছু বুঝতে পারি না কিন্তু ও আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল !”

সেইভাবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীতে ছিলেন, তিনি তখন সে বিরহ আস্বাদন করতেন। একে বলা হয় বিপ্রলম্ভ-লীলা, বিরহ-লীলা। বিরহ দিয়ে আনন্দটা বেশী পাওয়া যায়—সংযোগে আনন্দ পাওয়া যায় না, সংযোগের চাইতে বিয়োগে আনন্দটা বেশী। সংযোগে আনন্দটা ক্ষণস্থায়ী আনন্দ কিন্তু বিয়োগের যে আনন্দ সেই আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে বা মুহূর্তে মুহূর্তে আপনারা ভাব করতে পারবেন। যদি কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যিকারের সম্বন্ধ হয়, গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, তাহলে আপনারা সব বুঝতে পারবেন।

সেইভাবে, এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আপনাদের ভালো করে বুঝতে হবে। সে রামানন্দের সংবাদ যদি আপনারা পড়েন, তখন দেখতে পাবেন যে, এটা অত্যন্ত উচ্চতম মার্গের কথা।

আজকে আপনারা দেখলেন যে, চাঁপাহাটিতে গিয়ে সেখানে আমরা গীতগোবিন্দ কীর্ত্তনটা করলাম না। গীতগোবিন্দ থেকে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" সেই জয়দেব-পদ্মাবতীর কথা এখানে আমরা বললাম, আমি এখানে বুঝতে পেরেছি কিন্তু সেই জয়দেবের বিরহের কথা কাকে বলব, কাকে শুনাব ? কে বুঝতে পারবে, বলুন ?

এই সব সম্বন্ধটা ভুলে গেলে চলবে না। এই সম্বন্ধ দুইদিনের সম্বন্ধ নয়। শুধু দীক্ষা নিয়ে চলে গেলাম, গুরুর চিন্তা করতে পারলাম না, কিন্তু বুঝতে হবে : গুরুকে কী দিতে পেরেছি ? গুরুর জন্য কতটা ভালবাসতে পেরেছি ? গুরুর জন্য কতটা করতে পেরেছি ? সেইটা সব সময় আপনাদের চিন্তা করতে হবে।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ (চৈঃ চঃ, ৩/৪/১৯২)

দীক্ষা মানে দিব্য-জ্ঞান। যাঁরা সেই করে তারাই আত্মসম, তাঁদেরকে নিজের আত্মার সম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন। আপনাদের সব সময় সেই চিন্তা করতে হবে, এই রকম ভাবটা আসতে হবে। সেই ভাবটার জন্যই, সেই লীলা করবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসেছিলেন। যদি আপনারা রাধা-বিরহ শুনবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, তাঁর কী বিরহের জ্বালা।

বাঁশি বারণও মানে না, কথা যে শুনে না,
ও মরা কেন মরে না।
বাঁশির কোন লাজ নাই, দিবানিশি ডাকে-তাই
আমি যত দূরে যাই, বাঁশি বলে এস রাই,
কেন যে সময় বুঝে না।
দুষ্ট বাঁশি দুষ্টামি প্রীতের পাগলামি
ও মরা কেন মরে না।

কৃষ্ণও বলেন, "ওরে সুবল ! আজকে তো বলরাম নেই, আজকে আমি আর গো চারণে যাব না !" বলরামও সে দিন বললেন, "আজকে তো কৃষ্ণ নেই, আজকে আমি আর গো চারণে যাব না !"

সেই বিরহ বুঝতে হবে, সেই বিরহ কথার চিন্তা করতে হবে। ভগবানের নিজের জন গুরুপাদপদ্মকে ভুলে গেলে চলবে না। আমরা মীরাবাইয়ের মত ভজন করি না—শুধু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করা আমাদের লাইন নয়।

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণ-ভজন তব অকারণ গেলা ॥

রাধা ভজন যদি করতে না পারি, কৃষ্ণ ভজন করে কিছু হবে না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিনা গৌরকে পাওয়া যাবে না, শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাদ দিয়ে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না ! গুরু বাদ দিয়ে ভগবানকে ভজন করলে কিছু হবে না। এই সব সময় চিন্তা করতে হবে।

জয় শ্রীল গুরু মহারাজ কি জয়। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা কি জয়।
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ কি জয়

— • • • —

শ্রীগৌরাবির্ভাব কীর্ত্তন

(১) শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব বাসরে

(শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

অরুণ বসনে সোনার সূরজ
উদিছে কেন রে আজ।
বসন্ত সুষমা উজারি আপনা
ঢালে কেন জগমাঝ॥
তরু গুল্মলতা অপূর্ব্ব বারতা
বহে কেন ফলে ফুলে।
ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গে কেন হেন রঙ্গে
সঙ্গীত তরঙ্গ তুলে॥
পতিত দুর্জ্জন কেন রে গর্জ্জন
উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।
বিদ্যা কুল ধন অভিমানী জন
কেন ম্লান দুঃখ ভরে॥
আকাশ বাতাস ঘুচাইয়া ত্রাস
আশ্বাসে ভাসায়ে দেয়।
সাধুজন মন সুখ বিতরণ-
আবেশে উন্মাদ হয়॥
চৌদিকেতে ধ্বনি কি অপূর্ব্ব শুনি
বহুজন উচ্চরোল।
হরে কৃষ্ণ রাম নাম দিব্যধাম
হরি হরি হরি বোল॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমা হিন্দোল রঙ্গিমা
স্বজন-ভজন রাগে।
সংকীর্ত্তন সনে মরম গহনে
না জানি কিভাব জাগে ॥
সন্ধ্যা সমাগম তপন মগন
কেন হেম ঘন কোলে।
অপরূপ কত পূরব পর্ব্বত
স্বুবর্ণ চন্দ্রমা ভালে ॥
স্বুবর্ণ চন্দ্রমা পশিছে নীলিমা
সে নীল বিলীন হেমে।
ইথে কিবা ভায় সাধুজন গায়
কলঙ্ক না রহে প্রেমে ॥
মহাজনে বলে গ্রহণের ছলে
সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্রোদয় পাপ রাহু ক্ষয়
চন্দ্রশোভা প্রেম ধন ॥
মর্ম্মজ্ঞ সকলে কহে কুতূহলে
নীলিমা বিলীন চাঁদে।
ছন্ন অবতার লুকান কাহার
রাধা-রুচি-রূপ-চাঁদে।
ইথে হেন স্তুতি রাধাভাব দ্যুতি
স্বুবলিত শ্যামরাও।
উদিল গৌরাঙ্গ নাম-প্রেম সঙ্গ
জয় জয় গোরা গাও ॥

(২) শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব

(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত— চৈঃ চঃ ১/১৩/৮৯-১২৪)

চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ॥
সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ,অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি' চন্দ্রে বাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল সকল ভুবন।
চমৎকার হৈয়া লোক ভাবে মনে মন॥
জগৎ ভরিয়া লোক বলে— 'হরি' 'হরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি'॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥
'হরি' বলি' নারীগণ দেই হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হৈল দশ দিক্, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥
দদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজহতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয়॥

সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে ॥
দেখি' উপরাগ হাসি', শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥
আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই' স্নান কৈল গঙ্গা-জলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥
এইমত ভক্তযতি, যাঁর যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে, করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি',
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি' বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥
সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।

নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করেন দরশন ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত ।
নর্ত্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি' নাচে পাঞা প্রীত ॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল ।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥
আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি' তাঁরে করে সাবধান ।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান ।
যত নর্ত্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর 'মালিনী',
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে ।
সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর 'সীতা ঠাকুরাণী' ।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥

সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥
দুর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া ।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি', সঙ্গে লঞা দাসী-চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত ।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥
সর্ব্ব অঙ্গ—সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময় ।
বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই ।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥
পুত্ত্রমাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্ত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি' ।

শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা-ঠাকুরাণী ॥
ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত ।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য-কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥
মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান ।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥
লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে ।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,—এই তারিবে সংসারে ॥
ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥
পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস ।
ইঁহা-সবার শ্রীচবণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

পরিশিষ্ট

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তি নির্মল আচার্য্য মহারাজের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

- শ্রীউপদেশ (১, ২, ৩, ৪)
- শ্রীপুরীধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা

শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ
- রচনামৃত
- শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমামৃত
- প্রকৃত উৎসের সন্ধানে
- পরমানন্দময় ধামের ধন

শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীভক্তিরক্ষক হরিকথামৃত
- শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
- প্রেমময় অন্বেষণ
- শাশ্বত সুখনিকেতন
- সুবর্ণ সোপান
- শ্রীশ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
- শ্রীশিক্ষাষ্টক
- অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের বহ্নিগর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলার সমাহার
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর :

- শরণাগতি
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
- শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ
- কল্যাণকল্পতরু
- পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়

বিবিধ

- শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
- শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
- শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
- শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ
- শ্রীগর্গ-সংহিতা
- শ্রীগৌড়ীয়-গিতাঞ্জলি
- শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রণালি
- শুদ্ধভক্তি সাধন সম্পদ
- শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের কেন্দ্রসমূহ

ভারত

আন্তর্জাতিক কার্য্যালয়

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ রোড,
কোলেরগঞ্জ, পোষ্ট অফিস ঃ নবদ্বীপ
জেলা - নদীয়া, পশ্চিবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২,
ভারত, ফোন : ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

নৃসিংহপল্লী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নৃসিংহপল্লী (দেবপল্লী), স্বুবর্ণবিহার,
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৪১৩১৫
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

কলকাতা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭, দম দম পার্ক (বিপরীত ট্যাঙ্ক ৩),
কলকাতা, পিন - ৭০০০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি, চিড়িয়ামোড়,
পোষ্ট - এয়ারপোর্ট, কলকাতা,
পিন - ৭০০০৫২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

হাপানিয়া

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
পোষ্ট এবং গ্রাম - হাপানিয়া
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ৮৯৬৭৭১৯১৫৮

বামুনপাড়া

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
গ্রাম - বামুনপাড়া, পোষ্ট - খানপুর
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুরী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড, গৌড় বাটসাহি
পুরী, পিন - ৭৫২০০১, ওড়িষ্যা, ভারত
ফোন : ৯৯৩৭৪৭৯০৭০, ৯১২৪৪৩৫৪৭৪

গোবর্দ্ধন

শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
দশবিসা, পোষ্ট - গোবর্দ্ধন
জেলা - মথুরা, পিন - ২৮১৫০২
উত্তর প্রদেশ, ভারত
ফোন : ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

বৃন্দাবন

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ও মিশন
১১৩ সেবা কুঞ্জ, বৃন্দাবন, জেলা - মথুরা,
পিন - ২৮১১২১, উত্তর প্রদেশ, ভারত,
ফোন : ৮২১৮৩৯৯৩০৯

শিলিগুড়ি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া,
১৫৫, নেতাজী সরনি, শিলিগুড়ি,
পিন - ৭৩৪০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ৭৬৭৯৬৫২৩৩৪

একচক্রা ধাম

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভাবাস (একচক্রা ধাম),
পোষ্ট অফিস - বীরচন্দ্রপুর,
জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২৪৫
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

নিউ দিল্লি

শ্রীলা শ্রীধর গোবিন্দ সুন্দর ভক্তি যোগা
কালচারাল সেন্টার, ফ্ল্যাট - ৬ (টপ ফ্লোর),
হাউস ২৩৯৪, তিলক স্ট্রীট, (ইম্পেরিয়াল
সিনেমার পিছনে), চৌনা মাণ্ডি, পাহারগঞ্জ,
নিউ দিল্লি - ১১০০৫৫
মোবাইল : ৯১ ৯৮১০৩০৯৫১১

তারকেশ্বর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভঞ্জিপুর, তারকেশ্বর, হুগলী
ফোন : ৭৪৭৭৮৮১৯২৬, ৯৭৩৫৯৮৫৪১৬

গঙ্গা-সাগর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - চকফুলডুবি, পোঃ - সাগর,
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

উলুবেড়িয়া
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কাজিয়াখালি, ৭১১৩১৫
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

মহিলা আশ্রম কালনায়
শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার
গ্রাম - শাশপুর, পোঃ - কালনা,
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

নাদনঘাট
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - নাদনঘাট,
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

মেদিনীপুর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - জানাপাড়া, পোঃ - মেদিনীপুর,
জেলা - মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৯৩৩৫৬৫৩০৫

মুর্শিদাবাদ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - মাহাদিয়া, পোঃ - কান্দী,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯০০২২১০২৪২

ইসলামপুর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - ইসলামপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

দিনহাটা
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও পোঃ - দিনহাটা
জেলা - কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

বেতুড়
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
বেতুড়, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

নৈহাটী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নৈহাটী, জেলা - উঃ ২৪ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ

পূর্ব বর্ধমান
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও সদাশিব আশ্রম
রতনদিঘি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন : ৯৭৩৪৩২৮৯৬০

পঞ্চপল্লী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
পঞ্চপল্লী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯১৪৪১৭৪৩৭৬

কাটোয়া
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - মেজিয়ারী, থানা - কাটোয়া
জেলা - পূর্ব বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

নোর্থ আমেরিকা

ইউ.এস.এ

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
২৯০০ নর্থ রেডিও গালর্চ রোড
সোকোয়েট, সিএ ৯৫০৭৩, ইউ.এস.এ
ফোন : (৮৩১) ৪৬২-৪৭১২
http://sevaashram.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
২৬৯ই, সৈনত জেমস স্ট্রীট
সান হোসে, সিএ ৯৫১১২, ইউ.এস.এ
ফোন : ৬০৫ ৫৫০৮৫৭৩

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মিশন
৭৪৫ সাউথ ৭০০ ইষ্ট সল্ট লেক সিটি,
উটাহ, ৮৪১০২

হাওয়াই

শ্রী চৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ মিশন
১৬২৫১ হালিয়াখালা হাইওয়ে, কুলা,
মাউই, হাওয়াই ৯৬৭৯০, ইউএসএ,
ফোন : ৮০৮৮৭৬৬৭২১

কানাডা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
২৯ ৯৯৫৫ ১৪০ স্ট্রীট,
স্থরে, ভি ৩ টি, ৪ এম ৪, কানাডা
ফোন : ৬০৪৯৬৩০২৮০

মেক্সিকো

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কলে ৬৯-বি, নং ৫৩৭, ফরাসিসি, সানতা
ইসাবেল, কানাসিন, ইউকাটন সি.ডি.
৯৭৩৭০, মেক্সিকো
ফোন : (৫২-৯৯৯) ৯৮২-৮৪৪৪

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
রিফরমা নং. ৮৬৪, সেক্টর হিডালগো
গুয়াডালাহারা, জালিসকো, সি.ডি.
৪৪২৮০, মেক্সিকো,ফোন : ৫২-৩৩
৩৮২৬-৯৬১৩

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
দিয়েগো দে মনটেমায়োর ৬২৯,
সেনট্রো, মনট্রেরারী, এন. এল.
সি. পি. ৬৪৭২০,
ফোন : ৫২-৮১ ৮০৫৭-১০৯৭

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
এভিনিডা দে লাস রোসাস ৯
ফ্রাকিওনামাইএনটো ডেল প্যারাডো
তাইওয়ানা, বি.সি., সি.পি. ২২৪৪০
ফোন : (৫২৬৬৪) ৬০৮-৯১৫৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ দি ভেরাক্রুজ,
এ.আর., জুয়ান দে দিওস পিজা ১৫৭
(এন্টার ইগনাসিও দি লা লিয়াভে
নিগারেট) ভেরাক্রুজ, ভেরাক্রুজ, সি.পি.
৯১৭০০
ফোন : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কোলোন পয়েন্ট ২১৩ - ইনট্রেরি ৭
কোল. সেনট্রো. সি.পি. ০৯৪৩০০,
ওরিজাবা, ভার., মেক্সিকো,
ফোন : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
ফেমানডো ভিলালপ্যানডো নং. ১০০
- ইনটি. ১০৩ কোল. গুয়াডলুপে ইন.
ডেলিগাসিওন এ্যালভারো ওবারেগন,
সি.পি. ০১০২০ মেক্সিকো সিটি,
ফোন : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কলে জেড ইডিএফ. ৪০ আইএনটি ২২
কল. ইউ এইচ আলিয়ানজা
পপুলার রিভোলিউসাইওনারিয়া,
ডেলিগাসিওন কোয়াওকন, সি.পি.
০৪৮০০ মেক্সিকো সিটি,
ফোন : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
জোয়াকুইন রিভাডেনিয়ারা নং. ৫০
কল. জারডিনেস দে গুয়াডলুপে
মোরেলিয়া, মিচ., সি.পি. ৫৮১৪০
ফোন : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
ক্যারিটেরা টাইকুল - ছাপাব, কিলোমিটার
১.৪, টাইকুল, ইউকাটন, মেক্সিকো

সাউথ আমেরিকা

ব্রাজিল

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
কৃষ্ণ শক্তি আশ্রম, পি.ও. বক্স ৩৮৬
ক্যাম্পাস ডু জোরডাও, সাও পৌলো,
ব্রাজিল, ফোন : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এবং কেসা প্রেমা (রেস্টুরেন্ট)
এ্যাভেনিডা ইউসেবিও মাটোসো, ২৪৬
পিনহেয়িরোজ, সাও পাউলো - এস পি
সেপ: ০৫৪২৩-০১০
ফোন: (১১) ৩৮১৫-১৪৪৮
http://casaprema.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ পোরটো এলিগ্রি
ইস্টাডা ছাপজু ডু সোল, ৬২০
পোরটো এলিগ্রি - সাউথ ব্রাজিল
ফোন : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এবং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭

ভেনেজুয়েলা

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম,
আবেনিদা টুয় কন আবেনিদা ছামা, ক্বিন্তা
পরমকরুণা, কারাকাস, ভেনিজুয়েলা
ফোন : ৫৮২১২৭৫৪১২৫৭

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, কল্লে ৭৭ এন্ত্রে
আবেনিদাস ১০ ও ১১, ফ্রেন্তে অ
এনেলবেন
ফোন : ৫৮২৬১৭৯৭৩০৮৯

পার্সেলামেন্ত মিরান্দ সেক্টর দে, কাল্লে
তেহেরো কন গ্বন্ত, কুমানা, এস্তাদো স্থক্রে,
ফোন: ৫৮০৪১৪৭৭৭৫৯৩৮
ইকোয়াডর

শ্রীলশ্রীধর স্বামী সেবা, আবেন্যু জেনেরেল
রুমিনাহুই, কাল্লে এ৭আ, ন৯-২৩৬,
আর্মেনিয়া, কোনোকোতো, ১৭০৮০১,
কুইটো, ইকোয়াডর
ফোন : ৫৯৩ ০২২৩৪২৪৭১

কলোম্বিয়া

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, বোগোটা, কার্রেরা
৭৪আ, নঃ৪৯আ-৭১, ১১০৯১১
ফোন : ০১১ ৫৭ ১ ৩২৭ ৪৩২ ০৮১৩

শ্রীশ্রীল গোবিন্দ সেবা আশ্রম, কেএম ৪,
পাইপা বিয়, পান্তানো দে বারগাস, পিন-
১৫০৪৪০-১৫০৪৪৯,
ফোন : ০১১ ৫৭ ৭ ৩১৩ ২২৭ ১১১৯

ইউরোপ

ইংল্যাণ্ড

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রীণ স্ট্রীট
লণ্ডন ই১৩ ৯০বি, ইউ.কে.
ফোন : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভক্তি যোগ ইনস্টিটিউট,
গ্রেভিলে হাউস, হাজেলমেরে ক্লোজ
ফেলথাম, মিডিলসেক্স, টি ডব্লউ ১৪ ৯পি
এক্স, ইউ.কে., ফোন : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com

আয়ারল্যাণ্ড

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সঙ্ঘ
এ্যাটেন: বরিয়ান টাইমোনি
(বালিনামোর কো. লেইট্রিম)
ফোন : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১

১৪, পার্কসাইড, ওয়েক্সফোর্ড টাউন,
কান্ট্রি ওয়েক্সফোআয়ারল্যাণ্ড
ফোন : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫

ইটালি

ভিলা গোবিন্দ আশ্রম
ভায়া রিগোনদিনো, ৫,২৩৮৮৭ ওলজিয়েট
মোল (এল সি) ফ্রাজ, রিগোনডিনো
রোসো, ইটালে, ফোন : ৩৯ ০৩৯
৯২৭৪৪৪৫
http://villagovinda.org

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ রোম
ভেদাভিলা যোগা স্টুডিও, ভায়া দি সন
মাইচেলে, ১২০০০১৫৩ রোমা, ইটালে
ফোন : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬

মালটা

দি লোটাস রোম যোগা সেন্টার মঠ
ফোন : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫

নেদারল্যাণ্ডস

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
এ্যাজোরেনওয়েগ ৮০
১৩৩৯ ভি পি আলমেরে, ন্যাদারল্যান্ডস
ফোন : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০

হাঙ্গগ্রে

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
এ্যানড্রাস নোভাক নাগিভানওয়ায়ি ইউ টি
৫২, এইচ-১০২৫ বুডাপেস্ট
হাঙ্গগ্রে, ফোন : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
ইন্ডোর সেজাপেসি—আনন্দ বর্দ্ধন ডি.
এইচ-১২২৩ বুডাপেস্ট
মুভেলোডস উটকা ১৮/বি, হাঙ্গগ্রে

টুরকে

শ্রী গোবিন্দ মঠ যোগা সেন্টার
আবদুল্লা কেভডেট সোকক
নং ৩৩/৮, কানকেয়া ০৬৬৯০
আনকারা, টুরকে
ফোন : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এবং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২

উকরাইন

কাইভ, হারমাতনয়া স্ট্রীট, ২৬/২,
"রোস্টক" প্লেস অফ কালচার
ফোন : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
১১/৪, পানফিলোসেভ স্ট্রীট
জাপোরোজিয়া, ৬৯০০০, উকরাইন
ফোন : (০৬১২) ৩৩-৪২-১৪

পর্তুগাল

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, রুঅ দো
সোব্রেইরো ৫, চিদ্রেইরো ৫, চিদ্রেইরো,
৩০২০-১৪৩,কোইম্ব্র

রাশিয়া

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কাল্চারেল সেন্টার
মস্কো, বলশয় কিসেল্নিয় টুপিক ৭/২
ফোন : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
সেন্টপিটার্সবার্গ, লাহ্টা
ফোন : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
তোম্স্ক, াকাদেম্গোরোদোক, বাবিলোবা
স্ত্রিট ১৬-৯০, ফোন : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

আবখাজিয়া

শেলো দজীঘুটা, ২য় আপ্সিল্স্কিয় টুপিক ১৫
ফোন : ৭ ৯৪০ ৭১২ ৫৮৪৮,
৭ ৯৪০ ৭ ৭০৬ ১০৮

এশিয়া

থাইল্যান্ড

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ আশ্রম
৭৯/২৩ মোওবান ওরাবোডিন
এসওআই ওয়াটসাডেট
পাটুমাথানি-রংসিট রোড, পাটুমাথানি,
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
ফোন : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

মালেয়েশিয়া

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা
আশ্রম, সাইটিয়ান
ফোন : ০১৭-৫৮৬২৮১৭ / ০১২-
৫০১২৮০৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সাধু সংগ্রাম খলঙ্গ.
নং ১৪, লোরঙ বেনধারা ৪৬এ,
তামান মেওয়া বারু, ৪১২০০ ক্লাঙ্গ,
সেলানগোর, মালেয়েসিয়া,
ফোন : +৬০ ৩-৫১৬১৬৭২১

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
পেটালিঙ জয়া সার্ভিস সেন্টার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান
খানাগাপুরম, ৪৬০০০ ফেটালিঙ জয়া,
সেলানগর, মালেয়াশিয়া, ফোন : +৬০-
১-৬৩৩৮৬১৩০

সিঙ্গাপুর

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ সিংগাপুর
এবং গোকুল ভেজিটেরিয়ান রেসষ্টুরেন্ট
১৯ এবং ২১, আপার ডিকসন রোড,
সিঙ্গাপোর ২০৭৪৭৮, ফোন :
৬৩৪৩৯০১৮
মোবাইল : ৯০২৩৬৩৪১ এবং
৯১৮৫৬৬১৩

ফিলিপাইন্স

শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
প্রযত্নে : গোকুলানন্দ প্রভু
২৩, রুবি স্ট্রীট, কাশিমিরো টাউনহাউস,
টালন ইউনো. লাস পিনাস সিটি,
মেট্রো মানিলা, জিপ কোড ১৭৪৭,
ফোন : ৮০০-১৩৪০

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফিলিপাইন্স ব্রাঞ্চ (ইসানি দেবী দাস)
লট ১৫ ব্লক ৮, উডব্রীজ সাবডিভিসন,
পোল্লাসিওন, প্যানডি, বুলাকান,
ফিলিপাইনস, ৩০১৪
ফোন : ৬৩ ৯২০৩১ ৬৩৭৫০
http://philippines.scsmath.org

সাউথ পেসিফিক

অস্ট্রেলিয়া

শ্রীগোবিন্দ ধাম
পি.ও. বক্স ৭২, উকি. ভায়া মুরউইলমবা,
এন.এস.ডব্লিউ. ২৪৮৪, অস্ট্রেলিয়া,
ফোন : ০২৬৬ ৭৯৫৫৪১

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
১৪, বরিয়ান স্ট্রীট বরিয়াঙ্গমেড
চার্মস, কিউএলডি, অস্ট্রেলিয়া ৪৮৭০
ফোন : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

নিউজিল্যাণ্ড

১০৩০ কোটেসভাইল রিভারহেড
হাইওয়ে,
রিভারহেড, অকল্যান্ড
নিউজিল্যাণ্ড, ফোন : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

ফিজি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
পি.ও. বক্স ৪৫০৭, লৌটকা, ফিজি
ফোন : ৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭,
৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭

আফ্রিকা

সাউথ আফ্রিকা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
৪৪৬৪, মৌন্ট রেইনে ক্রেসেন্ট
লেনাসিই সাউথ, এক্সটেন্সন ৪
জোহানেসবার্গ ১৮২০, ফোম : ০১১
৮৫২ ২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফ্যেনিক্স ৪০৬৮, ডুর্বন, ক্বাজুলু নাটাল
ফোম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মরিশাস

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ আন্তর্জাতিক
নবদ্বীপ ধাম স্ত্রিট, লোং মাউন্টন
ফোন : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওয়েবসাইট :
scsmathinternational.com

ইমেইল :
info@scsmathinternational.com

মন, তুমি তীর্থে সদা রত ।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া,   কাশী, কাঞ্চী, অবন্তীয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত ॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে,   এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে ।
সে কেবল তব ভ্রম,   নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে ॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ,   সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর ।
যথা সাধু, তথা তীর্থ,   স্থির করি' নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই,   সে তীর্থেতে নাহি যাই
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ ।
যথায় বৈষ্ণবগণ,   সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে,   মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী ।
গিরি তথা গোবর্ধন,   ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥
বিনোদ কহিছে ভাই,   ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত ॥